শুক্লবসনা সুন্দরী।

(অধুনা স্বর্গীয়) শ্রীযুক্ত উইল্কি কলিন্স প্রণীত

'উম্যান ইন হোয়াইট' নামক

সুবিখ্যাত উপন্যাস

অবলম্বনে

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

তৃতীয় ভাগ

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১২৯৭।

PRINTED BY AKSHAYA KUMAR GHOSE,
AT THE "NEW SANSKRIT PRESS,
7, SHIBKRISTO DAWN'S LANE, JORASANKO,

PUBLISHED BY GURU DAS CHATTERJEE.
201, CORNWALLIS STREET.
CALCUTTA.

শুক্লবসনা সুন্দরী।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।
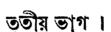
প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেই সন্ধ্যা সময়ে, সেই সরসী সন্নিহিত সুশ্যামল কানন মধ্যে, সহসা স্বর্গীয় লীলাবতী দেবীর সজীব প্রতিমূর্ত্তি-সন্দর্শন করার পর হইতে, আমার জীবন-প্রবাহ এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল এবং আমার আশা ও আশঙ্কা, উদ্যম ও অনুরাগ, সমস্তই নবীভূত হইয়া আমাকে নবোৎসাহে বলীয়ান্ করিল। সেই অচিন্তিত পূর্ব্ব শুভসংঘটনের পর সপ্তাহ কালের বিবরণ বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া, কল্পিত নাম ধারণ করিয়া, অধিষ্ঠিত হইলাম। যে পথ-পার্শ্বে আমরা বাস-স্থান মনোনীত করিলাম তাহা সতত জনাকীর্ণ। আমাদের বাস-ভবনের নিম্নতলে একখানি মনোহারীর বিপণি। দ্বিতল

ও ত্রিতলে আমাদের বাসা। দ্বিতলে আমি থাকি; আর ত্রিতলে শ্রীমতী মনোরমা দেবী ও শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, আমার ভগ্নী পরিচয়ে, বাস করেন। আমি কলিকাতার এক-খানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ রচনা করি; আর তাঁহারা, অবকাশকালে মোজা কম্ফর্টর আদি বুনিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা আমার সাহায্য করেন। আমাদের দাস দাসী নাই। রন্ধনাদি সমস্ত গৃহকর্ম্মই মনো-রমা দেবী স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তাঁহার সেই ক্ষীণ শরীরে, সেই দুর্ব্বল ও শীর্ণ দেহে, সেই চিরসুখসেবিত কলেবরে কঠোর গৃহকর্ম্ম সমাধা করা সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত হইলেও, আমাদের আয়ের অবস্থা দৃষ্টে ও সম্ভাবিত ব্যয়ের পরি-মাণ বিবেচনায়, অগত্যা তিনি জোর করিয়া এই গুরু ভার স্বয়ং গ্রহণ করিযাছেন। কষ্টে স্বষ্টে এক জন ঝি রাখিলেও রাখা যাইতে পারিত, কিন্তু কোন অপরিচিত নুতন লোককে আমাদের এই প্রচ্ছন্ন জীবনের সহিত মিশিতে দেওয়া নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ বিবেচনায়, তাহা করা হইল না। সংবাদ পত্রের জন্য পরিশ্রম করিয়া আমার যাহা আয় হয় তাহা হইতে কায়ক্লেশে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তাহা ভবিষ্য-তের জন্য আমরা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখি। লীলাবতী দেবীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হইতে, এপর্য্যন্ত, মনো-রমা দেবীকে নানা কারণে বহু ব্যয় ভূষণ করিতে হই-য়াছে। তাঁহার স্ত্রীধন স্বরূপ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা তৎসমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া, এক্ষণে তাহাব

প্রায় দুই শত টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমার হস্তেও প্রায় ঐ পরিমিত অর্থ ছিল। অধুনা আমরা উভয়ের সঞ্চিত এই ক্ষুদ্র সম্পত্তি একত্রিত করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলাম। তাহা আমাদের পবিত্র ধন স্বরূপে রক্ষিত হইল। লীলার নিমিত্ত যে ভয়ানক যুদ্ধে আমি প্রবৃত্ত হইবার সংকল্প করিয়াছি, তাহার জন্য ভবিষ্যতে আমার কখন কিরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্বরাজ্য হইতে পরিত্যক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে, আমরা এই ঘোর জনাকীর্ণ কলিকাতা মহানগর মধ্যে, অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিলাম। যুক্তির চক্ষে, আইন অনুসারে, আত্মীয় কুটুম্বের বিচারে, এবং সর্ব্ব সাধারণের বিবেচনায় রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। আমার চক্ষে এবং তাঁহার ভগ্নীর চক্ষে ৺ প্রিয়প্রসাদ রায়ের কন্যা, রাজা প্রমোদরঞ্জনের স্ত্রী এখনও জীবিতা; কিন্তু সাধারণের চক্ষে তিনি মৃতের তালিকাভুক্ত—জীবনেও মৃতা ও ভস্মাবশেষে পরিণতা। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে তিনি মৃতা; ভবনস্থ দাসদাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সুতরাং তাহাদের চক্ষে তিনি মৃতা; রাজপুরুষগণ তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার স্বামী ও পিতৃষসাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে তিনি মৃতা। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববিধ বিচারে, তিনি মৃতা। তথাপি জীবিতা! দুঃখ ও দারিদ্র্য-মধ্যে, দীন-হীন এক পরিচিত শিক্ষকের সহায়তায়, এবং এক যাতনাক্লিষ্ট বিধবা ভগ্নীর যত্নে, পুনরায় সজীব মনুষ্যমণ্ডলী

মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। যে এই ঘটনা শুনিয়াছে সেই, ইহা নিরতিশয় অসম্ভব ব্যাপার বোধে, ঈষৎ বক্র হাস্যের সহিত, সকল কথা উপেক্ষা করিয়াছে এবং আমাদের দুই জনকে মুক্তকেশী নাম্নী উন্মাদিনীর সহিত লিপ্ত, ঘোর দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী, দারুণ চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু যে লীলাবতীকে কেহই চিনিল না; অতি স্বসম্পর্কিত ব্যক্তিগণও যাঁহাকে তাঁহার স্বরূপত্ব প্রদান করিল না এবং কেহই যাঁহাকে উন্মাদিনী মুক্তকেশী ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিল না, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইয়াছিল কি? যে মুহূর্ত্তে, তাঁহার মৃত্যুর অকাট্য সাক্ষী স্বরূপ সেই স্মরণলিপির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়াছেন, তৎকাল হইতে, অণুমাত্র ভ্রম হওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রকার সন্দেহের ছায়াও আমার অন্তরে উদিত হয় নাই। সেই দিন দিবাকর অস্তগত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার যে জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহার পক্ষে চির-নিরুদ্ধ হইয়াছে তাহার দৃশ্য আমাদের নেত্র-পথ-ভ্রষ্ট না হইতেই, আমি আনন্দধাম হইতে প্রস্থান কালে, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে, তাঁহাকে যে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা আমাদের উভয়েরই মনে পাড়ল। আমি তখনই তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম; তিনিও তাহা স্পষ্টই মনে করিলেন। "কিন্তু দেবি, যদি কখন এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন আমার প্রাণপণ চেষ্টাতে, আপনার এক মুহূর্ত্তেরও সন্তোষ জন্মিতে পারে, বা এক মুহূর্ত্তেরও কষ্ট

বিদূরিত হইতে পারে, তখন কি দেবি, আপনি দয়া করিয়া এ দীনহীন শিক্ষককে স্মরণ করিবেন!" যে অবলা পরাগত গুরুতর বিপদ ও মনস্তাপের প্রায় কিছুই মনে করিতে অক্ষম, তিনি কিন্তু, আমার সেই বহুদিন পূর্ব্বে কথিত, এই কথাগুলি সুন্দররূপে স্মরণ করিতে সক্ষম হইলেন এবং তখনই, নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞানে, আমার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া, আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, তাহারা আমাকে সকল কথাই ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, তথাপি আমি দিদিকে আর তোমাকে ভুলি নাই।" বহুকাল পূর্ব্বেই আমি সেই দেবীর চরণে আমার সম্পূর্ণ প্রেম উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার এই বাক্যের পর, আমি আমার জীবনও সেই পবিত্র উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিলাম এবং সর্ব্ব শক্তিমান বিশ্ববিধাতার অনুকম্পায় আমার জীবন রক্ষিত হওয়ায়, আমি তাহা তদভিপ্রায়ে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইলাম বলিয়া, সেই মঙ্গলময় দেবতার উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলাম।

সময় উপস্থিত হইয়াছে! শত শত ক্রোশ দূর হইতে, ঘোরারণ্য ও দুর্গম গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, আমি সমুচিত সময়ের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত, প্রত্যাগত হইয়াছি। অধুনা তিনি আত্মীয় স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বহু-যাতনায় ক্লিষ্ট, রূপান্তরিত, শ্রীভ্রষ্ট এবং তাঁহার চিত্ত তমসাচ্ছন্ন। এখন তাঁহার সে পদ-গৌরব নাই, তাঁহার সে ধন-সম্পত্তি নাই, তদীয় চরণে আমার হৃদয় ও মনের

ঐকান্তিক আনুগত্য কলঙ্ক-সংস্পর্শ-শূন্য হইয়া উৎসর্গ করিবার এই যথোপযুক্ত অবসর। বিপদ-ভারে নিপীড়িত হইয়া, সংসারে বন্ধু-বিহীন হইয়া, তাঁহার এখন আমার হইবার অধিকার হইয়াছে। এখন আমিই তাঁহার একমাত্র সহায়, অনন্য অবলম্বন এবং অদ্বিতীয় বন্ধু। তাঁহার বিলুপ্ত অস্তিত্ব, অপগত রূপরাশি, বিলুণ্ঠিত সুখসম্পদ, সকলই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, আমি তখনই বদ্ধ পরিকর হইলাম। প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। সকল দুর্দ্দশার ও বিপদের সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত। আমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিধ্বংসিত হউক, আমার সুহৃদ্‌গণ আমাকে, উন্মাদ বোধে, পরিত্যাগ করুন, শত সহস্র বিপদ ও যাতনা আমাকে নিষ্পেশিত করুক এবং আমার জীবনই বা গতপ্রায় হউক, আমি আমার সংকল্প কদাপি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অখণ্ডনীয় পণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার অভিপ্রায় ও অবস্থা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলাম, অতঃপর মনোরমা ও লীলার বক্তব্য বিবৃত হওয়া আবশ্যক। আমি তাঁহাদের উভয়ের বর্ণিত বিশৃঙ্খল বৃত্তান্তমধ্য হইতে, আমার ও আমার উকীলের ব্যবহারের

জন্য, যত্নসহকারে এক সার-সঙ্কলন করিয়াছি। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এস্থলে তাহাই প্রকাশিত করিলাম। কালিকাপুরের রাজবাটীর গিন্নী ঝির বক্তব্য যেস্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতে মনোরমার কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

স্বামী-ভবন হইতে রাণী চলিয়া আসার পর, তদ্‌ঘটনা এবং তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য বৃত্তান্ত গিন্নী ঝি মনোরমা দেবীকে জানাইয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে (কয়দিন তাহা নিস্তারিণী ঠাকুরাণী ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না) চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর এক পত্র আসিয়া পৌঁছে; তাহাতে লিখিত ছিল, যে কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায়, রাণী লীলাবতী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কোন্ দিন এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, চিঠিতে তাহা লেখা ছিল না, আর লেখা ছিল যে, গিন্নী ঝি যদি ভাল বুঝে, তাহা হইলে এ দুঃসংবাদ এখনই মনোরমা দেবীর গোচর করিতে পারে, অথবা যত দিন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষাও করিতে পারে।

ডাক্তার বিনোদ বাবু এই সময়ে স্বয়ং পীড়িত হওয়ায় কয়দিন রাজবাটীতে আইসেন নাই। তিনি আসিলে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহারই সমক্ষে চিঠি প্রাপ্তির দিনেই কি তাহার পরদিনে, গিন্নী ঝি সমস্ত সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানাইল! এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনোরমা দেবীর যেরূপ অবস্থা হইল তাহা এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, সংবাদ প্রাপ্তির

পর, তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত, তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার শক্তি ছিল না। তৎপরে তিনি গিন্নী ঝিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যদি ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিলে নিস্তারিণী ঠাকুরাণী পাইতে পারিবেন, তাহা পূর্ব্বেই মনোরমা দেবীকে তিনি জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মনোরমা দেবী তাহার পরে করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে জানান যে রাণীর মৃত্যু বিষয়ে তাঁহার সমূহ সন্দেহ আছে। তিনি এ সন্দেহের কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে বাসনা করেন না, এমন কি নিস্তারিণীকেও তিনি মনের কথা জানান নাই। করালী বাবু পূর্ব্ব হইতেই, মনোরমা দেবীর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বন্ধুভাবে তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি, অতি সাবধানতা সহকারে, এই বিপদ্‌জনক ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ভার গ্রহণ করিলেন।

করালী বাবু প্রথমেই চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে যে যে ঘটনা এখনও শ্রীমতী মনোরমা দেবী জানিতে পারেন নাই, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। বলা আবশ্যক যে চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে তাঁহার গোচর করেন এবং যাহাতে তাঁহার আরও সংবাদ সংগ্রহ করার সুবিধা হইতে পারে তাহারও সুযোগ করিয়া দেন। ডাক্তার ভোলানাথ বাবু, পাচিকা,

ঝি ও বৈষ্ণবগণের সন্ধান করালী বাবুকে চৌধুরী মহাশয় বলিয়া দেন। চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার পত্নী, ডাক্তার বাবু, এবং পাচিকা ও ঝির স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া করালী বাবু স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, মনোরমা দেবীর এতাদৃশ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভগ্নী-বিয়োগ-জনিত নিদারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিচার-শক্তির এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি মনোরমা দেবীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে কুৎসিৎ সন্দেহকে মনে স্থান দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন ও বিশ্বাসের অযোগ্য। উকীল বাবুর অনুসন্ধানের এইরূপে আরম্ভ ও সমাপ্তি হইল।

এদিকে মনোরমা দেবী আনন্দধামে ফিরিয়া আসিয়া, এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর লিখিত এক পত্র দ্বারা শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জ্ঞাত হন। সে চিঠিতেও মৃত্যুর তারিখ লেখা ছিল না। তাঁহার ভগ্নী সেই পত্রেই, উদ্যান-মধ্যে যে স্থানে তাঁহাদের বড় বধূ ঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই পার্শ্বে, পরলোকগতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্মরণার্থ, এক স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। রায় মহাশয় এ প্রস্তাবে অসম্মত হন নাই। কয়েক দিবসের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক বেদিকা নির্ম্মিত হইল এবং তাহার এক পার্শ্বে এক সুন্দর প্রস্তর-ফলক সংযোজিত হইল। এই স্মরণ-লিপি সংস্থাপন-দিনে যথেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এতদুপলক্ষে আনন্দধামে আসিয়া-

ছিলেন এবং গ্রামের প্রজাবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিল। সেই দিন এবং তৎপরে আরও এক দিন, চৌধুরী মহাশয় আনন্দধামেই ছিলেন; কিন্তু রায় মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে, তাঁহার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের একবারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে লেখালিখিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল বটে। রাণীর শেষ পীড়া ও মৃত্যুর অন্যান্য বৃত্তান্ত চৌধুরী মহাশয় পত্র দ্বারা রায় মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। যে যে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে তদপেক্ষা কোন নূতন কথা সে পত্রে ছিল না; তবে পত্র সমাপ্তির পর 'পুনশ্চের' মধ্যে মুক্তকেশী সংক্রান্ত একটা বড় কৌতূহলজনক সংবাদ লিখিত ছিল। তাহাতে রায় মহাশয়কে জানান হইয়াছে যে, মনোরমা দেবী আনন্দধামে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকেশী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কথা জানিতে পারিবেন। সেই মুক্তকেশী উন্মাদিনী। কালিকা-পুরের রাজবাটী সন্নিহিত এক গ্রামে মুক্তকেশী আবার ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাকে দ্বিতীয় বার পাগলা গারদে রাখা হইয়াছে। বহুদিন অচিকিৎসায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করায়, মুক্তকেশীর মানসিক পীড়া সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের প্রতি বদ্ধমূল বিদ্বেষ তাহার মত্ততার প্রধান লক্ষণ। সম্প্রতি সেই বিদ্বেষ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। এই অভাগিনী নারী, অবরোধের কর্ম্মচারীগণের নিকটে, আপনার পদ-গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং রাজাকে অধিকতর উত্যক্ত ও ব্যথিত করিবার মানসে, আপনাকে রাজার

পত্নী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। একদিন সংগোপনে সে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ, সেইদিন রাজমহিষীর সহিত স্বীয় আকৃতিগত অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য সন্দর্শনে, তাহার মনে এই দুরভিসন্ধি সঞ্চারিত হইয়াছে। পুনরায় অবরোধ হইতে তাহার পলায়নের কোনই সম্ভাবনা নাই। তথাপি সে স্বর্গীয়া রাণীর আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়া উত্ত্যক্ত করিলেও করিতে পারে। তাদৃশ কোন পত্র হস্তগত হইলে, যেরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য, রায় মহাশয়কে এরূপে সাবধান করা হইল।

মনোরমা দেবী শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে আনন্দধামে উপনীত হইলে, তাঁহাকে এ পত্র দেখান হইয়াছিল। রাণী কলিকাতায় পিসিমার বাটীতে আসিবার সময়ে যে যে বস্ত্র ও সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন তৎসমস্তও এই সময়ে মনোরমাকে দেওয়া হইয়াছিল। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী সেই সমস্ত সামগ্রী, সযত্নে সংগ্রহ করিয়া, আনন্দধামে পাঠাইয়াছিলেন।

দুর্ব্বল শরীরে, বিজাতীয় মনস্তাপ ও অত্যুৎকট চিন্তা সহ্য না হওয়ায়, আনন্দধামে আগমন করার অনতিকাল মধ্যে, মনোরমার আর একবার পীড়া হইল। মাসাধিক কালের মধ্যে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল বটে, কিন্তু ভগ্নীর মৃত্যু সম্বন্ধীয় সন্দেহের বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এতাবৎ কালের মধ্যে তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের কোনই সংবাদ পান নাই। রঙ্গমতী দেবী তাঁহাকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন এবং, আপনার স্বামীর নাম

করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ সকল পত্রের কোন উত্তর না দিয়া, মনোরমা দেবী চৌধুরী মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ ভবন এবং তদ্বাসী ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার সংগোপনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহাতে সন্দেহজনক কোন ব্যবহার দৃষ্ট হয় নাই।

রমণী নাম্নী সেই ধাত্রীর সম্বন্ধেও মনোরমা দেবী গোপনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোন সন্দেহজনক সংবাদ জানা যায় নাই। প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, সে আপনার স্বামীর সহিত, কলিকাতায় আসিয়াছে। পল্লীবাসীরা তাহাদিগকে শান্ত ও ভদ্রপরিবার বলিয়া বিশ্বাস করে। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সম্বন্ধে মনোরমা দেবী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এক্ষণে কাশীধামে, বন্ধু বান্ধবের সহিত, ধীরভাবে কাল কাটাইতেছেন।

সর্ব্বত্র বিফল-প্রযত্ন হইয়াও মনোরমা দেবী স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি শেষে যে কারাগারে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ আছে, স্বয়ং তথায় যাইবার সংকল্প করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই একবার মুক্তকেশীকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। অধুনা মুক্তকেশী যে আপনাকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানিতে তাঁহার আরও আগ্রহ হইল। যদিই তাহার এরূপ প্রলাপোক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন্ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, সে এরূপ কথা প্রচার করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত বাসনা

হইল। এই সকল তথ্য নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ১১ই ভাদ্র তারিখে মনোরমা দেবী বাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি ১১ই ভাদ্র কলিকাতাতে রাত্রি যাপন করিলেন। রাণীর পূর্ব্ব অভিভাবিকা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে তিনি রাত্রি যাপন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র, লীলাবতী দেবীকে স্মরণ করিয়া, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এরূপ কাতর ও অভিভূত হইয়া উঠিলেন, যে মনোরমা দেবী সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা, উভয় পক্ষেই অসম্ভব বোধে, একজন পূর্ব্ব-পরিচিত ভদ্র পরিবারের ভবনে আসিয়া রাত্রিপাত করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমে বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় যে পত্রে রায় মহাশয়কে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন, তাহা মনোরমা দেবীর সঙ্গেই ছিল। তিনি পত্রের সেই অংশ দেখাইয়া, তিনিই যে তল্লিখিত মনোরমা দেবী, এবং স্বর্গীয়া রাণীর তিনি যে অতি নিকট আত্মীয় এসকল কথা অধ্যক্ষ মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন; সুতরাং মুক্তকেশীর এরূপ পাগলামির কারণ কি তাহা অবধারণ করিতে অবশ্যই তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় আর কোন, আপত্তি করিলেন না।

মনোরমা দেবীর মনে ধারণা হইল যে, রাজা এবং চৌধুরী

মহাশয় বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে আভ্যন্তরিক কোন রহস্য জানান নাই। যদি এ ব্যক্তিও চক্রান্তে লিপ্ত থাকিত, তাহ হইলে সে কখনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে দিত না, এব সে সরল ভাবে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে যে যে কথা বলিল, চক্রান্ত কারীগণের সহিত সংলিপ্ত হইলে, কখনই তাহা বলি না। উন্মাদিনীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে কারাধ্যক্ষে সহিত মনোরমা দেবীর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সহজেই অধ্যক্ষ বলিল, যে ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, শ্রীযু জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয়, মুক্তকেশীকে ধরিয়া আনিয়া এই গারদে পুনঃ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সং রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়েরও এক পত্র ছিল। রোগ পুনরায় গারদে আসিলে, অধ্যক্ষ প্রথমেই রোগীর কতক গুলি বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন, কিন্তু বায়ুরোগ গ্রস্তগণের সেরূপ পরিবর্ত্তন তিনি আরও অনেক দেখিয় ছেন; উন্মাদের, আন্তরিক পরিবর্ত্তনের সহিত, বাহ্য পা বর্ত্তনও, অনেক সময়, লক্ষিত হইয়া থাকে। রোগ সমভাব থাকিলে প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কি যখন ভাল হইতে মন্দে আইসে, অথবা মন্দ হইতে ভালে যায়, তখনই প্রায় রোগীর আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটে মুক্তকেশীর রোগের অবস্থা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই, সুতরাং তজ্জন্য বাহ্যাকারে কিছু পরিবর্ত্তন তিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না। তথাপি কারাগার হইতে পলায়নের পূর্ব্বে মুক্তকেশীর যেরূপ ভা ছিল, এবার পুনরায় আগমনের পর হইতে, তাহার অনে

বিভিন্নতা দেখিয়া তিনি কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সকল বিভিন্নতা এত সূক্ষ্ম যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি এমন কথা বলেন না যে মুক্তকেশীর শরীরের দৈর্ঘ্য, আকার, বর্ণ, কিম্বা কেশ, চক্ষু ও মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন যে কি তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। কারাধ্যক্ষের এই সকল কথা শুনিয়া, পরাগত ঘটনার নিমিত্ত, মনোরমা দেবী যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাঁহার মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিল, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি কিয়ৎকাল নীরবে সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া হৃদয়ে বল-সঞ্চয় করিলেন এবং ধীরে ধীরে কারাধ্যক্ষের সঙ্গে, অবরোধ মধ্যে, প্রবেশ করিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, মুক্তকেশী তখন কারামধ্যস্থ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কারাধ্যক্ষ, মনোরমা দেবীকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য, একজন পরিচারিকার উপর ভার দিয়া, স্বয়ং কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিকা মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন দুইটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পরিচারিকা বলিল,— "ঐ যে মুক্তকেশী। আপনি উহার সঙ্গে যে দাই আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই, সকল কথা জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মনোরমাও তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহারাও মনোরমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মনোরমাকে দেখিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই পরিচারিকার হস্ত ছাড়াইয়া সবেগে আসিয়া, মনোরমার বাহুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনই মনোরমা আপন ভগ্নীকে চিনিতে পারিলেন এবং জীবন্মৃতার কাহিনী বুঝিতে পারিলেন—মনের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে তথায় সেই পরিচারিকা ধাত্রী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তাহার বয়স বেশী নয়। সে সম্মুখের এই কাণ্ড দেখিয়া এমনই বিচলিত হইয়া পড়িল, যে তখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিল না। যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, তাহাকে মনোরমা দেবীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে হইল; কারণ তিনি তখন মূর্চ্ছিতা। অনতি-কাল মধ্যেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং, পাছে তাঁহার ভগ্নী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায়, বিহিত যত্নে আপনার চঞ্চলতা প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহারা উভয়ে সেই পরিচারিকার চক্ষের উপরেই থাকিবেন, এই কথা স্বীকার করিলে, সে তাঁহাকে রোগীর সহিত স্বতন্ত্র ভাবে কথা কহিতে অনুমতি প্রদান করিল। তখন আর অন্য কথার সময় নাই। মনোরমা দেবী তখন

রাণীকে কেবল স্থির হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং স্থির হইয়া থাকিলে শীঘ্রই নিষ্কৃতির উপায় হইবে, অন্যথা সকল দিকই নষ্ট হইয়া যাইবে, একথা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই নরকপুরী হইতে, এই জীবন্মৃত অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতির আশা পাইয়া রাণী, তাঁহার ভগ্নীর বাসনানুসারে, স্থির ভাবে থাকিতেই স্বীকার করিলেন। মনোরমা তদনন্তর পরিচারিকার সমীপাগত হইয়া, তাহার হস্তে পাঁচটী টাকা প্রদান করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন কখন এবং কোথায় তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে শঙ্কাকুল বোধ করিয়া, মনোরমা দেবী বুঝাইয়া দিলেন, যে অধুনা মনের চাঞ্চল্য হেতু তিনি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম; সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তিনি পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার তাঁহার কোন বাসনা নাই। পরদিন বেলা ৩টার সময়, গারদের উত্তর দিকের প্রাচীরের বাহিরে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে স্বীকৃত হইল। এমন সময়ে দূরে কারাধ্যক্ষকে আসিতে দেখিয়া, মনোরমা শীঘ্র তাহার সহিত কথা শেষ করিয়া, আপনার ভগ্নীর কাণে কাণে বলিলেন,—"ভয় নাই, স্থির হও—কালি দেখা হইবে।" কারাধ্যক্ষ সমীপস্থ হইয়া, মনোরমা দেবীর কিছু ব্যাকুলিত ভাব লক্ষ্য করিলে, তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, মুক্তকেশীকে দেখিয়া তিনি সত্যই কিছু কাতর হইয়াছেন। তাহার পর আর অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা

অবৈধ বোধে, ত্বরায় কারাধ্যক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত কাণ্ডটা ভাল করিয়া আলোচনা করিবার শক্তি পুনরাগত হইলে, মনোরমা স্থির করিলেন যে রাণীকে আইন সঙ্গত উপায়ে, তাঁহার যথার্থ অবস্থা প্রমাণ করাইয়া, মুক্ত করিতে হইলে বহুবিলম্ব ঘটিবে এবং তাহাতে সম্ভবতঃ রাণীর বর্ত্তমান দুরবস্থা হেতু, অবসন্ন মানসিক শক্তি আরও দুর্ব্বল ও অপ্রাকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি স্থির করিলেন যে ঐ পরিচারিকার দ্বারা গোপন ভাবে রাণীর নিষ্কৃতির উপায় করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, কলিকাতার এক ব্যাঙ্কে তাঁহার যে সামান্য টাকা ছিল তাহা সংগ্রহ করিলেন এবং অলঙ্কারাদি যাহা সঙ্গেই ছিল তাহা বিক্রয় করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার হস্তে প্রায় দেড় হাজার টাকা হইল। তিনি সংকল্প করিলেন, যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সংগৃহীত অর্থের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিয়াও, ভগ্নীর নিষ্কৃতি সাধন করিতে হইবে। সমস্ত টাকা সঙ্গে লইয়া, পর দিন নিরূপিত সময়ে, তিনি বাতুলাগারের প্রাচীর-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত ছিল। মনোরমা সাবধানতার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে যে মুক্তকেশীর পরিচারিকা ছিল, মুক্তকেশী পলাইয়া যাওয়ায় তাহার কর্ম্ম গিয়াছিল। আবারও যদি মুক্তকেশী কোনরূপে পলাইতে পারে তাহা হইলে তাহারও কর্ম্ম যাইবে। এ কর্ম্ম যে খুব ভাল তাহা সে মনে

করে না ; কারণ এ কর্ম্মে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক বারও বাড়ী যাইবার ছুটী নাই। তাহার স্বামী আছে ; কিন্তু, এক দেশে থাকিয়াও, সে স্বামীর সহিত দেখা করিতে পারে না। এজন্য সে বড়ই অসুখী। এই জন্যই তাহারা স্বামী স্ত্রীতে, কলিকাতায় কোন দোকান করিয়া, একত্রে থাকিবে স্থির করিয়াছে। কিন্তু দোকান করিতে, খুব কম হইলেও, হাজার টাকা পুঁজি চাই। তাহাই জুটাইবার জন্য, এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, সে এই কর্ম্মে রহিয়াছে। তাহার স্বামীও আর এক জায়গায় কর্ম্ম করিতেছে। হাজার টাকা হাতে হইলেই সে এ কর্ম্মের মুখে ছাই দিয়া চলিয়া যাইবে। এই সকল কথা শুনিয়া মনোরমা দেবী যে সুবে কথা কহিলে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন যে, যাহাকে তাহারা মুক্তকেশী বলিয়া মনে করিতেছে, সে তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় এবং সে মুক্তকেশী নহে। ভুল ক্রমে তাহাকে মুক্তকেশী বলিয়া গারদে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় করিলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হইবে। পরিচারিকা কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই মনোরমা হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া, তাহাকে এই উপকারের জন্য পুরস্কার স্বরূপে, দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল এবং এরূপ সৌভাগ্য সম্ভব বলিয়াই সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনোরমা আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—

"ইহাতে তোমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। এক জন

যথার্থ বিপদাপন্ন লোকের উপকার করিয়া যদি পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? এই তোমার দোকা-নের পুঁজির টাকা হইল। এখন তোমার কর্ম্ম থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আর ভাবনা কি? তুমি তাহাকে নিরা-পদে আমার নিকট লইয়া আইস। আমি তোমাকে এই হাজার টাকা দিয়া তাহাকে লইয়া যাইব।"

পরিচারিকা বলিল,—"আপনি এই কথা লিখিয়া, আমাকে এক খানি পত্র দিলে বড় ভাল হয়। আমার স্বামী যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এত টাকা এক সঙ্গে আমি কোথায় পাইলাম, তখন আমি তাঁহাকে আপনার ঐ পত্র দেখাইব।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমি তোমার প্রার্থনা মত পত্র লিখিয়া আনিব, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে বল।"

"হাঁ, তা করিব।"

"কখন?"

"কালি।"

স্থির হইয়া গেল কল্য অতি প্রত্যুষে মনোরমা দেবী এই স্থানে আসিয়া, পার্শ্বস্থ দুইটা বড় গাছের আড়ালে, দাঁড়াইয়া থাকিবেন। পরিচারিকা যে ঠিক কোন সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং তাঁহাকে সে খানে কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে বলা যায় না। কিন্তু যতই হউক, সে সুযোগ পাইবামাত্র মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে, স্থির থাকিল।

পর দিন অতি প্রত্যুষে নোট ও পত্র লইয়া মনোরমা

যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনতিকাল মধ্যেই পরিচারিকা রাণী লীলাবতী দেবীর হস্ত ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মনোরমা, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে পত্র ও নোটের তাড়া দিয়া, সাশ্রুনয়নে আপনার ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। এই অচিন্তনীয় ভয়ানক ঘটনার পর, ভগ্নিদ্বয়ের পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

পরিচারিকা, অতি সদ্বিবেচনা সহকারে, রাণীর গায়ে এক খানি মোটা বিছানার চাদর ঢাকা দিয়া আসিয়াছিল। মনোরমা প্রস্থান করিবার পুর্ব্বে, মুক্তকেশীর পলায়ন-বৃত্তান্ত অবরোধ মধ্যে কিরূপে প্রচারিত করিতে হইবে, এবং প্রচারিত হইবার পরই বা সেকি বলিবে, তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিলেন। সে গারদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য লোক শুনিতে পায় এমনই ভাবে বলিবে যে, মুক্তকেশী কয় দিন হইতে কেবলই কলিকাতা হইতে কালিকাপুর কতদূর তাহারই সন্ধান করিতেছে। তাহার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পলায়ন সংবাদ চাপিয়া রাখা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা না বলিয়া, যখন নিতান্তই না বলিলে নহে বুঝিবে, তখন বলিবে যে মুক্তকেশীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মুক্তকেশী এখন রাজা প্রমোদ রঞ্জনের রাণী হইয়াছে; ইহাই তাহার পাগলামির প্রধান অঙ্গ; বিশেষতঃ সে আবার কালিকাপুর কতদূর তাহার সন্ধান করিয়াছে, সুতরাং সে নিশ্চয়ই কালিকাপুরের দিকে গিয়াছে; সকলের মনেই এই ধারণা হইবে এবং তাহারা সেই দিকেই তাহার সন্ধান করিতে ছুটিবে; প্রকৃত দিকে কেহই যাইবে না।

পরিচারিকার সহিত এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া, মনোরমা ভগ্নিকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং সেই দিন বৈকালের গাড়ীতে উঠিয়া, রাত্রে আনন্দধামে পৌঁছিলেন।

আনন্দধামে আগমন কালে, পথে মনোরমা ধীরে ধীরে, সুকৌশলে রাণীকে বিগত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাণীর তখন শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। তিনি সকল কথা মনে করিয়া ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্বন্ধে তিনি যাহা স্মরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নিতান্ত অসম্বদ্ধ বৃত্তান্ত হইলেও, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

রাণী লীলাবতী কালিকাপুর হইতে চলিয়া আসার পর, ক্রমে কলিকাতার ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন দিদির জন্য চিন্তায় তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠিত অবস্থা ছিল, তাহাতে সে দিন কোন তারিখ, কি বার কিছুই তাঁহার মনে থাকা সম্ভব নহে। সে সকল কোন কথাই তাঁহার মনে নাই।

ষ্টেশনে আসিয়াই তিনি চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহারাই রাণীর সমস্ত সামগ্রীপত্র গাড়ি হইতে নামাইয়া লইল। তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এক ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। সে গাড়িখানা কি রকম তাহা তিনি তৎকালে লক্ষ্য করেন নাই।

গাড়িতে উঠিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়কে মনোরমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। চৌধুরী মহাশয় তদুত্তরে বলেন, যে মনোরমা এখনও আনন্দধাম যান নাই ; আরও কয়েক দিন বিশ্রাম না করিয়া তিনি ততদূর পর্য্যটন করিতে অশক্ত।

• এখনও তবে মনোরমা চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন কি না, একথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর দেন, তাহা রাণী ঠিক মনে করিয়া বলিতে পারেন না। তবে ইহা তাঁহার মনে আছে যে, চৌধুরী মহাশয় রাণীকে তখনই মনোরমাকে দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাণীর কলিকাতা ভাল করিয়া দেখা ছিল না, এজন্য কোন্ কোন্ পথ দিয়া তাঁহাদের গাড়ি চলিতে লাগিল তাহা তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। যেখানে গাড়ি থামিল, সে স্থানটা বহুজনাকীর্ণ ও কলরবপূর্ণ। এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয় কখনই তাঁহাকে আশুতোষ দের গলির মধ্যস্থ স্বীয় আবাসে লইয়া যান নাই।

তাঁহারা উপরে উঠিয়া একতম প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জিনিষপত্র সযত্নে তুলিয়া লওয়া হইল এবং একজন ঝি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু-যুক্ত এক বাঙ্গাল পুরুষ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল। রাণী, তাঁহার দিদি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায়, চৌধুরী মহাশয় উত্তর দেন যে, তিনি এখানেই আছেন এবং এখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তিনি এবং সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল তাহার পর সে ঘর হইতে চলিয়া

গেলেন এবং রাণী তথায় একাকিনী বসিয়া রহিলেন। সে ঘরের সাজগোজ বড় মন্দ এবং ঘরটা দেখিতেও ভাল নহে। নিম্নতলে অনেক মানুষ কথা কহিতেছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন। অনতিকালমধ্যে চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে, মনোরমা দেবী এখন ঘুমাইতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহাকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে একজন ভদ্রবেশধারী পুরুষ ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে নিজের একজন বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সেই ভদ্রলোকটীর নাম কি, অথবা তিনি কে তাহার কিছুই না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় আবার প্রস্থান করিলেন। ভদ্রলোকটী রাণীর ঘরেই থাকিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা বিশেষ সৌজন্যব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার কয়েকটী আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টির বিকট ভাব দেখিয়া রাণী নিতান্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞাত পুরুষ কিয়ৎকাল মাত্র সে ঘরে থাকিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার অত্যল্পকাল পরে, আর এক ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনাকে চৌধুরী মহাশয়ের একজন বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিলেন। তিনিও অতি বিকটভাবে রাণীর প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কতকগুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর তিনিও পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় প্রস্থান করিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাণীর মনে অত্যন্ত ভয় হইল এবং তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া ঝিকে ডাকিতে সংকল্প করিলেন।

তিনি তদভিপ্রায়ে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র চৌধুরী মহাশয় তথায় পুনরাগত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র রাণী তাঁহাকে নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসিলেন, যে তাঁহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাতের জন্য, তাঁহাকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রথমে চৌধুরী একটা উড়ো জবাব দিলেন, কিন্তু নিতান্ত পীড়াপীড়ি হওয়ায়, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত স্বীকার করিলেন যে, মনোরমা দেবী যেরূপ ভাল আছেন বলিয়া এতক্ষণ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তিনি সেরূপ নাই। তাঁহার কথার ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত ভয় হইল এবং অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আগমনাবধি তাঁহার মনে যে উদ্বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইল। এই সকল প্রবল মানসিক কষ্টে রাণীর মস্তিষ্ক নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হওয়ায়, এক গ্লাস পানীয় জলের প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয় দ্বার-সমীপে আসিয়া কাহাকে এক গ্লাস জল এবং স্মেলিং সল্টের সিসি আনিতে বলিলেন। সেই শ্মশ্রুধারী বাঙ্গাল উভয় সামগ্রীই আনয়ন করিল। জল-পান করিতে আরম্ভ করিয়া রাণী তাহাতে এরূপ কটু আস্বাদ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মাথা ঘোরা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়ের হস্ত হইতে স্মেলিং সল্টের সিসিটা লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলেন। মাথা আরও ঘুরিয়া উঠিল এবং স্মেলিং সল্টের সিসি হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় পতনোন্মুখ সিসি ধারণ করিলেন। রাণীর শেষ এই মাত্র মনে আছে যে, চৌধুরী

মহাশয় তাঁহার নাসিকাগ্রে স্মেলিং সল্টের শিসি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর রাণীর কথিত বৃত্তান্ত নিতান্ত অসম্বদ্ধ ও সামঞ্জস্য-বিরহিত। তিনি বলেন যে, অনেক রাত্রে তাঁহার চৈতন্য হয়, তখন তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করেন। কেমন করিয়া, কাহার সঙ্গে তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলেন তাহা কিছুই মনে করিতে পারেন না। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, তিনি যে অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন তাহা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন। আরও অসম্ভব কথা! তিনি বলেন যে, সেখানে রমণী নাম্নী সেই পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল! অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইয়াছিল, অথবা সেখানে আর কেই বা ছিল, এবং রমণীই বা সেখানে কেন আসিয়াছিল, এ সকল কোন কথাই তিনি মনে করিয়া বলিতে পারেন না।

পরদিন প্রাতের যে বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করেন, তাহা আরও অসম্বদ্ধ ও অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, প্রাতে চৌধুরী মহাশয় ও রমণীর সহিত তিনি গাড়ি করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। কিন্তু কখন এবং কেন তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটী হইতে চলিয়া আইসেন তাহার কোন কথাই তিনি বলিতে পারেন না। গাড়ি কোন্ দিকে চলিল, কোথায় গিয়া থামিল, এবং চৌধুরী মহাশয় ও রমণী নিয়ত তাঁহার সঙ্গেই ছিল কি না, এ সকল কথারও তিনি কোন

উত্তর দিতে পারেন না। সহসা তিনি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এবং নানাবিধ অপরিজ্ঞাত স্ত্রীলোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যে যে কি হইল, একদিন কি দুই দিন—কত সময় অতীত হইল, তাহার এক কথাও তিনি মনে করিয়া বলিতে অক্ষম।

এই স্থানই বাতুলালয়। এই স্থানে তিনি সবিস্ময়ে শ্রবণ করিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিতেছে এবং এই স্থানে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তিনি মুক্তকেশীর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে বলিল,—"তুমি আপনার কাপড় চোপড় দেখিতেছ না? কেন তুমি আপনাকে রাণী রাণী বলিয়া আমাদের জ্বালাতন করিতেছ? তুমি মুক্তকেশী একথা সকলেই জানে।"

আনন্দধাম যাত্রাকালে, পথে সাবধানতা সহকারে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, মনোরমা রাণীর নিকট হইতে কেবল এই অসম্বদ্ধ ও সামঞ্জস্যহীন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। বাতুলালয়ে অবস্থান কালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মনোরমা [illegible] জানিতে চেষ্টা করিলেন না; কারণ অধুনা রাণীর যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে সে সকল বৃত্তান্ত পুনরায় আলোচনা করিতে হইলে নিতান্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষের কথা মতে রাণী ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তথায় স্থাপিতা হন। সেই দিন হইতে ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত তিনি অবরুদ্ধা ছিলেন। এই তাবৎকাল লোকে নিরন্তর তাঁহাকে মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি

যে সত্যই মুক্তকেশী তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তিনি যে উন্মাদিনী তাহা তাঁহাকে সকলেই বলিয়াছে ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়াছে। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় অবস্থাপিত হইলে তাঁহার অপেক্ষা কঠিন প্রকৃতিক, অভিজ্ঞ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ব্যক্তির চিত্তও নিশ্চয়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কেহই এরূপ ভয়ানক ঘটনার পর অপরিবর্ত্তিত রূপে প্রত্যাগত হইতে পারে না।

১৫ ই রাত্রে আনন্দধামে পৌঁছিয়া, সেদিন আর মনোরমা দেবী কোন গোল উত্থাপন করিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ রূপ সতর্কতার সহিত, অগ্রে প্রাসঙ্গিক নানা কথা বলিয়া, তিনি যাহা যাহা ঘটিয়াছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। আশঙ্কা ও বিস্ময় অন্তরিত হইলে, রায় মহাশয় রাগের সহিত বলিলেন যে, মুক্তকেশী নিশ্চয়ই মনোরমাকে ভুলাইয়াছে। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের শেষাংশ এবং উভয়ের আকৃতিগত যে সাদৃশ্যের কথা মনোরমা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাঁহাকে ম[illegible]তে বলিলেন। তিনি সে পাগলিনীকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সম্মুখে আসিতে দিতে অস্বীকার করিলেন; আর বলিলেন, যে সেরূপ উন্মাদিনীকে বাটীতে আসিতে দেওয়াই নিতান্ত অত্যাচার হইয়াছে। মনোরমা অতিশয় ক্রোধের সহিত সে গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। ক্রোধের প্রথম উগ্রতা মন্দীভূত হইলে তিনি স্থির করিলেন, রাণী সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত

লোকের ন্যায়, এ বাটী হইতে বিদূরিত হইবার পূর্ব্বে, যেমন করিয়া হউক, রায় মহাশয়ের সমক্ষে তাঁহাকে একবার উপস্থিত করিতেই হইবে। এই সংকল্প করিয়া তিনি অনতিকাল মধ্যে রাণী লীলাবতীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রায় মহাশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ভৃত্য প্রবেশ করিতে একবার নিষেধ করিল বটে, কিন্তু মনোরমা তাহাকে একটা ধমক দিতেই, সে দ্বার ছাড়িয়া দিল। তখন মনোরমা, ভগ্নীর হাত ধরিয়া, রায় মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সেখানে যাহা যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা করিতে হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হয়; এজন্য মনোরমা সে কথা আমাকে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রায় মহাশয় সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখাগত স্ত্রীলোককে তিনি কখনই চিনেন না; তাহার মুখের ভাব ও ব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহার স্থির প্রতীতি হইয়াছে যে, সে কখনই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হইতে পারে না; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর যে মৃত্যু হইয়াছে তৎপক্ষে তাঁহার কোনই সংশয় নাই এবং যদি এই পাগলিনীকে অদ্যই তাঁহার বাটী হইতে স্থানান্তরিত করা না হয়, তাহা হইলে তিনি দ্বারবানের দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। রায় মহাশয় যেরূপ স্বার্থপর, অলস, ও হৃদয়-হীন ব্যক্তি তাহাতে এ ব্যবহার তাঁহার অনুরূপ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার হইলেও মনে মনে চিনিতে পারিয়া, মুখে অস্বীকার করা

সম্পূর্ণই অসম্ভব। সেরূপ ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবহার নিতান্ত পশু-প্রকৃতিক মনুষ্যের পক্ষেও কদাপি সম্ভব নহে। এ পক্ষে চেষ্টার এই স্থানে শেষ হইল দেখিয়া, মনোরমা অতঃপর বাটীর দাস-দাসীগণের নিকটে একথা উত্থাপন করিলেন। তাহারা পূর্ব্ব হইতে তাহাদের প্রভু-তনয়ার সহিত মুক্তকেশী নাম্নী উন্মাদিনীর যে সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহা বিচার করিয়া, তাহারাও উপস্থিত স্ত্রীলোককে রাণী লীলাবতী বলিয়া স্বীকার করিল না। এতক্ষণে মনোরমা বুঝিলেন যে, দীর্ঘকাল অবরোধ ও নানাবিধ মনস্তাপ হেতু, তাঁহার ভগ্নীর বাহ্যাকারের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে না হইলেও, অন্যের চক্ষে তাহা বড়ই ভয়ানক। যে কল্পনাতীত চক্রান্ত তাঁহার মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছে তাহা এতই প্রবল যে, তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া রাণীর জন্মভবনে ও তাঁহার আজন্ম পরিচিত ব্যক্তি-গণের নিকটেও তাঁহার বিদ্যমানতা সমর্থন করা মনোরমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

ঘটনা নিরতিশয় বিপজ্জনক না হইলে, এত শীঘ্র হতাশ ভাবে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইত না। গিরিবালা নামে সেই ঝি রাণীকে যেরূপ জানিত, তাহাতে সে যে তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিলে চিনিতে পারিত না, এমন বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে এখন সেখানে ছিল না; দিন দুই পরে সে আসিতে পারে কথা আছে। তাহার চেনার দরুণ হয়ত অন্যের মনের সংস্কারও ক্রমশঃ দূর করিলে করা যাইতে পারিত। তাছাড়া রাণীকে দিনকতক এখানে

লুকাইয়া রাখিতে পারিলেও, ক্রমে ক্রমে অবশ্যই তাঁহার শরীর ভাল হইয়া উঠিত এবং তাঁহার পূর্ব্ব লাবণ্য ও সজীবতা আবার দেখা দিত। তাহা হইলে লোকজন অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিত। কিন্তু যে উপায়ে তাঁহাকে স্বাধীন করা হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ কোন অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব। গারদ হইতে লোকেরা আপাততঃ তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য কালিকাপুরের দিকে ধাবিত হইয়াছে. কিন্তু যেই তাহারা সেখানে তাঁহার সন্ধান না পাইবে, সেই নিশ্চয়ই আনন্দধামের দিকে ধাবিত হইবে। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া. মনোরমা আপাততঃ এসকল চেষ্টা পরিত্যাগ করাই আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন এবং, যত শীঘ্র সম্ভব, এস্থান হইতে কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কলিকাতায় গিয়া থাকাই তাঁহার সুবিধা বলিয়া মনে হইল। সেরূপ লোকারণ্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকা অনেকটা সহজ কাজ। চিরস্মরণীয় ১৬ই ভাদ্রের বৈকালে মনোরমা ভগ্নীকে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বনের নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা উভয়ে চিরপরিচিত ক্রীড়াভূমী, ও বাল্যলীলার নিকেতন হইতে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকের ন্যায়, ভীত ও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায়, সঙ্কোচসহকারে, প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উদ্যান-পার্শ্ব দিয়া চলিয়া আসার পর, রাণী লীলাবতী দেবী ইহজীবনের মত একবার আপনার জননীর প্রতিমূর্ত্তি শেষ দেখা দেখিয়া লইবার বাসনা

প্রকাশ করিলেন। মনোরমা তাঁহাকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছু-তেই রাণী এ বিষয়ে দিদির ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার সেই নিষ্প্রভ নয়নে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বাহুতে আবার শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি জোর করিয়া দিদিকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার অন্তরে নিয়তই এই বিশ্বাস যে, বিশ্ববিধাতা, কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধু এই ঘটনায় সেই সাদশাপন্না মর্ম্মপীড়িতা সুন্দরীর শরীরে ও হৃদয়ে বল-বিধান করিয়া তাঁহার চির মঙ্গলময় নামের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ এরূপ না হইলে, তাঁহার এ বিয়োগ বিধুর দীন সন্তান ইহসংসারে সে নিদারুণ অন্তর্জ্জালা নিবৃত্তির উপায় কোথায় খুঁজিয়া পাইত?

তাঁহারা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে এই তিনটি জীবনের ভবিষ্যত সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা তৎকালে অতীত কাহিনী যতদূর পরিজ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিত হইল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার মনে স্বতঃই দুই মীমাংসা সমুপস্থিত হইল। প্রথমতঃ

এই লোমহর্ষণ কুমন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এবং এই অচিন্তনীয় দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত, চক্রান্ত-কারীগণকে কতই সুযোগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, কতই সাবধানতা সহকারে ঘটনাবলী পরিচালিত করিতে হইয়াছে, তাহা আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া ও বৃত্তান্ত এখনও আমার অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, সেই শুক্লবসনা সুন্দরী এবং রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্য-সূত্রাবলম্বনে যে এই অচিন্তনীয় দুষ্কর্ম্ম সংসাধিত হইয়াছে, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তকেশী চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় রাণীরূপে পরিচিত ও সমানীত হইয়াছিল। ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাণী বাতুলালয়ে সেই পরলোকগতা রমণীর স্থান অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকল পরিবর্ত্তন এরূপ সুকৌশলে সংসাধিত হইয়াছিল যে ডাক্তার, চৌধুরী মহাশয়ের ভবনস্থ পাচিকা ও দাসী এবং, সম্ভবতঃ, বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ প্রভৃতি নির্লিপ্ত ও নিরীহ ব্যক্তিগণ, বিশেষ সংশ্রবে থাকিয়াও, এদারুণ চক্রান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন নাই। অথচ সহসা তাঁহাদের সকল-কেই চক্রান্তে বিশেষরূপ লিপ্ত ও সহায়কারী বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের পরিণাম মাত্র। চৌধুরী মহাশয় ও রাজার হস্তে আমাদের তিন জনের কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই, ইহা স্থির। এই চক্রান্তে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহাদের দুই জনের তিন লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে; একজন দুই লক্ষ

টাকা পাইয়াছেন, আর একজন স্ত্রীর যোগে এক লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়াছেন। এই ভয়ানক কাণ্ড প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিলে, তাঁহাদের লাভের হানিতো হইবেই.অধিকন্তু তাঁহাদের উভয়কেই যার-পর-নাই বিপন্ন হইতে হইবে এবং রাজদ্বারে বিশেষরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই সকল কারণে, তাঁহাদের জঘন্য চক্রান্তের প্রধান লক্ষ্য কোথায় লুকায়িত আছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাকে তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ মনোরমা ও আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা কোন প্রকার যত্নের ও চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

এই অতি ভয়ানক বিপদ প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে বিবেচনা করিয়া, আমি কলিকাতায় বহুজনতা পূর্ণ কার্য্যময় এক পল্লী মধ্যে আমাদের বাসস্থান অবধারিত করিলাম। সে পল্লীর সকল লোকই কর্ম্মময় ও স্ব স্ব ভাবনায় ব্যস্ত, সুতরাং তাহাদের এমন সময় ও অবকাশ নাই যে, তাহারা পরের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। আমি কলিকাতায় এই জনাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এই ঘোর অত্যাচারের প্রতিবিধান, এবং এই বিজাতীয় কাণ্ডের প্রতিকার কল্পে জীবনকে ব্রতী করিলাম।

এই নূতন আবাসে, নূতন অবস্থায় অবস্থাপিত হওয়ার পর, যখন কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের জীবন-প্রবাহ ধীরে ধীরে, সুনিয়মে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ভবিষ্যতে আমি কিরূপ প্রণালীতে আমার বর্ত্তমান ব্রত পালনে অগ্রসর হইব, তাহা অবধারণ করিয়া লইলাম।

আমি যে লীলাবতীকে চিনিতে পারিয়াছি, অথবা মনোরমা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এ দুই প্রমাণে কোন ফল হইবে না, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমরা দুই জনেই তাঁহার নিকট অপরিসীম, অতি বলবান প্রেম-ডোরে বাঁধা। এই প্রেম আমাদের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সংস্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? আমাদের কি বিচার করিয়া, আলোচনা করিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে চিনিতে হইবে?

অতীত ঘটনাবলীর ভয় ও নানাবিধ অত্যুৎকট মনস্তাপ, মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে অবিকল তত্তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। আমি যৎকালে আনন্দধামে অবস্থান করিতাম, তৎকালে উভয়কে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যদিও স্থূলতঃ উভয় কামিনীর অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, তথাপি সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই অতীত কালে, এতদুভয়কে একত্রে দাঁড় করাইয়া দেখিলে, কাহারও মনে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে কোনই ভ্রান্তি হইত না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা যায় না। লীলাবতীর অনাগত জীবনে যদি কখন বিষাদ ও যাতনা সমুপস্থিত হয় তাহা হইলে মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া তৎকালে আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সুখসৌভাগ্য সম্বেষ্টিতা লীলাবতী দেবীর জীবনের সহিত তাদৃশ

অপ্রিয় কল্পনা একবারও মনে মনে বিমিশ্রিত করিয়াছিলাম বলিয়া আমার তখন নিরতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! ঘটনাচক্র এখন সত্য সত্যই সেই সুকুমারীর সুকোমল হৃদয় ও শরীরকে নিদারুন দুঃখ-ভারে নিপীড়িত করিয়াছে। তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও যৌবন-শ্রী অধুনা যাতনাজনিত কালিমা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে এবং একদা যে সাদৃশ্যের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়াও ব্যথিত হইয়াছিলাম, এখন তাহা সর্ব্বাংশে সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দুইজন তাঁহাকে যে চক্ষে দর্শন করি সে চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন চক্ষু তাঁহাকে তাঁহার বাতুলালয় হইতে মুক্তির দিবস দর্শন করিলে, কখনই সেই লীলাবতী বলিয়া চিনিতে পারিত না; এবং সে জন্য তাহাদিগকে অপরাধী করিবার কোনই কারণ নাই।

এই সকল কারণে লীলার বাহ্যাকারের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়ের অবস্থাও তেমনই মন্দ হইয়াছিল। দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার চিরন্তন সজীবতা, লাবণ্য, ও শোভা যেমন বিধ্বংসিত হইয়াছিল, মনের শক্তিও সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার স্মৃতি-শক্তি বড়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বকালের কোন প্রসঙ্গই তিনি ভাল করিয়া মনে করিতে পারিতেন না; অতীত ঘটনা সকল তিনি সহসা স্মরণ করিতে পারিতেন না এবং অল্প দিন পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয় ও রাজার প্রযত্নে যে যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহাও তিনি মনে করিয়া বলিতে পারিতেন না। লীলার মানসিক শক্তির এবম্বিধ অভাব ও তাঁহার

নিরন্তর অপ্রফুল্লতা আমাদের চিন্তার প্রধান ও প্রথম বিষয় হইল। আমি ও মনোরমা অবিরত লীলার হৃদয়ে প্রফুল্লতা সঞ্চারিত করিতে ও তাঁহাকে তাঁহার বিগত সজীবতা পুনঃ প্রদান করিতে বিহিত বিধানে চেষ্টা করিতে নিযুক্ত হইলাম।

আহার ও পথ্যের সুব্যবস্থায় বাহ্য দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া, ক্রমশঃ মনের অবস্থাও ভাল হইবে মনে করিয়া, আমরা আপনারা অতি সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, লীলার নিমিত্ত নানাবিধ পুষ্টিকর ও বলবিধায়ক সুখাদ্য ব্যবস্থা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে, মানসিক শক্তি সমুত্তেজিত করিবার বাসনায়, নানা প্রকার আয়োজন করিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র আবাসে, লীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ, আমরা নানাপ্রকার মনোহর পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইতে লাগিলাম এবং লীলার চিত্ত বিনোদিত হইতে পারে, এরূপ নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। তাহাতে লীলার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে দেখিয়া, ক্রমশঃ আমি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কাব্যাদি পড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। লীলা সানন্দে পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। আবার—বহুকাল পরে—আবার আমি লীলার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নিকট কাব্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে লীলার চিত্ত ক্রমেই অধিকতর সজীব ও প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ববৎ ভাব আবার দেখা দিতে লাগিল। একদিন আমি লীলাকে পাঠ বলিয়া দিয়া, নীচে নিজ-প্রকোষ্ঠে আগমন করিয়া, প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত

হইলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, আমি আবার লীলার ঘরে গমন করিলে, লীলা লজ্জাবনতবদনে, ঈষৎ হাস্যের সহিত, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমি আনন্দ-ধামে কখন কখন এক একটা কবিতা লিখিতাম; তুমি তাহার বড়ই প্রশংসা করিতে। কিন্তু তাহার পর, এত-দিনের মধ্যে, আর একটীও কবিতা লিখি নাই। আজি আবার আমি একটী ছোট কবিতা লিখিয়াছি। যদি তাহা দেখিয়া তুমি রাগ না কর, তাহা হইলে, সেটী তোমাকে দেখিতে দিব। বল রাগ করিবে না?" ধন্য বিধাতঃ! তোমার অপার করুণাবলে আমার প্রাণের প্রাণ লীলাবতী যাহা ছিলেন আবার তাহাই হইতেছেন!

যেরূপেই হউক, যত ক্ষতি স্বীকার করিয়াই হউক, এবং যত কষ্টেই হউক, লীলার পূর্ব্ব অবস্থা পুনরায় সংস্থাপন করিতেই হইবে। মনোরমা ও আমি পরামর্শ করিলাম, আমাদের সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত যে কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকলই লীলার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কারণ সেই সকল ব্যাপারের আলোচনা করিতে হইলে লীলার অতিশয় কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে তাঁহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক আবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইয়া আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে যেখান হইতে যত বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, সমস্ত সংগৃহীত হইলে পর, করালী বাবুকে সকল

কথা জানাইতে হইবে এবং আইনের সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। মনোরমা রাজবাটীতে অবস্থানকালে, যে দিন-লিপি লিখিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমি তাহারই আলোচনায় নিযুক্ত হইলাম। এই দিনলিপির মধ্যে স্থানে স্থানে আমার প্রসঙ্গ ছিল। তৎসমস্ত আমার নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবেন মনে করিয়া, মনোরমা তাহা আমাকে পড়িতে না দিয়া স্বয়ং পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। আমি তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ লিখিয়া লইতে লাগিলাম। গভীর রাত্রে, সাংসারিক অন্য কার্য্য শেষ হওয়ার পর, আমরা দিনলিপির আলোচনা করিতাম। তিন রাত্রে এ কার্য্য শেষ হইল।

তদনন্তর, কোন দিকে কোন সন্দেহ উৎপাদন না করিয়া, অন্যত্র হইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। লীলা যে বলিতেছেন, তিনি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর আবাসে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এ কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমি ঠাকুরাণীর বাটীতে গমন করিলাম। এস্থলে, এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্য স্থলেও, ঠাকুরাণীর নিকট আমাদের প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া, যখন লীলার কথা উঠিল, তখনই 'স্বর্গীয়া রাণী' বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

মৎকৃত প্রশ্নের উত্তরে অন্নপূর্ণা যে উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। লীলা সেখানে রাত্রে থাকিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

একবারও সেখানে আইসেন নাই। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে, লীলার নিতান্ত বিস্ময়াবহ ভ্রম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এরূপ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা সহজ নহে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এরূপ বিপরীত প্রমাণ আমাদের উদ্দেশ্যের নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই।

ঠাকুরাণীকে লীলা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে চাহিলে, তিনি আমাকে তাহা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার খাম খানি তিনি রাখেন নাই; নিষ্প্রয়োজন বোধে, তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন। চিঠিতে কোন তারিখ দেওয়া নাই। ডাকের মোহর দেখিয়া একটা তারিখ বুঝিতে পারা যাইতে পারিত, কিন্তু খাম খানিও হারাইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, চিঠিতে রাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন বটে, যে তিনি কল্য আসিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন। সে কয় ছত্রের দ্বারা বর্ত্তমান অনুসন্ধান বিষয়ে, কোনই সহায়তা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অন্নপূর্ণা দেবীর বাটী হইতে হতাশভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজবাটীর গিন্নী ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীকে এক খানি পত্র লিখিবার জন্য মনোরমাকে বলিলাম। তাঁহাকে লেখা হউক যে, চৌধুরী মহাশয়ের কোন কোন ব্যবহার একটু সন্দেহজনক মনে হওয়ায়, গিন্নী ঝি, সত্যের অনুরোধে, সমস্ত ঘটনা আমাদিগকে জানাইলে, আমরা উপকৃত হইব। এ ক্ষেত্রেও 'স্বর্গীয়া রাণী' নামেই লীলাবতীর কথা উল্লেখ করা হইল। এদিকে পত্রের উত্তর আসিতে যে

কয়দিন বিলম্ব হইবে, সে সময়টা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া না থাকিয়া, আমি সিমুলিয়ায় ডাক্তার বাবুর নিকট গমন করিলাম। সেখানে আপনাকে শ্রীমতী মনোরমা দেবীর প্রেরিত লোকরূপে পরিচিত করিয়া, 'স্বর্গীয়া রাণীর' মৃত্যু সম্বন্ধে তৎকালে উকীল করালী বাবু যে যে সন্ধান করিয়াছিলেন. তদ্ব্যতীত আরও কোন নূতন সংবাদ এখন জানিতে পারা সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। ভোলানাথ বাবুর সহায়তায় আমি মৃত্যুর সার্টিফিকেটের নকল পাইলাম; এবং যে বৈষ্ণবেরা সৎকারার্থ শব লইয়া গিয়াছিল তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম, আর রামমতি নাম্নী সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীরও সন্ধান পাইলাম। রামমতি সম্প্রতি প্রভুপত্নীর সহিত মনান্তর হেতু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমি গিন্নী ঝি, ডাক্তার বাবু, বৈষ্ণবগণ, রামমতি প্রভৃতি সকলের লিখিত বৃত্তান্ত সংগৃহীত করিলাম। তৎসমস্ত এ গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কাগজপত্র সংগৃহীত হইলে, আমি মনে করিলাম, এখন করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করার সময় হইয়াছে। মনোরমা আমার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, কোন বিশেষ গোপনীয় কথাবার্ত্তার জন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব; অতএব কোন্ দিন কোন্ সময়ে উকীল বাবুর সুবিধা হইবে, তাহা জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।

প্রাতে আমি লীলাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের ভবনস্থ বারন্দায় বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরি-

ক্রমণের পর, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সজীব বোধ করিয়া, আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং লীলাকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' পড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পাঠালোচনা হইলে আমি উঠিবার উদ্যোগ করিলাম। তখন লীলা নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলি সকল পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্রত্য একটা পেনসিল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তিনি অবশ্যই কি বলিবেন মনে করিয়া, আমি একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্ব কালে তুমি আমাকে যেমন ভাল বাসিতে, এখনও কি তেমনই ভাল বাস? এখন আমার সে লাবণ্য নাই, সে সজীবতা নাই, আমার মনের সে প্রখরতা নাই। এখন, দেবেন্দ্র, এখনও কি তুমি আমাকে তেমনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাক? এখন আমি তোমার স্নেহের, তোমার ভালবাসার নিতান্ত অযোগ্য। আমাকে তুমি বলিয়া দেও, আমি কি করিলে আবার তেমনই হইতে পারিব।"

শিশুর ন্যায় সরল ভাবে লীলাবতী সুন্দরী এইরূপে আমাকে হৃদয়ের ভাব জানাইলেন। আমি বলিলাম,—"লীলাবতি, তুমি পূর্ব্বকার অপেক্ষা এক্ষণে আমার অধিকতর স্নেহের, অধিকতর ভালবাসার সামগ্রী হইয়াছ। তোমার সুখ-সৌভাগ্য অপগত হওয়ায়, সম্ভবতঃ, তোমার নিতান্ত কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া জন্মে নাই, সুতরাং তাহার হ্রাস হইবে কেন?

তোমার কষ্টে, তোমার দুঃখে আমার অনুরাগ এখন আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেন লীলা, তুমি এ অলীক চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছ? দেবি! হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে সচেষ্ট হও, এ অবস্থান্তরের কষ্ট বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর, এবং সতত সানন্দিত থাকিয়া আমাকে ও মনোরমাকে সুখী কর। তোমার আনন্দ, তোমার প্রফুল্লতা, তোমার সুখ ভিন্ন আমাদের জীবনের আর কোনই লক্ষ্য নাই।"

লীলা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন,—"আর আমার আনন্দের কি অভাব আছে? যদি কিছু অভাব থাকে তাহাও আর থাকিবে না। কিন্তু দেবেন্দ্র, তুমি যেন এখন কোথায় যাইবে বোধ হইতেছে। যেখানেই যাও, ফিরিয়া আসিতে দেরি করিও না। তুমি বাটী না থাকিলে আমার চিত্ত সুস্থির থাকে না।"

আমি বলিলাম,—"না প্রিয়ে, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি চিত্তকে সুস্থির ও সজীব করিতে চেষ্টা কর।"

বাহিরে আসিয়া আমি মনোরমাকে আমার সঙ্গে আসিতে সঙ্কেত করিলাম। প্রকাশ্যরূপে পথে বাহির হইলে আমার বিপদ ঘটিতে পারে; সে বিষয়ে মনোরমাকে সতর্ক করিয়া রাখা আবশ্যক বোধে, আমি বলিলাম,—"সম্ভবতঃ আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই বাটী ফিরিব। আমার অনুপস্থিত কালে, দেখিও কেহই যেন বাটীর মধ্যে আসিতে না পায়। আর যদিই কিছু ঘটে—"

মনোরমা তৎক্ষণাৎ আমার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল দেবেন্দ্র, আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, কি বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ; তাহা হইলে সে জন্য আমি সাবধান থাকিব।"

আমি বলিলাম,—"লীলার পলায়ন সংবাদ শুনিয়া রাজা প্রমোদ রঞ্জন, বোধ হয়, কলিকাতায় আসিয়াছেন। তুমি শুনিয়াছ, আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, তিনি আমার পশ্চাতে গয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদিও আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই, তথাপি সম্ভবতঃ তিনি আমাকে চিনেন।"

মনোরমা আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া উদ্বেগের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। ইহাতে আমার যে কতই গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হইল।

আমি বলিলাম,—"এত শীঘ্রই যে রাজা অথবা তাঁহার নিয়োজিত লোক আমাকে কলিকাতার পথে দেখিতে পাইবে, এরূপ আমি মনে করি না ; তবে সেরূপ ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। যদিই সেরূপ কোন কারণে আমি আজি রাত্রে বাটী ফিরিতে না পারি, তাহা হইলে তোমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইও না এবং কোন রূপ কৌশল করিয়া লীলাকে কোন কথা জানিতে দিও না। যদি আমি বুঝিতে পারি, কোন গয়েন্দা আমার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এবাটী পর্য্যন্ত না আসিতে পারে, আমি তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিব। যতই

বিলম্ব হউক, আমি যে ফিরিয়া আসিব তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না।"

দৃঢ়তার সহিত মনোরমা বলিলেন,—"না। মনে করিও না যে, ক্ষুদ্র-হৃদয় স্ত্রীলোক ভিন্ন তোমার আর সহায় নাই। আমি কখনই সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া তোমার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইব না।" আবার কিয়ৎকাল তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু দেবেন্দ্র, সাবধানের বিনাশ নাই। বল, তুমি খুব সাবধানে চালাফেরা করিবে?"

আমি মস্তকান্দোলন করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম এবং এই সন্দেহ-সমাকুলিত অন্ধকারময় অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রাথমিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

করালী বাবুর কার্য্যালয়ে আসিতে পথে কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। কিন্তু কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার হঠাৎ মনে হইল যে, আমি এরূপে এখানে আসিয়া কাজ ভাল করি নাই। মনোরমার দিনলিপি শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি করালী বাবুকে

রাজ বাটী হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয় খুলিয়াছিলেন এবং গিরিবালার যোগে প্রেরিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্রও চৌধুরীর স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং চৌধুরী মহাশয় করালী বাবুর আপিসের ঠিকানা বেশ জানেন। এখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, লীলাকে আবার হস্তে পাইয়া, মনোরমা অবশ্যই করালী বাবুর সহিত পরামর্শ করিবেন। এরূপ স্থলে, করালী বাবুর আপিসের নিকট নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয় ও রাজা গুপ্ত চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পুর্ব্বে, আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত যে লোক লাগাইয়া-ছিলেন, যদি এবারও তাহাদের লাগাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যাগমন সংবাদ এখনই ব্যক্ত হইয়া যাইবে। রাস্তায় পাছে কেহই আমাকে চিনিতে পারে, এই ভাবনাই ভাবিয়াছি, কিন্তু এখানে যে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার একবারও মনে হয় নাই। এ সকল কথা বিবে-চনা করিয়া, সময় থাকিতে, আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এখন আর সে বিবেচনায় ফল কি? যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই; এখন ফিরিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিব সংকল্প করিলাম।

কিয়ৎকাল বাহিরে অপেক্ষা করার পর, করালী বাবুর আরদালি আমাকে বাবুর খাসকামরায় লইয়া গেল। দেখিলাম করালী বাবু লোকটী খুব কৃশ, খুব ফরসা, বড় ধীর এবং বেশ বিচক্ষণ। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করি-লাম এবং বলিলাম,—"মহাশয়, আমার বক্তব্য আমি যত

সংক্ষেপেই কেন শেষ করি না, তথাপি অনেকক্ষণ সময় লাগিবে।”

তিনি উত্তর দিলেন;—“মনোরমা দেবীর কর্ম্মে সময়ের বিচার করিতে আমার অধিকার নাই। আমার অংশিদার শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ কালে আমাকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, মনোরমা দেবীর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে কদাচ অবহেলা করিবে না।”

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসিলাম,—“উমেশ বাবু এখন কোথায় আছেন ?”

তিনি উত্তর দিলেন,—“তিনি আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু কত দিনে তিনি ফিরিয়া আসিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে করালী বাবু, সম্মুখস্থ কাগজপত্র খুঁজিয়া, একখানি মোহর যুক্ত পত্র বাহির করিলেন। আমি মনে করিলাম, তিনি বুঝি পত্র খানি আমার হস্তে প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি পত্র খানি আমাকে না দিয়া, সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন এবং, আমার বক্তব্য শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে, আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া, বর্ত্তমান ব্যাপারের আমি যাহা যাহা জানিতাম, সকলই তাঁহাকে জানাইলাম। আইন ব্যবসায়ীগণ সহজেই অতিশয় চাপা। বিশেষতঃ, করালী বাবু তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তথাপি আমার কথা শুনিতে শুনিতে, বিস্ময় ও

অবিশ্বাস হেতু, বারম্বার তাঁহার মুখের নিরতিশয় ভাবান্তর দেখা গেল; তিনি চেষ্টা করিয়াও সে ভাব কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমি ক্ষান্ত না হইয়া আমূল বক্তব্য শেষ করিলাম এবং সমস্ত কথা সমাপ্ত করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন বলুন, এবিষয়ে আপনার মত কি?"

তিনি, বেশ করিয়া বিচার না করিয়া, হঠাৎ মত দিবার লোক নহেন। বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা আছে।"

তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সকল তীক্ষ্ণ, সন্দেহ-পূর্ণ, অবিশ্বাস-পূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া আমি সহজেই অনুমান করিলাম যে, করালী বাবু স্থির করিয়াছেন আমি নিশ্চয়ই কাহারও চাতুরীতে পড়িয়াছি। যদি মনোরমার পত্র লইয়া আমি না আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত, তিনি আমাকে কোন দুষ্টাভিসন্ধি-প্রণোদিত, প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ লোক বলিয়াই মনে করিতেন।

তাঁহার জিজ্ঞাস্য শেষ হইলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনাকে সত্য বলিয়াছি বলিয়া আপনি কি বিশ্বাস করিতেছেন না?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনাদের বিশ্বাস মতে আপনি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য এরূপ ব্যাপারে তিনি যে ভদ্রলোককে

মধ্যস্থ মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমিও বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আমি, শিষ্টাচারের অনুরোধে এবং যুক্তির অনুরোধে, ইহাও স্বীকার করিতেছি, যে রাণীর অস্তিত্ব আপনার নিকটে ও মনোরমা দেবীর নিকটে সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার নিকট আইনের মত জানিতে আসিয়াছেন। আমি আইন ব্যবসায়ী। আইনানুসারে আমাকে বলিতে হইতেছে, দেবেন্দ্র বাবু, আপনার মোকদ্দমা টিকিবে না।"

আমি বলিলাম,—"করালী বাবু, আপনি বড় শক্ত কথা বলিতেছেন।"

তিনি বলিলেন,—"আমার শক্ত কথা আমি সহজ করিয়া দিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর মৃত্যুর প্রমাণ, সহজ চক্ষে দেখিলেও, বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পিসিই বলিতেছেন যে, তিনি পিসার বাসায় আসিয়াছিলেন, সেখানে পীড়িতা হইয়াছিলেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে এবং সে মৃত্যু যে স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে ডাক্তারের প্রমাণ রহিয়াছে। যে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিয়াছে তাহারাও সাক্ষী রহিয়াছে। এই মামলা আপনি উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। আপনি বলিতেছেন, যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে ও যাহার সৎকার হইয়া গিয়াছে, সে রাণী লীলাবতী নহে। ইহার আপনি কি প্রমাণ দিতেছেন? আপনার কথিত বৃত্তান্তের প্রধান প্রধান অংশ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহার মূল্য কি দাঁড়ায়। মনোরমা দেবী পাগলা

গারদে গিয়া একটী পাগলিনীকে দেখিতে পান। ইহা জানা আছে যে, মুক্তকেশী নাম্নী এক পাগলিনীর সহিত রাণীর আকৃতির অত্যদ্ভুত সমতা আছে; সে ঐ গারদ হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। ইহাও জানা আছে যে, গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ যে স্ত্রীলোককে পাগ্‌লা গারদে রাখা হয়, সে সেই মুক্তকেশী বলিয়াই পুনরায় গৃহীত হয়। ইহাও জানা আছে যে, যে ভদ্রলোক মুক্তকেশীকে গারদে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি রাধিকা বাবুকে সতর্ক করিয়াছিলেন, যে রাধিকা বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রীরূপে পরিগণিত হওয়াই মুক্তকেশী নাম্নী পাগলিনীর বাতুলতার প্রধান লক্ষণ। আর ইহাও জানা আছে যে, যদিও কেহই তাহার কথা প্রত্যয় করে নাই, তথাপি গারদে মুক্তকেশী বার বার আপনাকে রাণী লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এ সকলই সত্য ঘটনা। ইহার বিরুদ্ধে আপনার বলিবার কি কথা আছে? মনোরমা দেবী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু পরাগত ঘটনা সকল সে পরিচয়ের নিতান্ত প্রতিকূল। মনোরমা দেবী তখনই কি আপনার ভগ্নীর স্বরূপত্ব কারাধ্যক্ষের গোচর করিয়া, আইন সঙ্গত উপায়ে, তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? না, তিনি গোপনে এক জনকে ঘুস দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহজনক ভাবে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া, যখন তিনি তাঁহাকে রাধিকা বাবুর নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি কি তখন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? মৃতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখ মনে পড়ায় তিনি এক বারও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন কি? না। চাকরবাকরের

কেহ কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল? না। তাহার পর তাঁহার স্বরূপত্ব সমর্থন ও অন্যরূপ চেষ্টার জন্য তাঁহাকে নিকটেই কোন স্থানে রাখা হইয়াছিল কি? না। তাঁহাকে গোপনে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে আপনিও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি কোন রূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব নহেন; এমন কি তাঁহাদের বহুদিনের বন্ধুও নহেন। চাকরবাকরের সাক্ষ্যতে আপনার সাক্ষ্য কাটিয়া গেল. রায় মহাশয়ের সাক্ষ্যতে মনোরমা দেবীর সাক্ষ্য কাটিয়া গেল। আর আপনারা যাঁহাকে রাণী বলিতেছেন, তিনি নিজেই নিজের সাক্ষ্য কাটিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন. তিনি রাত্রে কলিকাতায় এক জায়গায় ছিলেন। আপনি প্রমাণ পাইয়াছেন, তিনি সে জায়গার দিক দিয়াও যান নাই। আর আপনি বলিতেছেন, তাঁহার এখন মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহাকে নিজে কোন কথা বলিবার জন্য, কোন স্থানে উপস্থিত হইতে দেওয়া অসম্ভব। সময় বাঁচাইবার অনুরোধে, উভয় পক্ষেরই সামান্য সামান্য কথা আমি এখন আর আলোচনা করিলাম না। এখন আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আদালতে জুরির সমক্ষে, এই মোকদ্দমা উঠিলে আপনি কি প্রমাণ দিবেন?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার আমূল সমস্ত অবস্থাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইলাম। মনোরমা ও লীলার কাহিনী একজন নিঃসম্পর্কিত লোক শুনিলে কি বিবেচনা করে তাহা আমি এই প্রথম বুঝিলাম। আমাদের সম্মুখে যে সকল বিকট

প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এতক্ষণে আমার তাহার জ্ঞান জন্মিল। আমি বলিলাম,—

"মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের অত্যন্ত বিরোধী বটে।"

তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আপনি মনে করিতেছেন, এ সকল সত্য ঘটনা কার্য্য কারণ দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। সে সম্বন্ধেও আমি যাহা বুঝি তাহা বলি শুনুন। বিচারক আপনার অত ব্যাখ্যা অত মীমাংসা শুনিয়া কখনই কার্য্য করিবেন না। তিনি ঘটনাটি শুনিয়া সহজেই যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝিবেন ও তদনুযায়ী বিচার করিবেন। মনে করুন, আপনারা যাঁহাকে রাণী লীলাবতী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন এক স্থানে তিনি রাত্রিপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রমাণ হইতেছে, তিনি তাহা করেন নাই। আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া দর্শন শাস্ত্রের তর্ক বাধাইয়া দিবেন। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, আপনার সে মীমাংসা ভুল; কিন্তু মনে করুন দেখি, বিচারক বাদীর নিজের কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন, না আপনার কূট তর্কে অধিক বিশ্বাস করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু নিয়ত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আরও প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না কি? আমার ও মনোরমা দেবীর কয়েক শত টাকা আছে—"

তিনি আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনিই একবার বেশ করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন না। আপনি রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদিও সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি না, তথাপি যদি তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করার প্রতিকূলে, তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে প্রভূত প্রতিবন্ধক না জন্মাইয়া কখনই স্থির থাকিবেন না। মোকদ্দমার যতদূর ব্যাঘাত জন্মাইতে পারা যায় তাহা তাঁহারা সকলই জন্মাইবেন, প্রত্যেক কথার উপর আইনের কূট তর্ক উঠিবে এবং কয়েকটী শতের কথা কি বলিতেছেন—সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াও আমাদিগকে হারিয়া বাটী আসিতে হইবে। সে সকল স্থলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের গোল থাকে, বর্ত্তমান মোকদ্দমার ন্যায় আনুষঙ্গিক এত গোলমাল না থাকিলেও, তাহার মীমাংসা নিতান্ত কঠিন। আমি এই অতি অসাধারণ কাণ্ডের কোনই মীমাংসা দেখিতেছি না। বস্তুতই দেবেন্দ্র বাবু, এ মোকদ্দমার কোন জুত নাই—ইহা টিকিবে না।"

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোকদ্দমার বেশ জুত আছে এবং ইহা টিকিবে। আমি এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ভাল, অন্য কি রূপ প্রমাণ পাইলে কাজ হইতে পারে বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"আর যে প্রমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা সংগ্রহ করা আপনার সাধ্যাতীত। তারিখগুলি

সংগ্রহ করিতে পারিলে, সহজেই নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহা সংগৃহীত হওয়াও অসম্ভব। যদি মৃত্যুর তারিখ ও রাণীর কলিকাতায় আগমনের তারিখ এতদুভয়ের অনৈক্য দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কাহাকেও আর কথাটী কহিতে হইত না এবং আমি তখনই বলিতাম, মোকদ্দমা চালাইতেই হইবে।"

"এখনও চেষ্টা করিলে তারিখ পাওয়া যাইতে পারে।"

"যে দিন তাহা পাইবেন সেই দিন আপনার মোকদ্দমার আর এক চেহারা দাঁড়াইবে। যদি এখন তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলুন, আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র তৈয়ার করিতে আরম্ভ করি।"

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। গিন্নি ঝি কিছু বলিতে পারে না, লীলার কিছু মনে নাই, মনোরমা কিছু জানেন না। ইহজগতে কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ভিন্ন, বোধ হয়, আর কেহই তাহা জানে না। বলিলাম,—"এখনই তারিখ সংগ্রহ করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। এখন অনেক চিন্তা করিয়াও, কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ছাড়া, আর কেহ তাহা জানেন এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না।"

এ পর্য্যন্ত করালী বাবুর স্থির গম্ভীর বদনে একবারও হাসি দেখি নাই। এখন তাঁহার মুখে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"এই দুই জনের সম্বন্ধে আপনার যে রূপ বিশ্বাস, তাহাতে সে স্থান হইতে সফল হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা বুঝিয়া দেখুন। যদি তাঁহারা এই চক্রান্ত দ্বারা

রাশীকৃত টাকা হস্তগত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবেন, এমন বোধ হয় না।"

"কিন্তু করালী বাবু, তাহাদের বল প্রয়োগ করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।"

"কে বল প্রয়োগ করিবে?"

"কেন, আমি।"

আমরা উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি আগ্রহ সহকারে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বুঝিলাম যে আমি তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে বতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। তিনি বলিলেন,—"আপনি অতিশয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেখিতেছি এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে। আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই; আমি আপনাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি কখন আপনি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমি একথাও বলিয়া রাখি যে, যদিই আপনি রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার টাকা উদ্ধারের কোন উপায় হইবে, এমন বোধ হয় না। বাঙ্গাল মহাশয়ের বাড়ী নাই, ঘর নাই, তাঁহার ঠিকানা করাই ভার হইবে। আর রাজার দেনা এত বেশী যে এক কপর্দ্দকও আদায় করিতে পারা যাইবে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"রাণীর

আর্থিক প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। আমি পূর্ব্বেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা জানিতাম না; এবং এখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভিন্ন, আর কিছুই আমি জানি না। আপনি অনুমান করিয়াছেন যে এ ব্যাপারের মধ্যে আমার কোন বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত আছে, সে কথা সত্য। সে স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে আমার মনোবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন, অন্য কোন কামনা-মূলক নহে :—"

তিনি আমার বাক্য-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি আমার অভিপ্রায়ের সন্দেহ করিয়াছেন মনে করিয়া আমি তখন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম; এজন্য, তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া, বলিতে লাগিলাম,—

"আমার স্বার্থের মূলে কোন অর্থ লাভের অকাঙ্ক্ষা নাই। রাণী তাঁহার জন্ম-ভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর খোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃ-প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্ম-ভবনের দ্বার, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, পুনরায় উন্মুক্ত হইবে; এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই খোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসন সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতা বলে তাহা সংসাধিত না হয়,তথাপি আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে, আমার নিকট ঐ দুই ব্যক্তিকে দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদাবনত করিবই করিব। আমি এই ব্রতে আমার জীবন

সমর্পণ করিয়াছি। যদিও আমি নিঃসহায়, তথাপি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলে, নিশ্চয়ই আমার মনোরথ সফল করিব।”

করালী বাবু কোন কথা না কহিয়া, টেবিলের দিকে একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তিনি স্থির করিয়াছেন, ভ্রান্ত দূরাকাঙ্ক্ষা হেতু আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং আমাকে আর কোনরূপ উপদেশ দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমি আবার বলিলাম,—“আমাদের উভয়ের মনের ভাব উভয়ের জানা থাকিল; কাহার বিশ্বাস সফলিত হয় তাহা ভবিষ্যতে সপ্রমাণিত হইবে। সম্প্রতি মহাশয় আমার কথিত বৃত্তান্ত মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করায় আমি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আইন সঙ্গত কোন প্রতিকার আমাদের সাধ্যা-য়ত্ত নহে; মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণের প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। আর মোকদ্দমা চালাইবার মত অবস্থাও আমাদের নয়। এ সকল সংবাদ জানিয়াও কিছু লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।”

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া হস্তে সেই পূর্ব্ব কথিত পত্র খানি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—“কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক যোগে এই পত্রখানি আমার নিকট আসিয়াছে। এখানি আপনি হাতে করিয়া লইয়া যাইবেন কি? মনোরমা দেবীকে বলিবেন, আমি এ বিষয়ে যে উপদেশ দিলাম তাহা আপনার

যেমন বিরক্তিকর হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহারও তেমনই অপ্রীতিজনক হইবে; সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

যখন তিনি কথা কহিতেছিলেন, তখন আমি পত্র খানির শিরোনাম পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে, "শ্রীমতী মনোরমা দেবী সমীপেষু। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র বসু উকীল মহাশয়ের নিকটে। ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।" সে হাতের লেখা আমি আর কখন দেখি নাই। তাহার পর প্রস্থান কালে আমি করালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা প্রমোদ রঞ্জন এখনও পশ্চিমে আছেন, কি কোথায় আছেন. আপনি জানেন কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাঁহার উকীলের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

আমি প্রস্থান করিলাম। আফিসের বাহিরে আসিয়া সাবধানতার অনুরোধে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। বিপরীত দিকে, গড়ের মাঠের পথে চলিতে লাগিলাম। হাইকোর্ট হইতে ইডন্‌গার্ডেন যাইতে যে পথ আছে তাহার সম্মুখে গিয়া আমি একটু দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম হাই-কোর্টের কোণে দুইটী লোক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। এক মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া আমি সে দিক হইতে ফিরিয়া, লোক দুইটীর পার্শ্ব দিয়া, আবার ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। আমি নিকটস্থ হইলে এক জন একটু সরিয়া গেল, আর একজন সমানই দাঁড়াইয়া থাকিল।

আমি কাছ দিয়া যাইবার সময় লোকটার মুখের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। সন্দেহ ঘুচিয়া গেল, স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, আমি এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, যে দুই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিত, এ ব্যক্তি তাহারই এক জন।

যদি আমি স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তখনই তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া, তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া, কাইত করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন আমার চারিদিক ভাবিয়া কাজ করা আবশ্যক। এখন আমাকে সেরূপ কার্য্য করিলে রাজা প্রমোদরঞ্জনের হাতে পড়িতে হইবে। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতিই এবস্থায় আমার অবলম্বনীয়। যে লোকটা চলিয়া গেল সে যেদিকে গেল আমি সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম এবং শীঘ্রই তাহাকে ছাড়াইয়া চলিলাম। ভবিষ্যতে সহজে চিনিতে পারিবার জন্য, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিলাম। তাহার পর আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া ধীরে ধীরে লাট সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলাম। লোক দুইটা ক্রমাগতই আমার পিছনে আসিতেছে দেখিলাম। একখানি খালি গাড়ি পাওয়া, অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ির আড্ডা পর্য্যন্ত যাওয়া আমার উদ্দেশ্য। অচিরে একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি বিপরীত দিক দিয়া আসিতেছে দেখিলাম। কোচম্যান আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, গাড়ি।" আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার গাড়িতে

উঠিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে বলিয়া দিলাম,—“বৌবাজার”। সে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। সেখানে আর খালি গাড়ি ছিল না। একটা গাড়ির আড্ডা পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে, আমার অনুসরণকারীদের গাড়ি পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা নিরুপায় হইয়া আমার গাড়ির পিছনে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু সেরূপে তাহারা কতক্ষণ দৌড়িবে? কিছু কাল পরেই তাহারা নিরস্ত হইল। আমি যথাস্থানে পৌঁছিয়া, গাড়ি হইতে নামিলাম। দেখিলাম, তাহারা কেহই সঙ্গে আসিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ এদিক সেদিক করিয়া ঘুরিয়া একটু রাত্রি হইলে, বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, মনোরমা আমার নিমিত্ত বসিয়া আছেন। লীলা আজি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমি বাসায় ফিরিবামাত্র মনোরমা আমাকে সেই প্রবন্ধটী দেখাইবেন স্বীকার করিলে পর, লীলা তাঁহার অনুরোধে, শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এখন তাঁহার ঘুম আসিয়াছে। দেখিলাম, সেই মুক্তাফলতুল্য সুন্দর সমশীর্ষ হস্তাক্ষর পূর্ব্বে নিতান্ত দুর্ব্বলতা হেতু, যেরূপ কুৎসিৎ, বক্র ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন ক্রমশঃ তদপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। রচনার কৌশল ও ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া মানসিক শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সবিশেষ সুদৃঢ় হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিলাম। লীলার ক্রমোন্নতি দেখিয়া, অপার আনন্দ সহকারে, আমি বার বার মনে মনে বিধাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাহার পর নিতান্ত

অস্ফুট স্বরে মনোরমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম। পার্শ্বের ঘরেই লীলা নিদ্রাগত আছেন; একটু উচ্চ শব্দ হইলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

যতক্ষণ আমি করালী বাবুর সহিত কথোপকথনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, ততক্ষণ মনোরমার মুখের কোন ভাবান্তর দেখিলাম না। কিন্তু যখন আমি সেই লোক দুইটার কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, এবং রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ জানাইলাম, তখন তাঁহার মুখের নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিলাম।

তিনি বলিলেন,—"নিতান্ত কুসংবাদ, দেবেন্দ্র, বড়ই মন্দ কথা। তার পর।"

আমি বলিলাম,—"তার পর, বলিবার আর কোন কথা নাই; কিন্তু তোমাকে দিবার একটা সামগ্রী আছে।" এই বলিয়া করালী বাবু-প্রদত্ত সেই পত্র খানি তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি পত্রের শিরোনাম পাঠ করিয়াই কে পত্র লিখিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কে পত্র লিখিয়াছে, চিনিতে পারিয়াছ কি?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"খুব চিনিয়াছি—জগদীশনাথ চৌধুরী এ পত্রের লেখক।"

এই কথা বলিয়া তিনি পত্রের গালার মোহর ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন, এবং পত্র বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিলেন। পাঠকালে, সম্ভবতঃ ক্রোধাতিশয্য হেতু, তাঁহার মুখ ও চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে

তিনি আমাকে তাহা পাঠ করিতে দিলেন। তাহাতে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল,—

"মহীয়সী মনোরমা সুন্দরী! আপনার অতুলনীয়, মহোচ্চ গুণসমূহে বিমুগ্ধ হইয়া, অদ্য আমি আপনাকে দুইটী হৃদয়-তৃপ্তিকর আশ্বাসের কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। কোন ভয় নাই! আপনার স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি পরি-চালনা করিয়া নিভৃত-নিবাসে কালাতিপাত করিতে থাকুন; কদাপি বিপদাকীর্ণ প্রকাশ্য লোক-রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিবেন না। ইহসংসারে আত্মত্যাগের ন্যায় মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই; আপনি তাহাই অবলম্বন করুন। আত্মীয়-সঙ্গে একান্ত বাস চির নবীনতায় ও সজী-বতায় পরিপূর্ণ; আপনি তাহাই সম্ভোগ করুন। সুন্দরি-কুলোত্তমে! মানব-জীবনের বিপদ-বাত্যা সমূহ কখনই নির্জ্জন বাসরূপ অধিত্যকাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না; আপনি স্বচ্ছন্দে সেই উপত্যকায় বাস করিতে থাকুন।

"আপনি যদি এই প্রণালীর অনুবর্ত্তিনী হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অভয় দিতেছি, আপনার কোন ভয় নাই। আর কোন অভিনব বিপদ-ভারে আপনার অতি কোমল মনোবৃত্তি সমূহ কদাপি নিপীড়িত হইবে না; আপনাকে আর কেহই উত্ত্যক্ত করিবে না এবং আপনার নির্জ্জন-নিবাসের সুন্দরী সঙ্গিনীর কেহই আর অনুসন্ধান করিবেনা। আপনার হৃদয়-মধ্যে তিনি নূতন আশ্রয় স্থান লাভ করিয়াছেন। অমূল্য—অমূল্য আশ্রয় স্থান। আমি তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের হিংসা করি।

"আর একটী স্নেহপূর্ণ সাবধানতার কথা জ্ঞাপন করিয়া, আমি আপনার উদ্দেশে এই লিপিরচনারূপ পরম প্রীতিপ্রদ কার্য্য হইতে আপাততঃ অবসর গ্রহণ করিব। আপনি সম্প্রতি যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া আর একপদও অগ্রসর হইবেন না। কাহাকেও কোন রূপ ভীতি প্রদর্শনের প্রযত্ন করিবেন না। আপনার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, আমি আমার এই কর্ম্মময় জীবন, অপরিসীম উদ্যমশীলতা এবং অভ্রস্পর্শী অভিসন্ধি সমূহকে দমিত ও অবনত রাখিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবনপাত করিতেছি। আমাকে কোন মতেই পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করাইবেন না। যদি আপনার কোন অপরিণত-বুদ্ধি, উদ্ধত বন্ধু থাকেন, আপনি তাঁহার অত্যনুরাগকে মন্দীভূত করিয়া দিবেন। যদি দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন, আপনি তাঁহার সহিত কদাপি বাক্যালাপ করিবেন না। আমি আত্ম-পরিগৃহীত পন্থায় পরিভ্রমণ করিতেছি এবং প্রমোদরঞ্জন আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। যে দিন দেবেন্দ্র বাবু আমার সেই পথবর্ত্তী হইবেন, সেই দিন তাঁহার সকলই ফুরাইবে।"

এই পত্রের শেষভাগে বহুবিধ অঙ্কশোভিত এক 'ক' ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নাম লিখিত ছিল না। নিতান্ত ঘৃণার সহিত পত্র খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আমি বলিলাম,—"এ ব্যক্তি যখন তোমাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিজে বিশেষ ভয় পাইয়াছে।"

মনোরমার ন্যায় নারী যে এ পত্র আমারই মত ঘৃণার

চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। পত্রের ভাষার ভাব ও তন্মধ্যস্থ প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা সূচক সম্বোধন বাক্য সমূহ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে আমাকে বলিলেন,— "দেবেন্দ্র! যদি কখন এই দুইটা নররূপী পিশাচ তোমার হাতে পড়ে, আর যদি কোন কারণে তাহাদের একজনকে তোমার ক্ষমা করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট আমার এই মিনতি, তুমি যেন চৌধুরীটাকে কখন ছাড়িও না।

আমি নিক্ষিপ্ত পত্র পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলাম,— "সময় উপস্থিত হইলে, তোমার কথা সহজেই মনে পড়িবে বলিয়া, আমি পত্রখানি যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেছি।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু হায়! সে সময় কি কখন উপস্থিত হইবে! আজি করালী বাবু যে কথা বলিয়াছেন, পরে পথে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর আমাদের আর কোন শুভ সংঘটনের আশা করাই অন্যায়।"

"আজিকার কথা ছাড়িয়া দেও মনোরমা। অপর এক ব্যক্তিকে আমাদের হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করা ভিন্ন, আজি তো আর কিছুই করা হয় নাই। কালি হইতে আমার দিন গণনার আরম্ভ—"

"কেন? কালি হইতে কেন?"

"কারণ কালি হইতে আমি নিজে কাজ করিতে আরম্ভ করিব।"

"কিরূপে?"

"আমি কালি ভোরের গাড়িতে কালিকাপুর যাইব, এবং বোধ করি, রাত্রেই ফিরিব।"

"কালিকাপুরে!"

"হাঁ। করালী বাবুর আফিস হইতে আসিবার সময় আমি সমস্ত বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়াছি। তাঁহার একটা কথার সঙ্গে আমার মনের ঠিক ঐক্য হইয়াছে। লীলা কোন্ দিন রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহা স্থির করিবার জন্য আমাকে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। এই খুব পাকা চক্রান্তের মধ্যে এই স্থানই নিতান্ত কাঁচা আছে এবং এই তারিখটা বাহির করিতে পারিলেই, লীলা যে এখনও জীবিতা আছেন তাহা নির্ব্বিবাদে সপ্রমাণিত হইয়া যাইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি মনে করিতেছ, তারিখ জানিতে পারিলে, স্থির বুঝিতে পারিবে যে, ডাক্তারের লিখিত বৃত্তান্তানুসারে লীলার মৃত্যুর পর, লীলা সজীব অবস্থায় কালিকাপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।"

"ঠিক তাই।"

লীলা যে পরেই আসিয়াছে, একথা তুমি কেন মনে করিতেছ? লীলা তো নিজে এসম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছে না।"

"কিন্তু গারদের অধ্যক্ষ বলিতেছেন যে ২৭ শে তারিখে তাঁহাকে গারদে লইয়া গিয়াছিল। এক রাত্রির অপেক্ষা অধিককাল যে চৌধুরী তাঁহাকে অচেতন করিয়া রাখিতে

পারিয়াছিল, ইহা আমার কোন মতেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ২৬শে কালিকাপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এদিকে ডাক্তারের প্রমাণানুসারে ২৫শে তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। একথা যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে আর কোনই অপেক্ষা থাকিবে না।"

"ঠিক কথা! আমি এখন বুঝিয়াছি; কিন্তু এ প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় কি?"

"নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর বর্ণনা পাঠে আমার দুইটী উপায়ের কথা মনে হইয়াছে। যে দিন লীলা কালিকাপুর হইতে চলিয়া আইসেন, সেই দিনই নিস্তারিণী ডাক্তার বিনোদ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার বাবুর সে তারিখের কথা মনে থাকাই সম্ভব। তার পর সেই দিনই রাজা রাত্রিকালে গাড়ি হাঁকাইয়া যে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, সেখানকার যে স্থানে তিনি ছিলেন তথায় সন্ধান করিলেও তারিখ পাওয়া যাইতে পারে। হউক আর না হউক, এজন্য চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, সে চেষ্টা না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না।"

"দেবেন্দ্র, আমি এখন মন্দটাই ভাবিতেছি। কিন্তু যদি নিয়ত মন্দ ভিন্ন ভাল ফল দেখা না যায়, তখন আর আমি মন্দের জন্য আশঙ্কা করিব না। মনে কর যদি এ উপায়ে কিছুই সন্ধান পাওয়া না যায়,—যদি কালিকাপুরে কোন লোক কিছুই বলিতে না পারে?"

"তাহা হইলেও হতাশ হইব না। এই কলিকাতায় দুইটী লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই সকল কথা জানে। একজন রাজা প্রমোদরঞ্জন, আর একজন চৌধুরী। যাহারা নিরপরাধী ও এ চক্রান্তে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাহাদের সে তারিখের কথা মনে না থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা পাপী, তাহারা এ কথা কখনই ভুলিবে না। যদি আমি কোন উপায়েই কৃতকার্য্য না হই, তখন আমি ঐ দুই ব্যক্তির এক জনের নিকট হইতেই হউক, অথবা উভয়ের নিকট হইতেই হউক, জোর করিয়া এ কথা আদায় করিব।"

মনোরমা নিতান্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"যদি জোর করিতে হয়, তাহা হইলে আগে চৌধুরীকে ধর।"

আমি বলিলাম,—"না মনোরমা, অগ্রে যে স্থানে বলপ্রয়োগে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেই চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে। আগে রাজাকে ধরিতে হইবে, তাহার পর চৌধুরীকে ধরিব। চৌধুরীর জীবনের মধ্যে লুকাইবার মত কোন কাঁচা কথা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমরা জানি, রাজার জীবনে নিশ্চয়ই একটা সর্ব্বনাশজনক রহস্য আছে,—"

অমনই মনোরমা বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি মুক্তকেশী সংক্রান্ত সেই অজ্ঞাত রহস্যের কথা বলিতেছ?"

"হাঁ, সেই রহস্য। সেই উপায়েই আমি তাহাকে কায়দা করিব, তাহার পদ-প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া দিব; তাহাকে আমার পদাবনত করিয়া আনিব; এবং তাহার এই অতি ঘৃণিত দুষ্ক্রিয়া জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দিব। কেবল অর্থ লাভের

অভিসন্ধি ব্যতীত, নিশ্চয়ই আরও কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একমতে, এই ভয়ানক কুক্রিয়া সাধিত করিয়াছেন, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ, রাজা চৌধুরীকে বলিয়াছেন যে তাঁহার স্ত্রী যাহা জানে তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুক্তকেশীর রহস্য প্রচার হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে; এ কথাও তুমি স্বকর্ণে, শুনিয়াছ?"

"হাঁ, তাতো আমি শুনিয়াছি বটে।"

"মনোরমা, আমার অন্য সকল চেষ্টা বিফল হইলেও আমি যেমন করিয়া হউক, এই রহস্য প্রকাশ করিব। আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সংস্কার এখনও আমার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। আমার এখনও বিশ্বাস যে, সেই শুক্লবসনা সুন্দরী আমাদের এই তিনটী জীবনের নেত্রী। কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; আমরা নিরূপিত পরিণামের নিকটস্থ হইতেছি। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, পরলোকগতা মুক্তকেশী এখনও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাকে সেই পরিণামের পথ দেখাইয়া দিতেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রাতেই হুগলি জেলার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং বৈকালে বিনোদ বাবুর বাটীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার সহিত দেখা ও কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাণী যে দিন চলিয়া আসেন, সেই দিনই রাজবাটী হইতে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু, তিনি সে দিনই রাজ বাটীতে যাইতে পারেন নাই। কয় দিন পরে তিনি পুনরায় মনোরমা দেবীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঠিক মনে নাই। মধ্যে কয়দিন হইয়া যাওয়ার পর, ডাক্তার বাবু আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিতে পারিলেও রাণীর যাত্রার তারিখ স্থির করিতে পারা যাইত। নিস্তারিণীর মন সে সময়ে নানা কারণে নিতান্ত অস্থির ছিল। রাণী চলিয়া আসার কয়দিন পরে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ নিস্তারিণীর হস্তগত হয় এবং কয়দিন পরে সে সংবাদ মনোরমা দেবীকে জানান হয়, তাহা তিনি ঠিক করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এরূপ সময়ে, এরূপ কুসংবাদ পাইয়া চিত্ত স্থির রাখা সম্ভবও নয়। এদিকে কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি রাজপুরে অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিলাম। রাজপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজা সেখান হইতে গাড়ি বিদায় করিয়া দেন। সুতরাং কোন্ তারিখে সেখানে তিনি উপস্থিত

হইয়াছিলেন, ইহা যদি সেখান হইতে সন্ধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই রাণীর যাত্রার তারিখও ঠিক জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু যখন কুপড়ন্তা হয়, তখন কোন দিকেই সুবিধা হয় না। রাজা সেখানে কবে আসিয়াছিলেন, একথা কে মনে করিয়া রাখিবে? সেখানে কোনই সন্ধান করিতে পারিলাম না। রাজার সঙ্গে যদি অনেক লোক জন থাকিত, রাজার জন্য যদি গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইত, যদি তাঁহার অনেক জিনিষ পত্র সে দিন বুক করা হইত তাহা হইলে ষ্টেশনের আফিসে তাহার কিছু লেখাপড়া থাকিত; সুতরাং তারিখ পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু রাজা উন্মাদের ন্যায় ভাবে, পলাতক ব্যক্তির ন্যায়, একাকী বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ষ্টেশনে আমার উদ্দেশ্য বিষয়ক কোন সহায়তা হইল না।

কোন দিকে কিছুই হইল না; এদিকে গাড়িরও এখন দেরি আছে দেখিয়া মনে করিলাম একবার কালিকাপুরের রাজবাটীতে যাই। সেখানকার মালীটা রাজার সঙ্গে রাজপুরে পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; সে হয়ত, কোন সন্ধান বলিলেও বলিতে পারে। সেখানেও হতাশ হইলে এদিকের চেষ্টা বন্ধ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে গাড়িতে করিয়া আমি কালিকাপুর আসিলাম, রাজবাটীর বহু দূর হইতেই আমি তাহা ছাড়িয়া দিলাম। বড় রাস্তা ছাড়িয়া গলি রাস্তায় প্রবেশ করার পর দেখিতে পাইলাম, আমার আগে আগে একটা লোক, একটা ব্যাগ হাতে করিয়া দ্রুতপদে রাজ বাটীর দিকে চলিয়া যাইতেছে।

তাহার চেহারা দেখিয়াই আমার তাহাকে একটা ছেঁড়া মোক্তার বলিয়া মনে হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম, উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধান আরও অধিক হইয়া যাউক। সে লোকটা আমাকে দেখিতে পায় নাই, সে আপন মনে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে আমি রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও সে লোক-টাকে দেখিতে পাইলাম না; সম্ভবতঃ সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

আমি দরজার নিকটস্থ হইয়া সেখানে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; একটী প্রচীনা, অপরটীকে দেখিয়াই আমি, মনোরমার বর্ণনা স্মরণ করিয়া, বুঝিতে পারিলাম সেই রামী। আমি সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোককে, রাজা বাটীতে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা চলিয়া গিয়াছেন, ইহা ছাড়া তাহারা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। রামী কেবল কারনে অকারণে হাসিতে লাগিল, আর অনর্থক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। আমি প্রাচীনাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, রাজা কখন গেলেন, কেন গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, হঠাৎ রাত্রিকালে রাজা ঘোররবে চীৎকার করিয়া উঠায় বৃদ্ধার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রাজার বিকট ভাব দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু সে যে কোন্ তারিখ তাহা তাহার একটুও মনে নাই।

সেদিক হইতে ফিরিয়া আমি বাগানের দিকে মালীর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। আমি তাহাকে জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমার প্রতি একটু সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করিল। আমি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর নাম করায় তাহার মনে কতকটা বিশ্বাসের সঞ্চার হইল এবং সে আমার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইল। বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন; আমার চেষ্টার অন্যত্র যেমন ফল হইতেছে, এখানেও তাহাই হইল। মালী তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে নিতান্তই অক্ষম।

যখন আমি মালীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি, তখন সেই ব্যাগধারী লোকটা ধীরে ধীরে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ আমাদের দিকে আসিতে লাগিল এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিল। তাহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার মনে পূর্ব্বেই একটু সন্দেহ হইয়াছিল। মালীকে ঐ লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মালী, হয়ত মিথ্যা করিয়া নয়ত সত্যই, কোন কথা জানে না বলিল। তাহাতে আমার মনের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তখন আমি লোকটার সহিত কথা কহিয়া সকল সন্দেহ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায় করিলাম। অপরিচিত স্থলে প্রথমে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অন্যায় বোধে, আমি তাহার নিকটস্থ হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে রাজবাটী বাহিরের লোকে দেখিতে পায় কি না।

তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল সে

আমাকে বিলক্ষণ জানে এবং, আমাকে রাগাইয়া দিয়া, আমার সহিত ঝগড়া বাধান তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু সে যেরূপ অতিরিক্ত বিরক্তিকর বাক্য বলিল, তাহা শুনিয়া, রাগ হওয়া দূরে থাকুক, হাসি পায়। আমি প্রত্যুত্তরে অতিরিক্ত বিনয় ও ভদ্রতার কথা বলিলাম এবং তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। আমি মনে মনে বুঝিলাম যে, করালী বাবুর কার্য্যালয় হইতে ফিরিবার সময়ে, রাজার গুপ্তচরেরা আমাকে চিনিতে পারিয়া, রাজাকে অবশ্যই সে সংবাদ জানাইয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছেন যে, আমি যখন এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন অবশ্যই কালিকাপুরে সন্ধান না করিয়া কখনই ছাড়িব না। সেই জন্যই এ ভদ্রদূতের আগমন। যদি কোনক্রমে লোকটা আমার সহিত ঝগড়া বাধাইতে পারিত তাহা হইলে, আর কিছু না হইলেও, আপাততঃ আমার নামে অনধিকার প্রবেশ, গালি দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া, কয়েকদিনের জন্য আমাকে মনোরমা ও লীলার কাছ ছাড়া করিয়া রাখিতে তো পারিত।

কালিকাপুর হইতে ষ্টেশনে আসিবার সময়ে আমার পশ্চাতে চর লাগিয়া থাকিবে বলিয়া আমি মনে করিলাম। কিন্তু কোনই সন্দেহজনক কাণ্ড দেখিলাম না। সে ছোঁড়া বাবুটাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতায় আসিয়াও কোন দিকে কোন লোক আমাকে অনুসরণ করিতেছে, এরূপ বোধ হইল না। আমি ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া

বাসায় আসিলাম এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া বাসায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার অনুপস্থিত কালের মধ্যে মনোরমার ভয় পাইবার কোনই কারণ ঘটে নাই। আজিকার অনুসন্ধানের ফলাফল মনোরমা জানিতে চাহিলে, আমি তাঁহাকে অকাতর ভাবে সমস্ত কথা জানাইলাম। আমার অকাতর ভাব দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বস্তুতই আমার অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা আমাকে একটুও অভিভূত করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যবোধে আমি এ প্রযত্ন করিয়াছি মাত্র, কোন বাঞ্ছনীয় ফলের প্রত্যাশা করি নাই। আমার তখন মনের যেরূপ গতি তাহাতে ক্রমে ক্রমে যতই রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিরোধিতার অধিকতর আবশ্যকতা উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই আমার উৎসাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমার অন্যান্য উচ্চতর মনোবৃত্তির সহিত বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি বহুদিন হইতে মিশিয়া আছে। যে ব্যক্তি লীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছে সেই পাষণ্ডকে তাহার পাপোচিত প্রতিশোধ দিতে আমার আন্তরিক অনুরাগ। সত্যের অনুরোধে আমার স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে বিশেষ বলবান থাকায়, লীলার ভাবী শুভ কল্পে আমার এতাদৃশ প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বীয় ভবিষ্যৎ সুখ ও স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আমি উপস্থিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল হই নাই। রাজাকে আয়ত্ত করিতে

পারিলে, অথবা তাঁহার এই নিদারুণ দুষ্কৃতি জগৎ সমক্ষে ধরিয়া দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে লীলার উপর তাঁহার আর কোনই অধিকার থাকিবে না, এবং কেহই আর অতঃপর লীলাকে আমার চিরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না, এই দারুণ লোভজনক আশা আমার এতাদৃশ অত্যনুরাগের মূলীভূত নহে। লীলার তদানীন্তন দুরবস্থা, তাঁহার দেহের সেই দারুণ রুগ্ন ও কাতর ভাব, তাঁহার মনের সেই বিজাতীয় অবসন্নতা ও অপ্রসাদ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি যে আমার অপরিসীম প্রেমানুরাগ ছিল, তাহা শতগুণে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পিতা বা ভ্রাতা, আপনার কন্যা বা ভগ্নীকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিলে যেরূপ বাৎসল্য-পূর্ণ হৃদয়ে কাতর ও ব্যথিত হয়, আমার হৃদয়ও তাহাই হইয়াছে। লীলা আমার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী হইবেন কি না, সে ভাবনা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি। সে লোভ—সে আকাঙ্ক্ষা আমার এক্ষণে নাই। লীলার এ কষ্ট—লীলার এ দুরবস্থা আমার অসহ্য। আমার স্নেহ-প্রবণ বাৎসল্যময় হৃদয়ের এখন এই ভাব।

হুগলী হইতে ফিরিয়া আসার পরদিন, মনোরমাকে আমার নিজ প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া আনিয়া, রাজা প্রমোদ-রঞ্জনকে আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত, মনে মনে যে প্রণালী অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি, তৎসমস্ত জানাইলাম। এতকাল মুক্তকেশীর সহায়তায় রাজার জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত রহস্য জ্ঞাত হইবার আশা ছিল; কিন্তু মুক্ত-কেশী এখন নাই। এখন সেই দুর্জ্ঞেয় সংবাদ জ্ঞাত হইতে

হইলে মুক্তকেশীর জননীর সহায়তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। রোহিণী ঠাকুরাণীর সহায়তায় মুক্তকেশীর জননী-সংক্রান্ত পারিবারিক ও অন্যান্য সংবাদ সমূহ অগ্রে সংগ্রহ করিতে না পারিলে, তাহাকে কায়দা করিয়া কথা বাহির করিতে পারা যাইবে, এমন বোধ হয় না। অতএব মুক্তকেশীর প্রধান ও অকৃত্রিম আত্মীয় রোহিণীর নিকটে সর্ব্বাগ্রে সন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু রোহিণী কোথায় থাকেন তাহা আমাদের জানা নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনোরমা রোহিণীর ঠিকানা নির্ণয় করিবার যে এক উপায় বলিলেন, তাহা আমার মনে বেশ সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, আবার খামারে ভারামণির নিকটে পত্র লিখিলে এ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিরূপে রোহিণীর নিকট হইতে মুক্তকেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, রোহিণী ঠাকুরাণী যে নানা স্থানে নানাপ্রকারে তাঁহার সন্ধান করিয়াছেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। মুক্তকেশী আনন্দধাম যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাতে আনন্দধামের নিকটস্থ প্রদেশে যে রোহিণী সর্ব্বাগ্রেই সন্ধান করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার নিশ্চয় কথা। যে কোন সময়ে মুক্তকেশীর সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইবার জন্য, রোহিণী নিশ্চয়ই সেখানকার পরিচিত লোকদের নিজ ঠিকানা জানাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রোহিণীর ঠিকানা তারামণির জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

তৎক্ষণাৎ তারামণিকে মনোরমা এক পত্র লিখিলেন। তাহার পর মনোরমার নিকট হইতে আমি রাজার বাল্য জীবন ও পারিবারিক বৃত্তান্ত জানিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না, যাহাও জানিতেন তাহাও শুনা কথা মাত্র। আমিও তাহাই জানিয়া লইলাম।

রাজা প্রমোদরঞ্জনের পিতা রাজা বসন্তরঞ্জন আজন্ম কুব্জ, সুতরাং নিতান্ত কুৎসিৎ-দর্শন, ছিলেন; এজন্য তিনি লোক সমাজে বাস করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রমোদরঞ্জন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বসন্তরঞ্জন লোকালয়ের বহির্ভূত থাকিয়া নিরন্তর সংগীত আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন; তাঁহার রাণী এবং আবশ্যকমত দাস-দাসী ব্যতীত অন্য কোন লোক তাঁহাদের সংশ্রবে আসিত না। তাঁহারা কালিকাপুরের রাজ-ভবনে বনবাসী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেন; কেহই সাহস করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রয়াসী হইত না।

কেবল স্থানীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বার তাঁহাদিগকে নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলেন যে, রাজা দেব-দেবী মানেন না, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ করেন না, গুরু-ব্রাহ্মণে ভক্তি করেন না— নিতান্ত নাস্তিক। রাজা এরূপ পাষণ্ড হইলে, বড়ই সামাজিক অনিষ্টের সম্ভাবনা মনে করিয়া, তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঘোর তর্ক বাধাইয়া দেন। কিন্তু কিয়ৎ-কাল রাজার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, তিনি রাজাকে বস্তু-

তই ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়াই স্থির করেন এবং তাঁহার দেব-বিদ্বেষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 'রাম রাম' বলিতে বলিতে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনার পর সন্নিহিত তাবৎ জনপদে রাজার অত্যন্ত দুর্নাম ও কলঙ্ক প্রচারিত হয়। রাজার কখনই কালিকাপুরে বাস করিতে অনুরাগ ছিল না; বিশেষতঃ এই ব্যাপারের পর, তিনি আরও বীতরাগ হইয়া উঠেন এবং পুনরায় পাছে সেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বা অন্য কেহ তাঁহাকে উত্যক্ত করে, এই আশঙ্কায় রাজা অতঃপর কালিকাপুরের বাস পরিত্যাগ করেন।

কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়া, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে পশ্চিম যাত্রা করেন এবং পশ্চিমেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়। পশ্চিম প্রদেশেই রাজা প্রমোদরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল। অগ্রে তাঁহার জননী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে, প্রমোদরঞ্জন দুই এক বার এদেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সময়, লীলার পিতা ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। পরিচয় হওয়ার পর, দুজনের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রমোদরঞ্জনের আনন্দধামে যাতায়াত ছিল না। রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহাকে দুই একবার ৺প্রিয়প্রসাদের সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি জানিতেন না।

যদিও মনোরমার মুখে এই কয়টী কথা শুনিয়া বিশেষ কোন আশাপ্রদ সংবাদ পাইলাম না, তথাপি ভবিষ্যৎ

স্মরণ করিয়া, ইহাও আমার মন্তব্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

তারামণির পত্রের উত্তর আসিবার জন্য আমরা ডাক ঘরের ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম। দিন দুই পরে সন্ধান করিয়া দেখিলাম, পত্রের উত্তর আসিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমাদের প্রতিকূল ছিল, এই মুহূর্ত্ত হইতে সমস্তই আমাদের অনুকূল হইতে লাগিল। তারামণির পত্রে রোহিণীর ঠিকানা লেখা ছিল।

আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। মুক্তকেশী চলিয়া যাওয়ার পর, রোহিণী অনেক দুঃখ করিয়া তারামণিকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যদি কোন ক্রমে কখন মুক্তকেশীর সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে রোহিণীর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই ঠিকানা তারা এক্ষণে আমাদের নিকট নকল করিয়া পাঠাইয়াছে। সে ঠিকানা কলিকাতাতেই— আমাদের বাসা হইতে জোর আধ ঘণ্টার পথ।

'বিলম্বে কার্য্য হানি' এই চির প্রচলিত উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া আমি পর দিন প্রত্যুষে রোহিণীর সন্ধানে যাত্রা করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার অনুসন্ধানের অদ্যই রীতিমত আরম্ভ। বলিতে গেলে, আমি যে ভয়ানক সমরে জীবনপাত করিতে সংকল্প করিয়াছি, অদ্যই তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তারামণির পত্রানুসারে আমি যে ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম, তাহার নাম জোড়াসাঁকো। আমি দ্বারে ডাকাডাকি করার পর রোহিণী ঠাকুরাণী স্বয়ং আসিয়া আমাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার কি দরকার তিনি জানিতে চাহিলে, আমি তাঁহাকে শক্তিপুরের আনন্দধামের উদ্যান মধ্যে তাঁহার সহিত রাত্রিকালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম এবং মুক্তকেশী বাতুলালয় হইতে পলায়ন করার পর, আমি কলিকাতার পথে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তার আর অধিকার কি আছে? কাজেই আমি এই সকল কথারই খুব করিয়া দোহাই দিলাম। আমি এই সকল কথা বলিলে তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং ঘরের ভিতর আসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি মুক্তকেশীর কোন সংবাদ জ্ঞাত আছি মনে করিয়া, তিনি তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুক্তকেশীর বৃত্তান্ত আমি যত দূর জানি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে এ ব্যাপারের মধ্যে যে ভয়ানক চক্রান্ত আছে, তাহার কথাও

বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ অল্প পরিচিত ব্যক্তির নিকট সে সকল রহস্য ব্যক্ত করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। যাহাতে মুক্তকেশীর সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার অলীক আশার সঞ্চার না হয়, আমি সাবধানতা সহকারে, সেইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম এবং বুঝাইয়া দিলাম যে, যে ব্যক্তির কৌশলে মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে কে তাহাই নির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে আমার স্কন্ধে কোন দোষ না স্পর্শে, এই বিবেচনায় আমি বলিলাম যে, মুক্তকেশী কোথায় আছেন তাহা সন্ধান করিবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না এবং তাঁহাকে যে আর সজীব অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, এমন আশাও আমার নাই। আমার বিশ্বাস, দুই ব্যক্তি কৌশল করিয়া মুক্তকেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই দুই ব্যক্তির দ্বারা আমি ও আমার কয়েকজন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তিকে মর্ম্মান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব সেই দুই পাষণ্ডকে তাহাদের পাপোচিত শাস্তি প্রদান করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধা রোহিণীর মন এতই চিন্তাকুল হইয়াছিল যে, তিনি প্রথমতঃ আমার বাক্যের মর্ম্ম সুন্দর রূপে প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন না। আবার আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায়, ধীরভাবে ও পরিষ্কার রূপে, বুঝাইয়া দিলাম। কারণের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের লক্ষ্যের যে অবিসম্বাদিত একতা আছে তাহার আর সন্দেহ কি? তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং যে পাষণ্ডেরা মুক্ত-

কেশীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের শাস্তির জন্য তাঁহার দ্বারা যে কোন সাহায্য সম্ভব তিনি তাহাতেই সম্মত আছেন বলিলেন। এরূপ স্থলে মূল হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চেষ্টা করিলে আমার পক্ষে এবং তাঁহার বলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমি, তাঁহাদের আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর এপর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, আমি নিম্নে তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম।

তারার খামার হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসিবেন স্থির করেন। কিন্তু রেল গাড়িতে মুক্তকেশীর এরূপ দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা যায় যে, কলিকাতা পর্য্যন্ত না আসিয়া, তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে এক ষ্টেশনে নামিয়া, এক সপ্তাহ কাটাইতে হয়। তাহার পর কলিকাতায় আসা হইল এবং রোহিণী পূর্ব্বে যে বাসায় থাকিতেন, সেই বাসায় এক মাস থাকার পর, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় তাঁহাদের বাসা বদল করিতে হয়। নূতন বাসায় যাইতে মুক্তকেশী অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং পাছে কলিকাতায় আবার কেহ তাহার সন্ধান পায় এই ভয়ে সে নিতান্ত ভীত হয়। তাহার সঙ্গে নিয়ত থাকায় রোহিণীরও অনেকটা এইরূপ অকারণ ভীতি-প্রবণ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তিনিও আর কলিকাতায় না থাকিয়া, অতঃপর মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া, স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে

মনস্থ করিলেন। গোপীনাথপুর নামক গ্রামে তাঁহার স্বামী দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। রোহিণী সেই স্থানেই বাস করিতে মানস করিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল; সুতরাং সেখানে থাকাই বিশেষ সুবিধা। মুক্তকেশী কোন মতেই তাহার মাতার নিকট যাইবে না ও থাকিবে না। কারণ একবার সেখান হইতে তাহাকে রাজা ধরিয়া লইয়া গিয়া আবার গারদে পুরিয়াছিলেন; এবারও তিনি নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ সেখানে সন্ধান করিবেন এবং মুক্তকেশী তথায় গমনমাত্র আবার ধরা পড়িবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া রোহিণী গোপীনাথপুর আসিলেন।

এখানে আসিয়া মুক্তকেশীর কঠিন পীড়া দেখা দিল। লীলাবতী দেবীর সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিবাহ-সম্বাদ একখানি দুপয়সা দামের শস্তা খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়ার পর হইতে, মুক্তকেশীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করান হইল। তিনি বলিলেন,—"রোগীর হৃদ্রোগ হইয়াছে।" অনেক দিন পরে মুক্তকেশী একটু ভাল হইল বটে, কিন্তু পীড়া একবারে সারিল না; মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। এইরূপে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া যাওয়ার পর, মুক্তকেশী জেদ ধরিল যে সে একবার কালিকাপুর যাইবেই যাইবে এবং যেমন করিয়া হউক, রাণী লীলাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবেই করিবে। এই নিতান্ত অসঙ্গত এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক অভিসন্ধি পরিত্যাগ করাইবার জন্য রোহিণী যথা-

সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুক্তকেশী কোন যুক্তির কথা-তেই কর্ণপাত করিল না। তাহার এরূপ অভিপ্রায়ের কারণ কি জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলে সে বুঝা-ইয়া দিল যে, ইহসংসারে তাহার কালপূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; সে এমন কোন কথা জানে যাহা রাণী লীলাবতীকে গোপনে জানান নিতান্ত আবশ্যক। যে ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি বলি-লেন যে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করিলে তাহার পুনরায় কঠিন পীড়া হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহাতে মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং স্নেহ-পরায়ণা রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হইল।

গোপীনাথপুর হইতে হুগলী আসিবার পথে কালিকাপুর অঞ্চলের একটী লোকের সহিত রোহিণীর আলাপ হয়: সে ব্যক্তি বাসস্থান সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ বেশ জানে-শুনে চিনে। তাহারই নিকট হইতে, রোহিণী জানিতে পারিলেন যে, কালিকাপুরের ক্রোশ দুই দূরে শ্যামপুর নামে একটী সামান্য পল্লীগ্রাম আছে। সেখানে রাজা বা রাজবাটীর লোক যাতায়াত করার খুব অল্প সম্ভাবনা। সুতরাং সেইরূপ স্থানে গিয়া থাকিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। তিনি মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া, সেই স্থানে এক গৃহস্থের বাটির মধ্যে একখানি ঘরভাড়া করিয়া থাকিলেন। এই স্থান হইতে মুক্তকেশী যতবার লীলার সহিত দেখা করিবার জন্য কালিকাপুরের কাঠের

ঘরে যাওয়া আসা করিয়াছিল, ততবারই তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দূর নিতান্ত কম নয়—প্রায় দুই ক্রোশ। রাণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর যাহা বলিবার আছে, তাহা পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য, রোহিণী ঠাকুরাণী মুক্তকেশীকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দধামে লীলাবতী দেবীকে মুক্তকেশী যে নামহীন পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, সে আর পত্রের উপর কোন মতেই নির্ভর করিতে সম্মত হয় নাই। একাকিনী যাইয়া রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার দৃঢ় সংকল্প।

যখন যখন মুক্তকেশী, রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়, কাঠের ঘরে যাইত, রোহিণী ঠাকুরাণীও তখন তখন তাহার সঙ্গে যাইতেন; কিন্তু তিনি খুব দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সুতরাং সেখানে কি ঘটিত তাহা তিনি দেখিতে বা জানিতে পারিতেন না। এইরূপে নিত্য সুদূর পথ যাতায়াত করায়, মুক্তকেশীর ভগ্ন স্বাস্থ্য অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং অবশেষে রোহিণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল আবার মুক্তকেশীর বুকে বেদনা হইল এবং গোপীনাথপুরে তাহার যেমন অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, সেইরূপ হওয়ায় মুক্তকেশী শয্যাগত হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায়, মুক্তকেশীর উদ্বেগ শান্তির জন্য, দয়াময়ী রোহিণী ঠাকুরাণী মুক্তকেশীর পরিবর্তে স্বয়ং রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন তিনি কাঠের ঘরের নিকটস্থ হইয়া রাণীকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন একজন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ প্রবীন ভদ্রলোক পুস্তক হস্তে

অপেক্ষা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই ব্যক্তি জগদীশনাথ চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় অত্যল্পকাল নিবিষ্টমনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি এস্থানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করেন?" রোহিণী কোন উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই, তিনি আবার বলিলেন, "আমি রাণী মাতার একটি কথা একজনকে বলিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু যে লোককে সে কথা বলিতে হইবে, তাহার আকৃতির যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহার সহিত আপনার আকৃতির ঐক্য হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রোহিণী নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা চৌধুরী মহাশয়কে জানাইলেন এবং সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন যে, চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্য তিনি তাঁহাকে জানাইলে দুঃখিনী মুক্তকেশীর হৃদয় অনেক শান্ত হইবে। চৌধুরী মহাশয় এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সংবাদ অতিশয় প্রয়োজনীয়; রাণী লীলাবতী দেবীর বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে যদি মুক্তকেশী বা তাঁহার সঙ্গিনী আর অধিক দিন এ প্রদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারিবেন; সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাদের এস্থান হইতে কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। তিনিও শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছেন। যদি মুক্তকেশী ও রোহিণী ঠাকুরাণী কলিকাতায় গিয়া তাঁহাদের ঠিকানা রাণী মাতাকে লিখিয়া জানান, তাহা হইলে অদ্য হইতে এক পক্ষ কালের মধ্যে তাঁহাদের সহিত রাণী মাতার সাক্ষাৎ ঘটিবে। তিনি বন্ধুভাবে

মুক্তকেশীকে এই হিতপরামর্শ জানাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তকেশী তাঁহাকে অপরিচিত জানিয়া, এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে তিনি নিকটস্থ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার কোনই সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া রোহিণী নিতান্ত ভীত ও কাতর ভাবে বলিলেন যে, নিরাপদে মুক্তকেশীকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই তাঁহার প্রধান কামনা ; কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে তাহাকে আপাততঃ স্থানান্তরিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কারণ সে সম্প্রতি সুকঠিন পীড়ায় শয্যাগত। এজন্য চিকিৎসক ডাকা হইয়াছে কিনা, চৌধুরী মহাশয় জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে রোহিণী বলিলেন, পাছে তাহাতে তাঁহাদের বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি বৈদ্য ডাকিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন চৌধুরী বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং একজন ডাক্তার ; যদি রোহিণীর আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া মুক্তকেশীর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছেন। রোহিণী ঠাকুরাণী মনে মনে ভাবিলেন, এই ভদ্রলোক যখন রাণী লীলাবতী দেবীর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং তাঁহার নিয়োজিত বার্ত্তাবহ তখন ইহাঁকে বিশ্বাস করাই সঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদনন্তর উভয়ে শ্যামপুরের কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যখন কুটীরাগত হইলেন তখন মুক্তকেশী নিদ্রিত ছিল। চৌধুরী মহাশয় তাহাকে দর্শন মাত্র চমকিয়া উঠিলেন। নিশ্চয়ই রাণী লীলাবতী দেবীর সহিত পীড়িতার অত্যদ্ভুত

আকৃতিগত সাদৃশ্য সন্দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রোহিণী ঠাকুরাণী এ সকল রহস্য কিছুই জানিতেন না ; তিনি মনে করিলেন, মুক্তকেশীর পীড়ার আতিশয্য দর্শনে চৌধুরী মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় মুক্তকেশীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। রোগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে তিনি রোহিণীকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতি সন্তর্পণে রোগিণীর হাত দেখিলেন। তাহার পর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি গ্রাম্য চিকিৎসকের আলয়ে গমন করি-লেন এবং তথা হইতে আবশ্যকমত ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। রোহিণীকে তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই ঔষধ সেবন করিলে মুক্তকেশীর শরীরে যথেষ্ট শক্তি জন্মিবে এবং কলিকাতা গমনের পথশ্রম তিনি সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন। অদ্য এবং কল্য নিয়মিত রূপে ঔষধ সেবন করিলে পরশ্ব কলিকাতায় যাওয়ার কোন অসুবিধা থাকিবে না। পরশ্ব দ্বিপ্রহরের গাড়িতে যাহাতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহারা উক্ত সময়ে রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন যে, মুক্তকেশীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে ; তিনি তৎক্ষণাৎ যথাবিহিত সাহায্য করি-বার জন্য, পুনরায় এই কুটীরে চলিয়া আসিবেন। এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবনে মুক্তকেশীর বিশেষ উপকার হইল। অচিরে কলিকাতায় রাণীর সহিত তাহার

সাক্ষাৎ হইবে এই আশ্বাসে, সে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত দিনে নিয়মিত সময়ে তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎকালে একটী প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটিও এই গাড়িতে কলিকাতায় যাইবেন। চৌধুরী মহাশয় যত্ন সহকারে তাঁহাদের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা রাণী মাতাকে লিখিয়া জানাইবার জন্য, রোহিণীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক অন্য কামরায় প্রবেশ করিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল, তাহার কোন সন্ধান রোহিণী জানেন না। রোহিণী কলিকাতায় বাসা স্থির করিয়া, অঙ্গীকারানুসারে, রাণী লীলাবতীদেবীর নিকট ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। এক পক্ষ কাটিয়া গেল তথাপি কোন উত্তর আসিল না। আরও কয়েক দিন পরে যে প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদের ষ্টেশনে দেখা হইয়াছিল, তিনি রোহিণীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে রাণী মাতা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন; মুক্তকেশীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি অগ্রে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। এ কার্য্যে তাঁহার আধঘণ্টার অধিক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রোহিণী সম্মত হইলেন। মুক্তকেশী তথায় উপস্থিত ছিল; সেও বিশেষ উত্তেজনা করিল। তখন রোহিণী ও সেই প্রবীণা স্ত্রীলোক এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়িতে

উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সেই স্ত্রীলোক রঙ্গমতী দেবী।" কিয়দ্দূর যাওয়ার পর, সেই স্ত্রীলোক একটা ভবনদ্বারে গাড়ি থামাইতে বলিলেন এবং রোহিণীকে বলিলেন যে, এই বাটীতে একটা সামান্য কাজ আছে, ২।১ মিনিটেই তিনি তাহা শেষ করিয়া আসিবেন; ততক্ষণ রোহিণী দেবীকে একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তিনি ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু আর বাহির হইলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রোহিণীর বড় ভয় হইল। তখন তিনি তাঁহার বাসায় গাড়ি ফিরাইয়া আনিবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন। গাড়ি কিঞ্চিদধিক আধ ঘণ্টার মধ্যে বাসায় ফিরিয়া আসিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, মুক্তকেশী বাসায় নাই!

বাসার নীচেতলায় একটি বৃদ্ধা বাস করিত, উপরতলায় মুক্তকেশী ও রোহিণী থাকিতেন। রোহিণী সেই বৃদ্ধার নিকট সন্ধান পাইলেন যে, তিনি প্রস্থান করিবামাত্র, একটি বালক একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং বৃদ্ধাকে বলিয়াছিল, উপরতলায় যে স্ত্রীলোক থাকেন তাঁহাকেই এই চিঠি দিতে হইবে। বৃদ্ধা বালককে উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে, সে পত্র দিয়া তখনই চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তকেশী একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মুক্তকেশীর ঘর খুঁজিয়া সে চিঠিখানি পাওয়া গেল না। অতএব নিশ্চয়ই চিঠিখানি তাহার সঙ্গে ছিল। চিঠিখানিতে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রলোভনজনক সংবাদ

ছিল। নচেৎ মুক্তকেশী কদাপি কলিকাতার পথে একাকিনী যাইতে সাহস করিত না।

উদ্বেগের প্রথম তরঙ্গ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, রোহিণী স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে বাতুলালয়ে সন্ধান করা আবশ্যক। তদভিপ্রায়ে পরদিন প্রাতে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, সেরূপ কোন ব্যক্তিই সেখানে নাই। সম্ভবতঃ কল্পিত মুক্তকেশী বাতুলালয়ে নিরুদ্ধ হওয়ার দুই এক দিন পূর্ব্বে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি মুক্তকেশীর জননী হরিমতির নিকট তাঁহার কন্যার সন্ধানার্থে পত্র লিখিলেন। এপত্রের যে উত্তর আসিল তাহাতে জানা গেল, তিনি মুক্তকেশীর কোনই সন্ধান জানেন না। তাহার পর আর কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তৎকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনি মুক্তকেশীর সম্বন্ধে কোন সংবাদই জ্ঞাত নহেন এবং সে সহসা কোথায় গেল, বা কেন গেল তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট এই পর্য্যন্ত মাত্র সংবাদ পাওয়া গেল। যদিও এ সকল সংবাদ আমার অপরিজ্ঞাত, তথাপি এতদ্দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সহায়তা

হইবে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে,চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া মুক্তকেশীকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং তাহাকে রোহিণীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। স্বামী কিম্বা স্ত্রীকে অথবা উভয়কেই রাজবিচারে দণ্ডিত করিতে পারা যায় কি না, তাহার বিচার ভবিষ্যতে করিলেও চলিতে পারিবে। কিন্তু অধুনা আমার হৃদয়ে যে প্রবল অভিসন্ধি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা আমি অন্য পথে চালিত হইলাম। রাজা প্রমোদরঞ্জন সংক্রান্ত দুর্জ্জেয় রহস্যের কিঞ্চিন্মাত্রও আভাস লাভ করার আশয়ে আমি রোহিণীর সহিত সাক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তদ্ধেতু বিগত ঘটনা সংক্রান্ত তাঁহার স্মৃতির অন্যান্য অংশ স্পষ্টীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে, পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম। আমি বলিলাম,—"এই বিষাদজনক ব্যাপারে আপনার কোন প্রকার সহায়তা করা আমার আন্তরিক বাসনা। আমি আপনার বিপদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। আপনি মুক্তকেশীকে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, লোকে আপনার পেটের সন্তানের জন্যও সেরূপ করিতে পারে না।"

রোহিণী বলিলেন,—"ইহাতে বিশেষ কিছুই প্রশংসার কথা নাই। আহা! সে আমার পেটের মেয়ের মতই ছিল। আমি তাহাকে অতি শৈশব কাল হইতে অনেক কষ্টে মানুষ করিয়াছি। আমি তাহাকে মানুষ করিবার জন্য যদি এত কষ্ট না করিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য আমার আজি

কোন কষ্ট হইত না। আমার নিজের কখন ছেলেপিলে হয় নাই। এত দিন পরে মুক্তকেশীও আমাকে ছাড়িয়া গেল।” এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, বৃদ্ধা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—“আপনি কি মুক্ত-কেশীর জন্মের পূর্ব্বেও হরিমতিকে জানিতেন?”

মুক্তকেশী হইবার বেশী দিন আগে নয়—৩ মাস আগে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। সর্ব্বদা দেখা শুনা হইত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কখনই হয় নাই।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—“হরিমতির বাড়ীর কাছেই কি আপনার বাড়ী ছিল?”

তিনি উত্তর দিলেন,—“হাঁ মহাশয়, পুরাণ রামনগরে আমা-দের খুব কাছাকাছি বাড়ী ছিল।”

“পুরাণ রামনগর? তবে কি হুগলি জেলায় ঐ নামে দুইটা গ্রাম আছে?”

“২০।২৫ বৎসর আগে তাই ছিল বটে। নদীর ধারে রাম-নগরের প্রায় আধ ক্রোশ দূরে এক গ্রাম বসিয়াছিল। এই নূতন রামনগরের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং পুরাণ রামনগর হইতে একে একে সকল লোক উঠিয়া গিয়া নূতন রামনগরে ঘর বাঁধিতে লাগিল। এখন রামনগর বলিলে নূতন রামনগরই বুঝায়। কেবল গ্রামের ঠাকুরবাড়ী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাড়া আর প্রায় সকল লোকই ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে।”

“ঐ স্থানেই কি আপনারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছেন?”

"না মহাশয়। আমার স্বামী প্রথমে বড় দরিদ্র ছিলেন। হুগলি জেলার একটি বড় লোক তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে আমার স্বামী বহুদিন কর্ম্ম করেন। হাতে কিছু টাকার সংস্থান হইলে, তিনি কাজ-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, রামনগরে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। আমরা নিঃসন্তান; সুতরাং আমাদের অধিক টাকাকড়ির দরকার ছিল না। আমরা সেখানে বাস করার এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে হরিমতি ও তাহার স্বামী সেই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

"ইহার পূর্ব্বেও আপনার স্বামীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল কি?"

"হরিমতির স্বামী রামধন চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার স্বামীর পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। ঐ গ্রামে বর্দ্ধমানের রাজার যে ঠাকুর-সেবা আছে তাহারই গমস্তার পদ খালি হওয়ায়, উক্ত রামধন চক্রবর্ত্তী জোগাড় করিয়া সেই পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। সেই অবধি তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে রামনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহারা রামনগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন, তখন চক্রবর্ত্তীর বয়স অনুমান ৪০ বৎসর এবং তাঁহার গৃহিণী হরিমতির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। মুক্তকেশী তখন পেটে। তাঁহারা আমাদের বাটীর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করার পর ক্রমে জনরব হরিমতির সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া গেল, বিবাহের পর হইতে হরিমতির সহিত তাহার স্বামীর বনিবনাও ছিল না; সে স্বামীর নিকটেও

থাকিত না। স্বামী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে ঘরে আনিতে পারেন নাই; সে কেবলই বাপের বাড়ীতে থাকিত এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিত। তাহার পর হঠাৎ হরিমতির মতিগতি ফিরিল, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে সম্মত হইল। কেন যে তাহার হঠাৎ এমন মন হইল তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, সে স্বামীর ঘরে আসার কিছু পরেই চক্রবর্ত্তীর এই চাকরি জুটিল এবং তদবধি তাঁহারা রামনগরে বাস করিতে থাকিলেন। এরূপ স্ত্রীকে কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু চক্রবর্ত্তী বড় ভাললোক; এমন স্বতন্ত্রা স্ত্রীকেও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। আমাদের সহিত যতই আলাপ পরিচয় বাড়িতে লাগিল, ততই আমরা বুঝিতে পারিলাম, হরিমতি বড় খোষপোষাকী, বেহায়া, স্বতন্ত্রা লোক। কিসে লোকে তাহার রূপের প্রশংসা করিবে, এই চেষ্টায় সে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিত। স্বামী তাহার জন্য যত্নের কোনই ত্রুটি করিতেন না; কিন্তু সে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। আমার স্বামী নিয়তই বলিতেন, পরিণামে ইহাদের বড়ই অমঙ্গল হইবে। শীঘ্রই সেই কথা ফলিল। তাঁহারা রামনগরে ৪।৫ মাস থাকিতে না থাকিতেই, ভয়ানক কলঙ্কের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। দুই জনেরই তাহাতে দোষ ছিল।"

"স্বামী স্ত্রী দুই জনেরই দোষ?"

"না না। চক্রবর্ত্তী বেচারার কোন দোষ ছিল না। তিনি দয়ার পাত্র, তাঁহার স্ত্রী আর যে ব্যক্তি————"

"আর যে ব্যক্তির জন্য এই কলঙ্কের উৎপত্তি?"

"হাঁ। সে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম—এরূপ জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই উচিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে জানেন—আমার মুক্তকেশী তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত।"

"রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়?"

"হাঁ। রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ই বটেন।"

আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজার যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল এবং যাহা জানিতে পারিলে রাজাকে নিশ্চয় করতলস্থ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস, বুঝি এতক্ষণে সেই রহস্য ব্যক্ত হইবার সূত্রপাত হইতেছে মনে করিয়া, আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কত রহস্য জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, কত বিপদবাত্যা অতিক্রম করিয়া সে মূল রহস্য আমার আয়ত্ত-গত হইবে আমি তখন তাহার কিছুই জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা প্রমোদরঞ্জন কি তৎকালে আপনাদের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেন?"

"না মহাশয়, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রামে আসি-তেন। প্রথমে যখন তিনি আইসেন তখন তাঁহাকে কেহ জানিত না; ক্রমে তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ হয়।"

"তিনি যখন প্রথমে আপনাদের গ্রামে আইসেন, তখন মুক্তকেশীর জন্ম হইয়াছিল কি?"

"মুক্তকেশী যখন ৭।৮ মাসের তখন রাজা আমাদের গ্রামে প্রথম দেখা দেন।"

"রাজা সকলের নিকটে অপরিচিত ছিলেন, হরিমতিও তাঁহাকে চিনিত না কি?"

"আমরা প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে যখন এই কলঙ্ক প্রচার হইয়া পড়িল তখন আর তাঁহাদের আলাপ ছিল না, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। সে ঘটনা আমার এমনই মনে পড়িতেছে, যেন তাহা কল্য ঘটিয়াছে। এক রাত্রিতে, হঠাৎ রামধন চক্রবর্ত্তী আমাদের জানালা দিয়া এক মুঠা ঢিল ফেলিয়া দিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইলেন; তাহার পর আমার স্বামীকে, বাহিরে যাইয়া তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত, বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। তাহার পর আমার স্বামী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,—'সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমি যাহা বরাবর মনে করিতাম তাহাই ঘটিয়াছে। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর বাক্সে নানা প্রকার মহামূল্য অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি মনে করিতেছেন তাঁহার স্ত্রী সে সকল সামগ্রী চুরি করিয়াছেন?' তিনি উত্তর দিলেন,—'আরে না পাগলি, না। চুরি করা মহাপাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু এ তার চেয়েও মহাপাপ। সেই যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সহিত চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর খুব ভাব। তাহারা গোপনে কথাবার্ত্তা কহে, দেখাসাক্ষাৎ করে; এখন সহজেই বুঝিয়া দেখ এসকল অলঙ্কার তাহার বাক্সে কেমন করিয়া আসিল। আমি চক্রবর্ত্তীকে বিশেষ

সাবধান থাকিয়া, আরও প্রমাণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছি।' আমি বলিলাম,—'কিন্তু তোমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী যে এইরূপ একজন চির অপরিচিত লোকের সহিত হঠাৎ ভ্রষ্টা হইবে ইহা ত আমার কখন সম্ভব মনে হয় না।' আমার স্বামী বলিলেন —'তুমি মনে করিয়া দেখ, চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী শত সাধ্যসাধন ; তেও কখন স্বামীর ঘর করিতে রাজি হয় নাই। তাহা. পর, বলা নাই কহা নাই, আপনি ইচ্ছা করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা নিগূঢ় কাণ্ড রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আর দিন দুই চুপ করিয়া থাক না ; সকল কথাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।' হইলও তাই। দিন দুই পরে বিষম কলঙ্কের ঢাক বাজিয়া উঠিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রোহিণী ঠাকুরাণী একটু নীরব হইলেন। আমি মনে করিতে লাগিলাম, যে বিষম রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইবার সূচনা হইতেছে কি ? স্ত্রীচরিত্রের এম্ববিধ ভঙ্গুরতা এবং পুরুষচরিত্রের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ সংসারে প্রতিনিয়তই চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিত্য পরিদৃষ্ট সামান্য ঘটনার মধ্যে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের আজীবন ভীতি-বিধায়ক রহস্যের মূল নিহিত থাকা সম্ভব কি ?

রোহিণী ঠাকুরাণী আবার বলিতে লাগিলেন,—"তার পর মহাশয়, চক্রবর্ত্তী আমার স্বামীর পরামর্শ-মতে চুপ করিয়াই থাকিলেন। অধিক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে

হইল না। পরদিনই সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী ও রাজা প্রমোদরঞ্জন, ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে, একটা গোপন স্থানে দাঁড়াইয়া, ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। চক্রবর্ত্তীকে দেখিবা মাত্র রাজা থতমত খাইয়া যেরূপভাবে আত্ম-চরিত্রের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে তাহার অপরাধ আরও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দারুণ অপমান হেতু অতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া রাজাকে প্রহার করিলেন। কিন্তু রাজার জোরে তিনি পারিবেন কেন? রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুররূপে যৎ-পরোনাস্তি প্রহার করিলেন। গোলমালে চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। অপমানের সীমা থাকিল না। সেই রাত্রে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, যখন আমার স্বামী চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, তখন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। চক্রবর্ত্তী কোথায় গিয়াছেন কেহই বলিতে পারিল না। চক্রবর্ত্তী সেই অবধি নিরুদ্দেশ। তাঁহার জন্য গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকেই দুঃখিত হইল এবং তাঁহার অনেক সন্ধান করিল; কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অনেকদিন পরে, কাশ্মীর হইতে তিনি আমার স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি আজিও জীবিত আছেন; কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত কোন লোকের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই; তাঁহার স্ত্রীর সহিত কদাচ সাক্ষাৎ ঘটা নিতান্তই দুরাশা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাজা কি করিলেন? তিনি কি নিকটেই কোথায় থাকিলেন?"

"না। সেখানে আর কি তিনি থাকিতে পারেন? সেই রাত্রেই হরিমতির সহিত তাঁহার অত্যন্ত বচসা হইল। পরদিন হইতে তিনিও অন্তর্দ্ধান হইলেন।"

"আর হরিমতি? নিশ্চয়ই এ ঘোর কলঙ্কের পর তিনি আর সে গ্রামে বাস করিতে পারিলেন না।"

"তিনি খুব থাকিলেন। তাঁহার কঠিন হৃদয়, অপমান বা কুৎসা দ্বারা, বিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তিনি অম্লান বদনে সকলের উপর টেক্কা দিয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি জোর করিয়া সকলকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিতান্ত অমূলক মিথ্যা অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী। যখন পুরাণ গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোকে নূতন গ্রামে ঘর বাঁধিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনিও সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া গিয়া ঘর বাঁধিলেন। সেই বেহায়া মেয়েমানুষ অদ্যাপি সেখানেই আছেন এবং বোধ হয় মরণ পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহার চলিতেছে কেমন করিয়া? তাঁহার স্বামী তাঁহাকে এই কাণ্ডের পর আর সাহায্য করিতে কখনই সম্মত নহেন।"

"না মহাশয়, তিনি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। তিনি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ অভাগিনী স্ত্রীলোক যখন তাঁহারই স্ত্রী-পরিচয়ে তাঁহারই বাটীতে বাস করিতেছে, তখন সে যতই কেন মন্দ হউক না, তাহাকে অন্নাভাবে ভিখারিণীর ন্যায় মরিতে দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে। অতএব তিন মাস অন্তর,

কলিকাতায় এক নির্দ্দিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে গ্রাসাচ্ছাদনের অনুরূপ সাহায্য পাইবে।”

“হরিমতি সেইখান হইতে টাকা আনিয়া থাকেন?”

“কদাপি না। তিনি বলেন, তাঁহাকে যদি অত্যন্ত প্রাচীনা হইয়াও মরিতে হয়, তাহা হইলেও তিনি কখন রামধন চক্রবর্ত্তীর নিকট এককড়া কড়িও গ্রহণ করিবেন না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর, চক্রবর্ত্তীর ঐ চিঠি আবার আমার চক্ষে পড়ায়, আমি হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে যদি তোমার কোন অভাব হয়, আমাকে তাহা জানাইও। সে তাহার উত্তরে বলিয়াছিল অন্নাভাবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব সেও স্বীকার, তথাপি চক্রবর্ত্তীর বা তাহার কোন আত্মীয় লোককে আমি দুঃখের কথা কখনই জানাইব না।”

“আপনার কি বোধ হয় তার নিজের টাকা কড়ি আছে?”

“যদিই থাকে তো সে অতি সামান্য। লোকে বলে, আমারও তাই মনে হয়, রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে গোপনে সাহায্য করিয়া থাকেন।”

এপর্য্যন্ত যে যে কথা শুনিলাম তাহাতে রাজার সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ রহস্য-বিষয়ক সন্ধানই তো পাওয়া গেল না। কেবল একটা কথা আমার মনে অতিশয় সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী, এই দারুণ অপমানের পরও, সেই গ্রামে কেন জোর করিয়া বাস করিতে লাগিল, তাহার কোন মীমাংসা করিতে আমি সক্ষম হইলাম না। সেই স্থানে

নিরন্তর বাস করিতে করিতে ক্রমে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণিত হইবে মনে করিয়া সে সেখানে থাকিয়া গেল ; এ সিদ্ধান্ত বিশেষ সারবান নহে। আমার যেন মনে হইল, তাহাকে বাধ্য হইয়া অগত্যা রামনগরে থাকিতে হইল। কিন্তু কে তাহাকে বাধ্য করিয়া সেই স্থানে রাখিল ? সহজেই অনুমান হইতেছে, যে তাহাকে অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেছে, সেই তাহাকে নিশ্চয়ই রামনগরে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। সে স্বামীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে নাই, তাহার নিজের বিশেষ টাকা কড়ি নাই, এরূপ পতিত, কলঙ্কিত, আত্মীয়বিহীন স্ত্রীলোকের অন্যত্র সাহায্য লাভ করাও সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে জনরব যাহা ঘোষণা করিতেছে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু কেন ? তাহাকে নিয়ত অর্থ সাহায্য করিয়া সেই রামনগরে রাখায় রাজার উদ্দেশ্য কি ? কি দুরভিসন্ধি সংগোপিত রাখিবার জন্য এই অনুষ্ঠান ? হরিমতির সহিত রাজার প্রসক্তির কথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, অথবা মুক্তকেশীর পিতৃত্ব বিষয়ক তাঁহার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই অনুষ্ঠান কদাপি সঙ্গত নহে। কারণ তত্রত্য জনসাধারণ এ সকল ব্যাপার অতিশয় বিশ্বাস করে, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস কদাপি এতদুপায়ে তিরোহিত হইবার নহে। তবে কি ? নিশ্চয়ই এ ব্যবহারের অভ্যন্তরে গূঢ় অভিসন্ধি আছে। রাজার জীবনের সহিত যে এক ভয়ানক রহস্য সংযোজিত আছে এবং যাহা হরিমতি জানে ও সম্ভবতঃ মুক্তকেশী জানিত

তাহাই প্রচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে হরিমতিকে সেই স্থানে থাকিতে হইয়াছে। এখন আমার স্পষ্টবোধ হইতেছে, রাজার সহিত গোমস্তা-পত্নীর গুপ্ত আলাপে যে সকল কথা চলিত, তাহা যদি আর কোন ব্যক্তির শ্রবণ পথে পড়িত হইত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিত।

তবে কি এ ঘটনায় লোকের অনুমান সত্য নয়? তবে লোকে যে অবৈধ প্রণয় এ ব্যাপারে মূল বলিয়া অনুমান করিয়াছে তাহা কি অমূলক? তবে হরিমতি যে মিথ্যা অপবাদের কথা সমর্থন করিয়াছে তাহাই কি সত্য? তবে কি প্রকৃত কথা লোককে জানিতে না দিবার জন্যই রাজা ও হরিমতি এই সন্দেহজনক ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিলেন? এইরূপ মীমাংসাই আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। রাজার রহস্যের মূল এই স্থানে নিহিত আছে, তাহা আমার বেশ হৃদ্গত হইল।

তদনন্তর নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, হরিমতি যখন স্বামীর ঘরে আইসে নাই, তখন সে ব্যভিচারিণী ছিল এবং অবশ্যম্ভাবী কলঙ্ক গোপন করিবার জন্যই সে স্বতঃ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্থান ও কালের আলোচনা করিয়া আমার নিসঃন্দেহ প্রতীতি জন্মিল যে, হরিমতির কন্যা মুক্তকেশী কোন মতেই রামধন চক্রবর্ত্তীর ঔরসজাত কন্যা হইতে পারে না। কিন্তু রাজা প্রমোদরঞ্জন মুক্তকেশীর পিতা কি না, তাঁহার সহিত হরিমতির পূর্ব্বাবধি প্রসক্তি ছিল কি না এ সম্বন্ধে বিশেষ

কোন প্রমাণ আমি দেখিতে পাইলাম না। যদি আকৃতি ধরিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে মুক্তকেশীকে রাজা প্রমোদরঞ্জনের কন্যা বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজা যখন আপনাদের গ্রামে যাতায়াত করিতেন, তখন আপনি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন।"

রোহিণী বলিলেন,—"হাঁ, অনেকবার দেখিয়াছি।"

"তাঁহাকে দেখিয়া মুক্তকেশীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা কখন আপনার মনে উদিত হইয়াছিল কি?"

"না মহাশয়, তাঁহার সহিত মুক্তকেশীর আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য ছিল না।"

"তবে কি মুক্তকেশীর চেহারা তার মার মত?"

"না, মার মতও নয়।"

মাতার অনুরূপও নহে এবং আনুমানিক পিতার অনুরূপও নহে। আকৃতিগত সাদৃশ্য যে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, তাহা আমি জানি। এবং সেরূপ ঘটনা যে এককালে উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে তাহাও বুঝি। তাহার পর মনে করিলাম, রাজা প্রমোদরঞ্জন ও হরিমতির রামনগরে আবির্ভাবের পূর্ব্বে, জীবনের কিরূপ ভাব ছিল তাহার সন্ধান করিতে পারিলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"যখন রাজা প্রমোদরঞ্জন প্রথমে আপনাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি কোথা হইতে আসিলেন আপনারা শুনিয়াছিলেন কি?"

"না মহাশয়। কেহ বলিত তিনি কৃষ্ণসরোবর হইতে আসিয়াছেন এবং কেহ বলিত উত্তর দেশ হইতে আয়িয়াছেন; কিন্তু ঠিক খবর কেহই জানিত না।"

"বিবাহের পর স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে, হরিমতি কোথায় থাকিত বা কি করিত তাহার কোন সন্ধান আপনি জানেন কি?"

"সে বিবাহের পরে, স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে পিত্রালয়েই থাকিত। শুনিয়াছি তৎকালে তাহার বাপের বাড়ীর দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে তাহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল।"

"সে বড়লোকের বাড়ীতে সে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিত?"

"শুনিয়াছি সেই বড়লোকের বাড়ীর এক জন স্ত্রীলোকের সহিত হরিমতির খুব ভাব ছিল। সেই জন্যই সে সেখানে যাওয়া আসা করিত।"

"এমন ভাবে কত দিন সে যাতায়াত করিত তাহা আপনি জানেন কি?"

"ঠিক জানি না; তবে ৩। ৪ বৎসর হওয়া সম্ভব।"

"সেই বড়লোকের নাম আপনি কখন শুনিয়াছেন কি?"

"হাঁ মহাশয়, তাঁহার নাম দীনবন্ধু রায়।"

"আচ্ছা, দীনবন্ধু রায়ের সহিত রাজা প্রমোদরঞ্জনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল, অথবা তিনি সে দিকে কখন কখন বেড়াইতে যাইতেন, এমন কথা আপনারা কেহ কখন শুনিয়াছেন কি?"

"না মহাশয়, এরূপ কথা আমরা কেহ কখন শুনি নাই।"

কি জানি, ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া, আমি দীনবন্ধু রায়ের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। কিন্তু আমার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, রাজা প্রমোদরঞ্জন কদাপি মুক্তকেশীর পিতা নহেন। আমি আরও স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, হরিমতির সহিত রাজার গুপ্ত সাক্ষাতের অবশ্যই অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং অবৈধ প্রণয় কদাপি তাহার কারণ নহে। তদনন্তর আমি রোহিণী ঠাকুরাণীকে মুক্তকেশীর বাল্যজীবন সংক্রান্ত দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম হয়ত এই কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে আমার অনুসন্ধানের অনুকূল দুই একটা কথা প্রকাশ হইয়াও পড়িতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই পাপে ও দুরবস্থায় জন্মিয়া বেচারা মুক্তকেশী কিরূপে আপনার হাতে পড়িল, তাহার কথা আমি কিছুই শুনি নাই।"

রোহিণী বলিলেন,—ইহজগতে ঐ দুঃখিনী বালিকার যত্ন করিতে আর কেহই ছিল না। পাপীয়সী জননী কন্যাকে, তাহার জন্মদিনাবধি, ঘৃণা করিত, যেন সেই সম্পূর্ণ অপরাধী। বালিকার এই অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড় কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে আমি নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম।"

"সেই সময় হইতে বরাবরই কি মুক্তকেশী আপনার কাছে থাকিত?"

"নিরন্তর আমার কাছে থাকিত না। হরিমতির ঘাড়ে

কখন কখন খেয়াল চাপিত। আমি তাহাকে মানুষ করিতেছি, আমার এই বিষম অপরাধের সাজা দিবার জন্যই যেন, তিনি সময়ে সময়ে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেন। কিন্তু এরূপ খেয়াল বড় বেশী দিন থাকিত না। মুক্তকেশীকে তিনি আবার ফিরাইয়া দিতেন। যদিও আমার নিকট থাকিয়া মুক্তকেশী খেলার সঙ্গী পাইত না এবং তাহাকে উৎসাহহীন হইয়াই থাকিতে হইত, তথাপি সে আমার কাছে আসিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইত। যখন হরিমতি তাহাকে আনন্দধামে লইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে সে অনেক দিন আমার কাছছাড়া ছিল। সেই সময়েই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। বুদ্ধি বড় কম, আর যেন কেমন বিমর্ষ ভাব। কিন্তু তখন দেখিতে মুক্তকেশী পরমা সুন্দরী। তাহার মা তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে, আমি তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলাম। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর রামনগরে থাকিতে আমার আর মন টিকিল না।”

“হরিমতি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন?”

“না। আনন্দধাম হইতে সে যেন আরও কঠিন-হৃদয়া ও কর্কশ-স্বভাবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। লোকে বলিতে লাগিল, রাজা প্রমোদরঞ্জনের হুকুম লইয়া তবে হরিমতি গ্রামান্তরে যাইতে পাইয়াছিল। আরও বলিতে লাগিল, ভগ্নীর টাকা আছে জানিয়া হরিমতি তাহার মরণকালে সেবা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার কিছু থাকা দূরে থাকুক, সৎকার করিবার মত পয়সাকড়িও ছিল না। এই সকল কথা

শুনিয়া, হয়ত হরিমতির মেজাজ আরও খারাপ হইয়াছিল। ফলতঃ মেয়ে লইয়া স্থানান্তরে যাইতে দিতে কোন মতেই রাজি হইল না, ববং আমার নিকট কন্যাকে থাকিতে না দিয়া, আমাদের উভয়কে কষ্ট দেওয়াই তাহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইল। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি গোপনে মুক্তকেশীকে বলিলাম,—'যদি কখন বিশেষ কোন কষ্ট উপস্থিত হয় তখন তুমি আমার কাছে পলাইয়া যাইও; আপাততঃ এই ভাবেই তোমাকে থাকিতে হইবে।' কত দিনই আমি কলিকাতায় থাকিলাম, মুক্তকেশী আর আমার নিকট আসিবার সুযোগ পাইল না। অবশেষে সেদিন পাগলাগারদ হইতে পলাইয়া, সে আমার নিকট উপস্থিত হইল।"

"আপনি জানেন কি, কেন রাজা তাহাকে এমন করিয়া আটকাইয়া রাখিতেন?"

"মুক্তকেশী আমাকে যাহা বলিয়াছে, আমি তাহাই জানি। সে এ সম্বন্ধে গোলমাল করিয়া কত কথাই বলিত, তাহা আমি সব বুঝিতে পারিতাম না। তাহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই, তাহার মাতা রাজার বিষয়ে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা জানিত। আমি রামনগর হইতে চলিয়া আসার বহুদিন পরে, সেই কথা কোন সময়ে তাহার মা তাহার নিকট বলিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর মুক্তকেশী সেই গোপনীয় কথা জানিতে পারিয়াছে বুঝিয়া, রাজা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে গোপনীয় কথা যে কি তাহা তাহাকে হাজার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিতে

পারিত না। কেবল বলিত, তার মা যদি মনে করে, তাহা হইলে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বোধ হয় হরিমতি তাহাকে ঐ কথাই বলিয়া থাকিবে। সে যদি বস্তুতঃ কিছু জানিত, তাহা হইলে আমাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিত, এমন তো কখন বোধ হয় না।"

আমারও মনের এইরূপ বিশ্বাস। আমি মনোরমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন কাঠের ঘরে রাণীর সহিত মুক্তকেশীর সাক্ষাৎ হয়, তখন যে লীলাবতী সত্য সত্যই কোন রহস্য জানিতে পারিতেন এমন বোধ হয় না। তাহার জননী হয়ত অসাবধানভাবে এমন কিছু বলিয়া থাকিবে, যাহা অবলম্বন করিয়া স্থূলবুদ্ধি মুক্তকেশী সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সেও রাজার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। পাপজনিত সন্দিগ্ধমনা রাজা মনে করিয়া থাকিবেন, মুক্তকেশী তাহার মাতার নিকট সমস্ত কথা জানিয়াছে এবং রাণীও মুক্তকেশীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন।

রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে আর কোন বিশেষ সংবাদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এবং সময়ও অনেক হইয়াছে বুঝিয়া, আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় বলিলাম,—"আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়াছি। আপনি হয়ত আমার উপরে কতই রাগ করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন,—"সে কি বাবা, আমি যাহা জানি তাহা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন তখনই আমি বলিতে রাজি আছি।" তাহার পর সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের পানে

চাহিয়া বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, আপনি মুক্তকেশীর খবর কিছু জানেন। যখন আপনি প্রথমে আসিলেন তখনই আপনার মুখ দেখিয়া আমার তাহা বোধ হইয়াছিল। সে আছে কি নাই, এ খবরটি পর্য্যন্ত না জানিয়া থাকা কত কষ্টকর তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। এরূপ অনিশ্চিত থাকার চেয়ে একটা ঠিক খবর পাওয়া বড়ই ভাল। আপনি বলিয়াছেন, তাহার সহিত আর সাক্ষাতের আশা নাই। আপনি জানেন কি, বলুন সত্য করিয়া, আপনি কি নিশ্চয় জানেন, ভগবান তাহার সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিয়াছেন?"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলাম—"বোধ হয় তাহাই ঠিক। আমি মনে মনে নিশ্চয় জানি, ইহজগতে মুক্তকেশীর সকল জ্বালার শান্তি হইয়া গিয়াছে।"

আমা বৃদ্ধা মাটীতে আছড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বলুন মহাশয়, আপনি এ সংবাদ কেমন করিয়া জানিলেন? কে আপনাকে এ কথা বলিল?"

আমি উত্তর দিলাম,—"কেহই আমাকে বলে নাই। কতকগুলি কারণে আমি ইহা স্থির করিয়াছি। সে সকল কথা এখনও প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। আপনি সকলই জানিতে পারিবেন। আমি এ কথা আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি, যে তাহার যত্নের কোন ক্রটি হয় নাই, আর সেই বুকের বেদনাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও আপনাকে নিশ্চয়রূপে জানাইতেছি যে, তাহার সৎকারাদি

কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকল বৃত্তান্তই আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন।"

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মরিয়া গিয়াছে!—সৎকার হইয়াছে! এই অল্প বয়সে, সে আর নাই। আর আমি তাই শুনিবার জন্য বসিয়া আছি! আমি তাহাকে খাওয়াইয়াছি, ধুয়াইয়াছি, মানুষ করিয়াছি। সে আমাকেই মা বলিয়া ডাকিত! সেই মুক্তকেশী আজি আর নাই! হা বিধাতঃ! কিন্তু বলুন মহাশয়, আপনি এত খবর কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি তাঁহাকে আবার বলিলাম,—"আপনি অপেক্ষা করুন, সকলই জানিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আবার আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে; আমি আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ২। ১ দিনের মধ্যেই আবার আসিব।"

তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়, যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা এখনই জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে ভাবিত করিয়া রাখিবেন না।"

"রামনগরে হরিমতির ঠিকানা কি, এই কথাটা কেবল আমার জানিতে ইচ্ছা আছে।"

আমার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং যেন মুক্ত-কেশীর মৃত্যুসংবাদও ক্ষণেক ভুলিয়া গেলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"হরিমতির ঠিকানা লইয়া আপনি কি করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"হরিমতির সহিত দেখা করিব।

রাজার সহিত তাহার গোপন সাক্ষাতের কারণ কি, আমি তাহা জানিতে চাহি। আপনি বা প্রতিবাসিগণ যাহা মনে করিয়াছেন, রাজা ও হরিমতির বিগত সাক্ষাতের রহস্য নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্রবিধ। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আমাদের অজ্ঞাত, অতি গুরুতর এক রহস্য আছে। আমি সেই রহস্য উদ্ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া হরিমতির নিকট যাইতেছি।

রোহিণী ঠাকুরাণী সকাতরে বলিলেন,—“এরূপ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। হরিমতি অতি ভয়ানক মেয়েমানুষ।”

“আপনি আমার ভালর জন্যই এ কথা বলিতেছেন তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি তাহার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিব।”

রোহিণী আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— “দেখিতেছি, আপনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তবে ঠিকানা লিখিয়া লউন।”

তিনি ঠিকানা বলিয়া দিলেন। আমি তাহা আমার পকেট বহিতে লিখিয়া লইলাম। তাহার পর বলিলাম,— “আমি আজি আসি, আপনার সহিত আবার দেখা হইবে। আপনাকে সকল কথাই পুনঃ সাক্ষাতে বলিব।”

তিনি বলিলেন,—“এস বাবা! বুড়া মানুষের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিও না। আবার বলিতেছি, হরিমতি বড় ভয়ানক মেয়ে মানুষ” আমি কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া লীলার বড়ই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত দুঃসহ দুঃখ ও দারিদ্র্য ভারে যে লীলা একদিনও অবসন্ন হন নাই, আজি তিনি সহসা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লীলা শয্যার উপর বসিয়া আছেন. মনোরমা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত ও বিনোদিত করিবার জন্য বহুবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। লীলা অবনত মস্তকে বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন। আমাকে দূর হইতে দর্শনমাত্র মনোরমা আমার নিকটস্থ হইয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন,—"দেখ, তুমি যদি উহাকে উত্তেজিত করিতে পার।" তিনি প্রস্থান করিলেন।

আমি লীলার নিকটস্থ হইয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম এবং জিজ্ঞাসিলাম,—"বল লীলা, বল কেন তুমি এমন করিয়া আছ? বল তুমি কি ভাবিতেছ?"

লীলা ছলছলিত নয়নে আমার নয়নের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমার মন ভাল নাই, আমি কত কি ভাবি—" এই বলিয়া সরলা একটু আনত হইয়া আমার স্কন্ধের উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। আমি বলিলাম,—"কেন তোমার মন ভাল থাকে না বল। আমি এখনই তাহার প্রতিবিধান করিব।"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—"আমি তোমাদের কোনই উপকারে লাগি না। আমি তোমাদের ঘাড়ের বোঝা মাত্র। দেবেন্! তুমি টাকা উপার্জ্জন কর, দিদিও তোমার

সাহায্য করেন। আমিই কেবল বসিয়া থাকি। তুমি হয়ত ক্রমে দিদিকেই আমার চেয়ে বেশী ভাল বাসিবে। দোহাই তোমাদের, তোমরা আমাকে এমন করিয়া পুতুলের মত তুলিয়া রাখিও না।"

আমি সস্নেহে লীলার মস্তকোত্তোলন করিয়া সাদরে তাঁহার কপোল-নিপতিত কেশ-সমূহ অপসারিত করিয়া দিলাম। তদনন্তর বলিলাম,—"এই কথা! ইহারই জন্য তোমার এত দুঃখ? তুমিও আমাদের কাজের সহায়তা করনা কেন? আজি হইতেই তুমি কাজ আরম্ভ কর।" এই বলিয়া আমি তাঁহার বিশৃঙ্খল কাগজ পত্র একত্রিত করিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া দিলেন এবং বলিলাম,—"জানতো তুমি, আমি কাগজের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করি। তুমিও বহুদিনের যত্নে বেশ রচনা করিতে শিখিয়াছ। আজি হইতে তুমিও প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করে, সেই ব্যক্তিই তোমার প্রবন্ধও গ্রহণ করিয়া অর্থ প্রদান করিবে। তোমার প্রবন্ধ একখানি স্ত্রীলোক প্রকাশিত কাগজে অতি সমাদরে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সুতরাং তোমারও যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতে থাকিবে। সেই অর্থ তুমি নিজের নিকটে রাখিয়া দিবে। মনোরমা যেমন আমার নিকটে আসিয়া সংসার খরচের জন্য টাকা চাহেন, অতঃপর সেইরূপ তোমার নিকটেও চাহিবেন। ভাবিয়া দেখ লীলা, তখন তোমার সাহায্য নহিলে আমাদের আর চলিবে না।"

তাঁহার বদনে আগ্রহপূর্ণ আনন্দ-জ্যোতিঃ দেখা দিল। তিনি বিগত কালের ন্যায় উৎসাহ ও সজীবতা সহকারে কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তাহার পর হইতে লীলা অবিরত যত্নে ও পরমোৎসাহে কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা-বোধ হেতু এই শুভ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মনোরমা ও আমি এই হিত পরিবর্ত্তনের অনুকূলতা করিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহা আমার হস্তে প্রদান করিতেন। আমি তাহা মনোরমাকে দিতাম এবং তিনি তাহা লুকাইয়া রাখিতেন। আমি আমার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু টাকা, লীলার রচিত প্রবন্ধের মূল্য আদায় হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিতাম। কখন কখন লীলা সগর্ব্বে তাঁহার মুদ্রাধার আমাদের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতেন যে, তিনি হয়ত সে সপ্তাহে আমার অপেক্ষাও অধিক উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এবম্বিধ গৌরবের প্রশ্রয় দিয়া এই নির্দ্দোষ প্রতারণা চালাইতাম। আহা! লীলার তৎকালরচিত সেই সমস্ত প্রবন্ধ এখনও আমার নিকট রহিয়াছে। তৎসমস্ত আমার নিকট অমূল্য সম্পত্তি—লীলার চিত্তবিকার বিদূরিত করার সাধনস্বরূপ সেই কাগজগুলি আমার চির সমাদৃত রক্ষণীয় ধন।

কিন্তু পরাগত সুখ স্মরণে জীবনের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবার প্রয়োজন নাই। বিষম সন্দেহ ও ভীতিপূর্ণ, এই কঠোর ক্লেশময় বর্ত্তমান ব্যাপারের আলোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

লীলার অজ্ঞাতসারে কথা কহিবার সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি মনোরমাকে রোহিণীর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত ও কথাবার্ত্তা সমস্তই জানাইলাম। হরিমতির সহিত সাক্ষাতের কথা উঠিলে, মনোরমাও রোহিণীর ন্যায় বলিলেন,—দেবেন্দ্র, এখনও তুমি এমন কিছুই জানিতে পার নাই যাহার জন্য হরিমতি তোমাকে ভয় করিবে। অন্যান্য সহজ উপায় চেষ্টা না করিয়া এখনই হরিমতির নিকট যাওয়া উচিত কি? যখন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, লীলার কৃষ্ণসরোবর হইতে কলিকাতায় আসার তারিখ রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ব্যতীত আর কেহই জানেন না, তখন তোমারও মনে পড়ে নাই, আমারও মনে পড়ে নাই যে, আর এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা জানে। সে ব্যক্তি রেবতী। রাজার নিকট হইতে সেই তারিখের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা রেবতীর নিকট চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত সহজ নহে কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"সহজ হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানিনা রেবতী এ চক্রান্তে কতদূর লিপ্ত। এ ব্যাপারে যদি তাহার কোন স্বার্থ না থাকে তাহা হইলে একথা মনে করিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। রাজা ও চৌধুরী স্বার্থের বশবর্ত্তী এই দুষ্কর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যাপার তাঁহাদের পদে পদে মনে আছে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে রেবতীর সন্ধানে সময় নষ্ট করা নিতান্তই অনাবশ্যক। তুমি কি মনে করিতেছ মনোরমা, যে, আমি রাজাকে আঁটিয়া

উঠিতে পারিব না? অথবা আমি রাজার নিকট হারিয়া যাইব?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"সে ভয় আমার নাই; কারণ এবার চৌধুরী রাজার সঙ্গে নাই। অতি ধূর্ত্ত চৌধুরীর সহায়তা না পাইলে, রাজা তোমার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি চৌধুরীকেই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ? কখনই না। তোমার মনে আছে, গিন্নি-ঝির লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে যে চৌধুরী মহাশয় রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত পত্র লেখালেখি চালাইয়াছিলেন। নিতান্ত গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তিনি কখনই সে অপ্রকৃতিস্থ ও তাঁহার চির-বিদ্বেষী ব্যক্তিকে পত্র লিখিতেন না ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। সেই পত্র ও সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই এমন কোন কথা জানা যাইবে, যাহাতে চৌধুরীকে আমাদের মুঠার মধ্যে আনিতে পারা যাইবে! আমিতো রাম-নগরে যাইতেছি। এই সময়ের মধ্যে তুমি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখ যে, জগদীশনাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব তিনি যেন তাহা অচিরে লিখিয়া পাঠান। যদি তিনি স্বেচ্ছায় লিখিয়া না দেন তাহা হইলে আইনের সাহায্যে তাঁহার নিকট হইতে সকল কথা বাহির করা যাইবে, ইহাও লিখিতে তুমি ভুলিও না।"

"তা আমি লিখিব; কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই রাম-নগর যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছ?

"তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। কালি না হয় পরশু আমি নিশ্চয়ই রামনগরে যাইব।"

তৃতীয় দিনে আমি রামনগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এ কার্য্যে আমার ২।১ দিন বিলম্ব হওয়া অসম্ভব নহে। এজন্য মনোরমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম যে, তিনিও প্রতিদিন আমাকে পত্র লিখিবেন, আমিও তাঁহাকে পত্র লিখিব। সাবধানতার অনুরোধে আমরা পরস্পরকে আরোপিত নামে পত্র লিখিব স্থির হইল। যত দিন আমি মনোরমার নিকট হইতে নিয়মিতরূপ পত্র পাইতে থাকিব, তত দিন আমি বুঝিব যে ভয়ের কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন পত্র না পাই তাহা হইলে আমি সেই দিনই চলিয়া আসিব। লীলার নিকট আমার অনুপস্থিতির নানারূপ কল্পিত কারণ উত্থাপন করিলাম এবং তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ চিত্ত ও সন্তুষ্ট দেখিয়া আমি যাত্রা করিলাম। মনোরমা দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আমরা কিরূপ চিন্তাকুল থাকিব তাহা মনে থাকে যেন। মনে থাকে যেন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে, আমাদের সকল শান্তি। যদিই এ যাত্রায় কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা ঘটে—মনে কর যদিই তোমার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয়—"

আমি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা তোমার মনে কেন উদিত হইতেছে?"

"বলিতে পারি না কেন, তথাপি মনে হইতেছে। আমার মনের এইরূপই প্রকৃতি। দেবেন্দ্র তুমি হাস, আর যাহাই কর, দোহাই তোমার যদি সেই ব্যক্তি তোমার, সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে তুমি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কোন কাজ করিও না।"

"কোন ভয় নাই, মনোরমা। আমি রাগের বশবর্ত্তী হইব না।"

আমি বিদায় হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার মনে উৎসাহ ও আশার সীমা নাই। কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, আমার এবারকার যাত্রা নিষ্ফল হইবে না। সময় অতি মনোহর। অতি নির্ম্মল বায়ু ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নবোদিত দিবাকরের হৈমময় কিরণ বিশ্ব বিভূষিত করিতেছে। সকলই প্রীতিপদ, সকলই সন্তোষময়। আমার হৃদয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সর্ব্বশরীর তদ্ধেতু আসুরিক বল-সম্পন্ন। যথাসময়ে রেল শকট বসুধা বিকম্পিত করিতে করিতে ধাবমান হইল। যথাকালে আমি নির্ব্বিঘ্নে রামনগর পৌঁছিলাম।

রামনগর অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। বড় জনহীন, বড় ফাকা ফাকা। তথাপি নিরন্তর কলিকাতা বাসের পর, হঠাৎ এরূপ স্থানে আসিলে চিত্ত বিনোদিত হয়। গ্রামে পৌঁছিয়া আমি সন্ধানে সন্ধানে ক্রমে হরিমতির বাটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নাই। কদাচিৎ একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করিয়া সরোবর হইতে জল আনিতে চলিতেছে; এক জন চাষা টোকা মাথায় দিয়া দিয়া গরু

তাড়াইতে তাড়াইতে মাঠ হইতে ফিরিতেছে। কোথায় বা গ্রাম্য পণ্য-বিক্রেতা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া নিদ্রা দিতেছে। এক স্থানে এক বৃদ্ধ ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাকু খাইতেছে।

আমি নির্দ্দিষ্ট বাটীর দ্বার সমীপস্থ হইয়া দেখিলাম তাহা অভ্যন্তর হইতে বন্ধ। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, আমি সেই দ্বারের শিকল নাড়িতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল পরে একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল, এবং আমি কাহার সন্ধান করিতেছি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে একটু বিশেষ দরকারের জন্য হরিমতি ঠাকুরাণীর সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি। সে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার দরকার কি জানিতে চাহিল। আমি তখন বলি কি? তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম,—"ঠাকুরাণীর কন্যার বিষয়ে বিশেষ কোন কথা আছে।" সে পুনরায় চলিয়া গেল এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। দেখিলাম ছোট একটি একতলা কুঠরী, সম্মুখে খুব চওড়া রক। অঙ্গনমধ্যে এক তুলসী মঞ্চ। তাহার চারিদিকে কয়েকটা ফুলের গাছ। সকলই বেশ পরিষ্কার; অতিশয় ঝরঝরে। আমি দাসীর সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যভাগও বেশ পরিষ্কার। ভিত্তিগাত্রে হিন্দুদেবদেবীর অনেক ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে কোষাকুষি প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম। আর

দেখিলাম, একটি জানালার নিকটে এক জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক, হরিনামের ঝোলা হস্তে, বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহের যথাযথ স্থানে তিলকাদি শোভা পাইতেছে। তিনি এক-খানি কুশাসনে উপবিষ্টা। তাঁহার পার্শ্বে একখানি কাশী-দাসী মহাভারত পড়িয়া আছে। তাঁহার মূর্ত্তি খুব বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ। মাথার চুল সব পাকে নাই, অনেক পাকিয়াছে। মুখ ও দৃষ্টির ভাব এতই সংযত যে তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ভাব অনুমান করিতে প্রয়াসী হওয়া নিতান্তই নিরর্থক। তাঁহার ওষ্ঠাধর স্থূল ও ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচায়ক। ইনিই হরিমতি।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি আমাকে বলি-লেন,—"আপনি আমাকে আমার কন্যার কথা বলিতে আসিয়াছেন। বলুন, কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরও এরূপ সমান যে তাহা শুনিয়াও তাঁহার মনের ভাব অনুমান করা সম্ভব নহে। তিনি আমাকে একখানি পিঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি যখন বসিতেছি, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমি মনে করি-লাম, এ বড় কঠোর ঠাঁই ; অতএব খুব সাবধান হইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতে হইবে। বলিলাম,—"আপনি জানেন আপনার কন্যা হারাইয়া গিয়াছে?"

"আমি তাহা বেশ জানি।"

"এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে, ইহাও আপনি আশঙ্কা করেন বোধ হয়।"

"হাঁ। আপনি কি আমাকে তাহার মৃত্যু সংবাদ দিতে আসিয়াছেন?"

"তাই বটে।"

সম্পূর্ণ উদাসীন ও অকাতর ভাবে, কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গীর কোনপ্রকার অন্যথা না করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?" রাস্তায় একটা কুকুর মরিয়া গিয়াছে শুনিলেও কেহ এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

আমি তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন? আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন আমি আপনার কন্যার মৃত্যু-সংবাদ দিতে আসিয়াছি?"

"হাঁ। সেই বা আপনার কে, আমিই বা আপনার কে? আপনি তাহার কথা জানিলেন কিরূপে?"

"যে রাত্রে সে পাগলাগারদ হইতে পলাইয়াছিল সেই রাত্রে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর সে যাহাতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারে, আমি সেজন্য তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম।"

"আপনি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন।"

"তার মার মুখে এ কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।"

"তা আপনি হউন, তথাপি আমি ঐ কথাই বলিতেছি। সে যে মরিয়াছে, তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে?"

"তাহা আমি এখন বলিতে অক্ষম। কিন্তু আমি জানি সে আর নাই।"

"কি উপায়ে আমার ঠিকানা পাইলেন, তাহাও আপনি বলিতে অক্ষম কি?"

"আমি রোহিণী ঠাকুরাণীর নিকট আপনার ঠিকানা জানিয়াছি।"

"রোহিণী অতি নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ। সে কি আপনাকে আমার নিকট আসিতে বলিয়া দিয়াছিল?"

"না, তা তিনি বলেন নাই।"

"তবে আপনি এখানে আসিলেন কেন?"

"মুক্তকেশীর মাতা, কন্যা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে জানিবার নিমিত্ত, স্বভাবতঃ অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন ভাবিয়া, আমি আসিয়াছি।"

হরিমতি আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"বেশ কথা। আপনার অন্য কোন মৎলব নাই?"

সহসা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"যদি আপনার আর কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আপনার কথা শেস হইয়াছে, আপনি এখন আসিতে পারেন। আপনি কি উপায়ে এ সংবাদ জ্ঞাত হইলেন, তাহা যদি বলিতেন তাহা হইলে আপনার সংবাদ আরও সন্তোষজনক হইত। যাহা হউক, তাহার জন্য কোন শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আপাততঃ স্নান করা দরকার হইবে বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে হরিনামের ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তদনন্তর আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আপনি এখন আসুন তবে।"

তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমার রাগ হইল এবং আমি,

তখন আমার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বলিতে সংকল্প করিয়া, কহিলাম,—"এখানে আসিবার আমার আরও কারণ আছে।"

হরিমতি বলিলেন,—"হাঁ, আমিও তা বুঝিয়াছি।"

"আপনার কন্যার মৃত্যু—"

"কি রোগে তাহার মৃত্যু হইল ?"

"হৃদ্রোগ।"

"হাঁ। তার পর ?"

"আপনার কন্যার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া দুইটী লোক আমার এক অতি প্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার এক জন রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়।"

"বটে ?"

আমি প্রণিধান করিয়া দেখিতে লাগিলাম, রাজার নাম শ্রবণে তাহার মুখের কোন ভাবান্তর হয় কি না, সে একটুও বিচলিত হয় কি না। দেখিলাম সে পাষাণ দ্রবীভূত হইবার নহে। তাহার একটি শিরাও বিকম্পিত হইল না।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনার কন্যার মৃত্যু অপরের অনিষ্টের কারণ হইতেছে শুনিয়া, আপনি হয়ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন।"

হরিমতি উত্তর দিলেন,—"না, আমি কিছুই আশ্চর্য্য জ্ঞান করি নাই। আপনি আমার বিষয়ে যেরূপ আগ্রহযুক্ত, আমি আপনার বিষয়ে সেরূপ আগ্রহযুক্ত নহি।"

আমি আবার বলিলাম,—"আপনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি এ সকল কথা আপনার নিকট বলিতে আসিয়াছি কেন ?"

"এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি বটে।"

"আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে এই দারুণ দুষ্ক্রিয়ার জন্য দায়গ্রস্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, আপনাকে এত কথা জানাইতে আসিয়াছি।"

"আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তা আমার কি?"

"শুনুন। রাজার অতীত জীবনে এরূপ অনেক ব্যাপাব আছে, যাহা জানিতে পারিলে আমার উদ্দেশ্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"কি ব্যাপার বলুন।"

"যখন আপনার স্বামী ঠাকুরবাড়ীর গোমস্তা ছিলেন, সেই সময়ে পুরাণ রামনগরে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল ও আপনার কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাহি।"

এতক্ষণে, এত সঙ্কোচ, এত গাম্ভীর্য্যের পর,—এতক্ষণে যেন হরিমতিকে আমি বিচলিত করিতে পারিয়াছি বোধ হইল। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে রাগের লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে; তাঁহার স্থির, নিশ্চল হস্তদ্বয় পরিধান বস্ত্রের এক প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি সে সকল ব্যাপারের কি জানেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—"রোহিণী যাহা যাহা জানিতেন, আমি সে সবই জানি।"

তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি যেন ক্রোধান্ধ হইয়া কি বলিবেন মনে হইল। কিন্তু না, তিনি তখনই সে ভাব সম্বরণ করিলেন ও দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ-

সূচক হাসির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—“এতক্ষণে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি। রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত আপনার বৈরিতা আছে, আপনি শত্রুতা সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমাকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে। রাজার সহিত আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে সে সব আপনাকে বলিতে হইবে। কেমন? তাহা নহিলে চলিবে কেন? আপনি মনে করিয়াছেন, আমি একটা পতিতা, দুঃখিনী মেয়ে মানুষ বই তো নই, দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করি, সহজেই ভয়প্রযুক্ত আপনার নিকট সকল কথা বলিয়া ফেলিব। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, আপনার অভিপ্রায় বেশ জানিতে পারিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ শব্দে ক্রোধ সহকৃত কর্কশ হাস্য করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমি এখানে কিরূপে থাকি তা আপনি জানেন না বুঝি। পাড়ার লোক ডাকিয়া আপনাকে তাড়াইয়া দিবার আগে, সে সকল কথা আপনাকে শুনাইয়া দিতেছি। অকারণে, অন্যায় রূপে আমার চরিত্রের কুৎসা চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কুৎসা দূর করিয়া পুনরায় সুনাম লাভ করিবার বাসনায় আমি এই স্থানে নিরন্তর পড়িয়া আছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আগে যাহারা আমাকে দেখিলে মুখ বেঁকাইত, এখন তাহারা আমার সহিত ফিরিয়া কথা কহে। যে সকল সতী লক্ষ্মীরা আগে আমাকে দেখিলে হাসিতেন, এখন তাঁহারাই, আমি কেমন আছি জানিবার জন্য ব্যাকুল। আগে কোন ক্রিয়া কর্ম্মে গ্রামের কেহই আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না এবং আমি

জোর করিয়া সেখানে গেলেও লোকে বিরক্ত হইত, এখন আমি সেই ক্রিয়া বাড়ীর রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এ সকল কথা বুঝি আপনি জানিতেন না? গ্রামের যেখানে যাইবেন, সেখানেই আমার সুযশ শুনিতে পাইবেন। বলরাম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে শয্যাগত। কে তাঁহাদের পথ্য রাঁধিয়া দেয়, সেবা শুশ্রূষা করে জানেন? আমি। ভজার মা ঘরে মরিয়া পড়িয়া ছিল, সংকার হয় না। কে উদ্যোগী হইয়া, খরচ পত্র করিয়া তাহার সংকার করাইল জানেন? আমি। গোয়ালাদের মেয়ে প্রসব হইল; কিন্তু এমন সাধ্য নাই যে একটি পয়সা খরচ করিয়া মেয়ের প্রাণ বাঁচায়। তখন ঘি, ঝাল, মসলা লইয়া কে উপস্থিত জানেন? আমি। কত আপনাকে বলিব? বলিয়াই বা ফল কি? ভয়ে আমি কদাপি অবসন্ন হইব না। গ্রামস্থ ভাবতেই আমার আত্মীয় এবং আমার সুনাম সর্ব্বত্র। আমি কেবল পরের উপকার, পূজা অর্চ্চনা রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও হরিনাম করিয়া কাটাই।” এমন সময়ে পথে কোন লোকের জুতার শব্দ শুনিয়া হরিমতি একটু জানালা খুলিল। একজন বৃদ্ধ, লম্বোদর, শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিরহিত, শিখাধারী ব্রাহ্মণ চটি জুতা ফটাস্ ফটাস করিতে করিতে চলিতেছেন। তিনি হরিমতিকে দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসিলেন,—“মা! ভাল আছ তো?” হরিমতি উত্তর দিল,—“হাঁ বাবা, ভাল আছি।” ব্রাহ্মণ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, “তোমার মত পুণ্যশীলা লোক ভাল থাকিলেই সকল মঙ্গল।” তখন হরিমতি সগর্ব্বে বলিল,—“দেখিলেন তো স্বচক্ষে? উনি

সিদ্ধান্ত মহাশয়! এখানকার টোলের অধ্যাপক এবং গ্রামের পুরোহিত। শুনিলেন তো উনি কি বলিলেন? আপনি মনে করিয়াছেন এইরূপ স্ত্রীলোক, নিন্দার ভয়ে অবসন্ন! এখন কি ভাবিতেছেন বলুন।"

আমি উত্তর দিলাম,—"যাহা ভাবিয়া আসিয়াছি, এখনও তাহাই ভাবিতেছি। গ্রাম মধ্যে আপনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সে সম্মান নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছাও নাই, সাধ্যও নাই। আমি জানি রাজা প্রমোদরঞ্জন আপনারও শত্রু, আমারও শত্রু। আমার তাঁহার উপর রাগের যেরূপ কারণ আছে, আপনারও সেইরূপ আছে। আপনি এ কথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন, করুন। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, আমার উপর রাগ করিতেও পারেন; কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বৃত্তের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ আমার সহায়তা করা আপনার নিতান্ত আবশ্যক ও উচিত।"

তিনি বলিলেন,—"আপনি উহার সর্ব্বনাশ করিয়া আমার নিকট আসিবেন; তখন দেখিবেন আমি কি বলি।"

এই কথা কয়টি তিনি দ্রুত, ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করিলেন। যে দারুণ ক্রোধ এত দিন তিনি পোষণ করিতেছেন, তাহা এতক্ষণে আমি জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ক্ষণেকের নিমিত্ত। দলিত ফণা সর্পের ন্যায় তাহা তখনই বিচলিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তখনই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি তবে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না?"

"না।"

"কেন? আপনি ভয় পাইতেছেন?"

আপনার কি তাই বোধ হইতেছে?"

"আমার বোধ হইতেছে, আপনি রাজা প্রমোদরঞ্জনের ভয়ে ভীত।"

"বটে!"

আমি দেখিলাম তাঁহার বদনে ও চক্ষুতে সবিশেষ ক্রোধের লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে। অতএব এই সুরে কথা চালাইলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আশা করিয়া, আমি বলিলাম,—"রাজা যেরূপ ধনবান ও পদ-প্রতিষ্ঠা-বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাতে তাঁহাকে ভয় করা আপনার পক্ষে কোনই বিচিত্র কথা নহে। প্রথমতঃ তাঁহার উপাধি রাজা, তিনি প্রভূত-জমিদারীর স্বামী, অতি সদ্বংশে তাঁহার জন্ম—"

এই সময়ে তিনি হঠাৎ অতিশয় হাসিয়া উঠিলেন এবং অতীব ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, রাজা জমিদারীর স্বামী, অতি সদ্বংশে জন্ম। ঠিক্ ঠিক্! অতি সদ্বংশে—বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে।"

এখন সময় নষ্ট করিয়া এ সকল কথার মর্ম্মালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এ স্থান হইতে প্রস্থান করার পর এ সব কথা ভাবিয়া দেখিব স্থির করিয়া, আমি বলিলাম,—"আমি বংশের বিচার করিতে আপনার নিকট আসি নাই। আমি রাজার মাতৃসম্বন্ধে কিছুই জানি না—"

তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন,—"তবে আপনি রাজার সম্বন্ধেও কিছু জানেন না।"

আমি বলিলাম,—"তা ভাবিবেন না। আমি রাজার সম্বন্ধে অনেক জানি এবং অনেক সন্দেহ করি।"

"কি কি আপনি সন্দেহ করেন?"

"আমি যাহা যাহা সন্দেহ করি না তাহাই আপনাকে আগে বলিতেছি। সন্দেহ করি না যে, তিনি মুক্তকেশীর পিতা।"

এই কথা যেই বলা সেই মাগী বাঘিনীর মত লাফাইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতিশয় ক্রোধবিকম্পিত স্বরে সে বলিতে লাগিল,—"কি স্পর্দ্ধা। কোন্ সাহসে তুমি এরূপ কথার উত্থাপন করিতেছ? কে মুক্তকেশীর পিতা, কে পিতা নহে ইহার বিচার তুমি কোন্ সাহসে করিতেছ?"

আমিও জোর করিয়া বলিলাম,—"আপনার ও রাজার জীবনে যে রহস্য আছে, তাহা এতৎসংক্রান্ত নহে। যে রহস্য রাজার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আপনার কন্যার জন্মের সহিত তাহার উদ্ভব হয় নাই এবং আপনার কন্যার মৃত্যুতে তাহার অবসান হয় নাই।"

তিনি সে স্থান হইতে একটু সরিয়া গেলেন এবং দ্বারের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"আপনি চলিয়া যাউন।"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম,—"আপনি ও রাজা যে সময়ে রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে গোপনে আলাপ করিতেন এবং যাহা আপনার স্বামী ধরিতে পারিয়াছিলেন, তখন আপনার অথবা তাঁহার অন্তঃকরণে কন্যার

জন্মসংক্রান্ত কোন ভাবনা ছিল না; আপনাদের মধ্যে কোন অবৈধ প্রণয়ও ছিল না।"

দেখিলাম তাঁহার ভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল, আমার উক্তির মধ্যে আমি দৈবাৎ ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বে, এই দুইটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। ইহাই কি এরূপ ভাবান্তরের কারণ? তাঁহার ক্রোধ অনেকটা কমিয়া গেল বোধ হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাকভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

"আপনি কি এখনও আমাকে চলিয়া যাইতে বলেন?"

"হাঁ। আর কখন এখানে আসিবেন না।"

আমি দ্বারের দিকে চলিয়া আসিলাম এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে বলিলাম,—"আশা করি রাজার সম্বন্ধে আমি আপনার আশাতীত কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইব। যদি তাহা পারি তবেই আবার আমি আপনার নিকট আসিব।"

"রাজার বিষয়ে এমন কোন সংবাদ নাই যাহা আমি আশা করি না। কেবল—" আর কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"কেবল তাঁহার মৃত্যু সংবাদের আশা নাই।"

দেখিলাম, তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য রেখা প্রকটিত হইয়াছে। আর দেখিলাম, তিনি অতি ধূর্ত্ততাসহ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি কিরূপ বলিষ্ঠ,

রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে ও মারামারি বাধিলে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে তাহাই কি তিনি আলোচনা করিতেছিলেন? যাহাই তিনি ভাবুন, আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম সেই সিদ্ধান্ত মহাশয় আবার ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি সেই জানালার নিকটস্থ হইলে হরিমতি জিজ্ঞাসিলেন,—"সুদোর ছেলে, ক'দিনের পর, আজি ভাত খাবে কথা ছিল; খেয়েছে কি?" সিদ্ধান্ত বলিলেন,—"খেয়েছে বোধ হয়। তোমার বাছা এতও মনে থাকে! আমাদের এই গ্রাম খানির তুমিই লক্ষ্মী।"

আর কি চাও? গ্রামের অধ্যাপক আমার সমক্ষে তাঁহাকে দুই দুইবার ডাকিয়া কথা কহিলেন; তাঁহাকে পুণ্যশীলা ও গ্রামের লক্ষ্মী বলিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা সম্মান আর কি হইতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

আমি হরিমতির আবাস ত্যাগ করিয়া কয়েক পদ মাত্র আসিতে না আসিতে, পার্শ্বে একটা দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ঠিক হরিমতির বাটীর পাশেই একটা বাটীর দরজায় একটা কালো মত লোক দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল এবং আমার

আগে আগে চলিতে লাগিল। আমি সহজেই চিনিতে পারিলাম, যে ছেঁড়া মোক্তার আর একবার আমার আগে আগে কৃষ্ণসরোবরের পথে চলিয়াছিল এবং যে আমার সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, এ সেই লোক। নিকটস্থ হইয়া আমার সহিত লোকটা এবার কথাবর্ত্তা কহিবে কি না, ভাবিতে ভাবিতে আমিও সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে একটি কথাও কহিল না, একবার ফিরিয়াও চাহিল না, এক মনে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। তাহার এতদ্রূপ ব্যবহারে আমার মনে বড়ই কৌতূহল ও সন্দেহ জন্মিল এবং আমি তাহাকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে আমরা রেল ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। লোকটা একবারও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিল না।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। যে ২।১ জন আরোহী দেরি করিয়া আসিয়াছে তাহারা তখনও টিকিট ঘরের গবাক্ষের নিকট গোল করিতেছে। শুনিতে পাইলাম ছেঁড়া মোক্তারও সেই সঙ্গে মিশিয়া, কৃষ্ণ সরোবরের টিকিট চাহিল। টিকিট লইয়া সে গাড়িতে উঠিল, তাহাও আমি দেখিলাম।

এখন এ ব্যাপারের অর্থ কি? আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, হরিমতির বাটীর ঠিক পার্শ্বস্থ বাটী হইতে সে বাহির হইয়াছে। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, আমি হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ করিব, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কা করিয়া রাজা এই লোককে হরিমতির ভবন-পার্শ্বে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে হরিমতির বাটীতে যাইতে ও তথা হইতে আসিতে দেখিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সরোবরে, রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্য, ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর স্বল্প কালের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ঘটনাচক্র যে স্থানে গিয়াই অবস্থিত হউক, আমি কোন দিকেই দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং রাজা প্রমোদরঞ্জন বা অন্য কাহারও জন্য কোন চিন্তা না করিয়া, অবলম্বিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কলিকাতায় বড় আশঙ্কিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে হইত, কারণ সেখানে আমাকে কেহ চিনিতে পারিলে, ক্রমে লীলার গুপ্ত নিবাসও জানিতে পারিত। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। এখানে আমি ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি। যদিই কেহ আমাকে চিনিতে পারে তাহাতে আমারই বিপদ্ ঘটিবে, অপর কেহই সে জন্য দায়গ্রস্ত হইবে না।

ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রায় সন্ধ্যা হইল। এরূপ অপরিচিত নূতন স্থানে রাত্রে আর কোন সন্ধানের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, আমি ষ্টেশন সন্নিহিত এক দোকান ঘরে আশ্রয় লইলাম এবং রাত্রে সেই স্থানেই জলযোগ করিয়া পড়িয়া থাকিলাম। আহারান্তে মনোরমাকে সমস্ত সংবাদ সহ এক পত্র লিখিলাম।

রাত্রে দোকানঘর নিতান্ত নির্জ্জন হইয়া গেল। আমি ছেঁড়া মাদুরে পড়িয়া অদ্যকার সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলাম। হরিমতির সমস্ত ব্যবহার ও সকল কথাবার্ত্তা

স্মরণ করিতে লাগিলাম। যখন রোহিণী আমার নিকট রাজা ও হরিমতির নৈশ মিলন-ক্ষেত্র স্বরূপে ঠাকুরবাড়ীর পার্শ্বের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখনই আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, এরূপ অবৈধ প্রণয়ের জন্য, তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীর সমীপদেশ ভিন্ন আর কোথায় কি স্থান পান নাই? এরূপ প্রকাশ্য স্থান কি এতাদৃশ কার্য্যের অনুকূল? যাহাই হউক, আমি দৈবাৎ ঠাকুরবাড়ীর নাম করিয়া ফেলার পর হইতে হরিমতির বিস্ময়জনক ভাবান্তর হয়। আমার অনেক দিন হইতে ধারণা হইয়াছে যে, কোন অতি গুরুতর দুষ্ক্রিয়া রাজা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের রহস্য। অধুনা ঠাকুরবাড়ীর নামে হরিমতির ভয় দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, এই স্ত্রীলোক সেই দুষ্ক্রিয়ার কেবল সাক্ষী নহে—এ তাহার সাহায্যকারী।

কিন্তু কি সে দুষ্ক্রিয়া? অনেক ভাবিয়াও তাহার কিছুই অনুমান করিতে সক্ষম হইলাম না। দেখিয়াছি হরিমতি রাজাকে যেমন ঘৃণা করে, রাজার মাকেও তেমনই ঘৃণা করে। রাজার বংশের কথা উত্থিত হইলে, সে নিতান্ত ঘৃণা ও বিদ্রূপ সহ বলিয়াছিল যে, অতি সদ্বংশেই তাঁহার জন্ম বটে, "বিশেষতঃ মাতৃপক্ষে।" এ কথার অর্থ কি? এ কথার তিন অর্থ সম্ভব। ১মতঃ, হয় ত রাজার জননী অতি নীচ-বংশোদ্ভবা। ২য়তঃ, হয় ত তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না এবং ৩য়তঃ, হয় ত তিনি রাজার পিতার বিবাহিতা বনিতা ছিলেন না। হরিমতির কথা সবিশেষ বিচার করিলে শেষ কথাটাই সঙ্গত মনে হয়। হরিমতি রাজার উপাধি, ঐশ্বর্য্য ও বংশ

সকলেরই উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিল। শেষ মীমাংসা ভিন্ন তাহার কথার কোনই অর্থ হয় না। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই রাজা কোন অত্যদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া নাম, সম্ভ্রম, বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। সে কৌশল, সে রহস্য, অবশ্যই তিনি বিহিত যত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টাশীল এবং তাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চিত। তাঁহার সমস্ত ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখিলে এরূপ কোন অতি ঘৃণিত রহস্য তাঁহার জীবনের সহিত নিশ্চয়ই সংলিপ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে রামনগরের ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? এই স্থানে এত সতর্কতার সহিত হরিমতিকে নিয়োজিত রাখার অভিপ্রায় কি? এই দুর্জ্ঞেয় কাণ্ডের কোনই মীমাংসা সম্ভব নহে। ফলতঃ যাহাই হউক, প্রত্যুষে উঠিয়া, ঠাকুরবাড়ীর বর্ত্তমান গোমস্তার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ এ চিন্তা পরিত্যাগ করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর শুভাগমন প্রার্থনায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত রহিলাম। যদি বা নিদ্রা একবার দেখা দিতেন তাহাও হইল না। দোকানদার ভজহরি দে বিলক্ষণ রূপ অহিফেন সেবা করিয়া থাকেন। শেষ রাত্রি না হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় না। তিনি এ দিকের সমস্ত রাত্রি টুকু নিরন্তর তামাক খাইতে খাইতে ও কাশিতে কাশিতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এখন তিনি একবার তাম্রকূট সেবনার্থ উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও টীকা ধরাইলেন এবং বিহিত বিধানে তামাক সাজিয়া ভড়র ভড়র

শব্দে হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে কাশি—ওঃ দম আটকাইয়া মারা যায় আর কি! তবু কি হুঁকা ছাড়ে। এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া আমি হাঁই ছাড়িয়া ও গা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলাম। আর একটা দোহার পাইলাম ভাবিয়া, ভজহরি বড় খুসি হইল এবং সাদরে বলিল,—"বাবু কি তামাক খাইবেন না কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"না, আমি তামাক খাই না।"

ভজহরি হয় ত দুঃখিত হইল এবং আমাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই মনে করিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুর কি করা হয়?"

আমি তাহাকে যাহা হয় একটা বুঝাইয়া দিলাম। সে তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ দেশে মহাশয়ের কি মনে করে আসা?"

আমি বলিলাম,—"মনে বিশেষ কিছুই নাই। কেবল এ দেশটা দেখা শুনাই প্রধান ইচ্ছা।"

সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আর মহাশয়, এ দেশে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের ঠাকুরবাড়ী দেখিবার জন্য অনেক লোক সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিত। তখন সে এক দিন ছিল। এখন সবই গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আগে অনেক লোক আসিত, এখন আর আসে না কেন?"

"কি আর বলিব মহাশয়, কালে কালে সবই লোপ হইতেছে। এখন কি আর লোক ঠাকুর দেবতা মানে?

আমাদের এই ঠাকুরের ভারী মাহাত্ম্য। দেশ বিদেশ হইতে লোক ঠাকুরের পূজা দিতে, দর্শন করিতে, ও ধন্না দিতে আসিত। ওঃ তখন ঠাকুরবাড়ীর কাছেই আমার দোকান ছিল। প্রতি দিন আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেচা কেনা করিতাম। শেষে আর কিছুই হয় না, পেট চলে না দেখিয়া, রেলের ধারে দোকান উঠাইয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"ঠাকুরের মাহাত্ম্য কি রকম?"

"ওঃ ঠাকুর বড় জাগ্রত। যে যা কামনা করে তা কখন নিষ্ফল হয় না।"

"বটে! ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা কিরূপ?"

"ঠাকুরের যা আয় আছে, তা সব সেবার খরচ হয়। সে আয় বড় কম নয়—বৎসরে ২॥০ হাজার টাকা। তা ছাড়া ঠাকুরের আরও এক আয় আছে; তাতেও বড় কম জমে না।"

"আর কি আয়?"

"এ অঞ্চলে চারিদিকে ১৫ ক্রোশের মধ্যে যেখানে যে বিবাহ হবে, সেই তারিখ ধরিয়া, ঠাকুরবাড়ীর খাতায় সে জন্য কিছু না কিছু প্রণামী জমা দিতে হইবেই হইবে। তা দু পয়সাই হউক, আর দু হাজার টাকাই হউক। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় এ প্রদেশের যে বিবাহের উল্লেখ নাই, সে বিবাহ অসিদ্ধ। বিবাহ বিষয়ে কত আইন আদালত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাড়ীর খাতায় যে বিবাহের প্রণামী জমা নাই, সে বিবাহ মিথ্যা ও জুয়াচুরী বলিয়া আদালত নামঞ্জুর করিয়াছে। এমন ব্যাপার কতই হইয়াছে। কেন আপনি কি শুনেন নাই,

চলিত কথাই আছে, 'রামনগরের ঠাকুরবাড়ী, বিয়ের বাব সরকারী।' এমন চলিত কথা কতই আছে। ইহাতেও ঠাকুরের মন্দ আয়——"

আমি তাহার কথার শেষাংশ আর শুনিলাম না। যাহা শুনিলাম তাহাতেই আমার হৃদয়-শোণিত সবেগে বহিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিচার করিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, এই ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার জীবনের সমস্ত রহস্য নিহিত আছে। হরিমতির কথাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া, এবং রাজার সমস্ত ব্যবহার আলোচনা করিয়া আমার মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল, নিশ্চয়ই রাজা তাঁহার পিতার বিবাহিতা বনিতার পুত্র নহেন এবং নিশ্চয়ই রাজার পিতার বিবাহের প্রণামী ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জমা নাই। এই স্থানেই যাহা হউক একটা কাণ্ড আছে। কতক্ষণে স্বয়ং ঠাকুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে খাতা দেখিব ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম। কতক্ষণে রাত্রির অবসান হইবে ভাবিয়া আমি অধীর হইলাম। ভজহরি ঠাকুরের মাহাত্ম্য বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করিল। কিন্তু আমি তাহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলাম না, কোন উত্তর প্রত্যুত্তরও করিলাম না। সে আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া অগত্যা নিরস্ত হইল।

ক্রমে সুদীর্ঘ নিশার অবসান হইলে, আমি দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে ঠাকুরবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অদ্যকার কার্য্যের, ফলাফলের উপর আমার উদ্দেশ্যের সফলতা ও বিফলতা সবিশেষ নির্ভর

করিতেছে। সুতরাং যত্ন-সহকারে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিতে করিতে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমে শুভ্রবর্ণ, সমুন্নত ও সুবিস্তৃত ঠাকুরবাড়ী আমার নেত্র-পথবর্ত্তী হইল। গ্রামের সমস্ত লোক ঘরবাড়ী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভবনের ভগ্নাবশেষ সকল চারিদিকে ঢিবি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি সেই সকল ভগ্নাবশেষের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছি, এমন সময় একটা ভগ্ন-প্রাচীরের পার্শ্বদেশ হইতে দুইটি লোক দেখা দিল। তাহাদের একজন আমার পরিচিত। আমি যে দিন উকীল করালী বাবুর আফিস হইতে ফিরিতেছিলাম, তখন যে দুই ব্যক্তি আমার সঙ্গ লইয়াছিল এ ব্যক্তি তাহারই একজন। তাহার সঙ্গীটাকে আমি কখন দেখি নাই। তাহারা আমার সহিত কোনই কথা কহিল না এবং আমার নিকটস্থ হইতেও চেষ্টা করিল না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমি যে হরিমতির সহিত দেখা করিয়াছি, রাজা সে সংবাদ পাইয়াছেন এবং তদনন্তর আমি যে নিশ্চয়ই ঠাকুরবাড়ী যাইব, তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন। সেই সংবাদপ্রাপ্তির জন্যই, তিনি এই দুই লোককে এই স্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার অনুসন্ধান এবার যে ঠিক পথে চলিতেছে বর্ত্তমান ব্যাপার তাহার অবিসম্বাদিত প্রমাণ। আমি ঠাকুরবাড়ীর দ্বার ছাড়াইলাম। বর্ত্তমান গোমস্তার বাসা দেবালয়ের খুবই নিকট। আমি সেই দিকেই চলিলাম।

গোমস্তা মহাশয়ের বেশ বাড়ীটুকু। চারিদিকে নানাবিধ

ফলফুলের গাছ, মধ্যে বেশ পরিষ্কার একটি একতলা ঘর, সম্মুখে রংকরা ঝিলিমিলি ও রেল-লাগান একটি বারান্দা। তিনি স্ত্রী-পুত্র-বিহীন লোক। একাকী সেই বাড়ীতে বাস করেন। আমি যখন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি বারান্দায় একখানি জলচৌকির উপর বসিয়া, প্রকাণ্ড এক গাড়ু লইয়া, মুখ ধুইতেছেন। লোকটি প্রাচীন। বেশ সভ্যভব্য; বড় সুমূর্ত্তি—কিন্তু একটু বেশী গল্পে। তাঁহার একটু সংস্কৃত বোধ আছে। গোমস্তাগিরির চেয়ে একটু বেশী লেখা পড়া জানা আছে। মনে মনে এ সকল কারণে একটু অহঙ্কারও আছে এবং সে অহঙ্কারটুকু চাপিয়া রাখার ক্ষমতাও নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহারই নিকটে আমার প্রয়োজন শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। ক্রমে ঠাকুরবাড়ীর কথা উঠিল এবং বিবাহের প্রণামী বিষয়ক কথাও উঠিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"এই বিবাহের প্রণামী বাবদে আপনাদের সালিয়ানা কি পরিমাণ আয় হয় ?"

তিনি বলিলেন,—"আয় সকল বৎসর সমান হয় না; কারণ বিবাহ সকল বৎসর সমান হয় না। তবে এ কথা বলিতে পারি, এ অঞ্চলে এমন বিবাহই হয় না, যাহার জন্য কিছু না কিছু প্রণামী এ ঠাকুরবাড়ীতে না আইসে। কেহ ইচ্ছা করিয়া দিল, কেহ যে দিল না, তা আর হইবার যো নাই। কারণ এখন সর্ব্বসাধারণের সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, এখানকার খাতায় তারিখ ধরিয়া অল্পই হউক, অধিকই

হউক, কিছু জমা না দিলে, সে বিবাহই অসিদ্ধ। কাজেই লোকে প্রণামী জমা না দিয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। সুতরাং আয়ের কোন ব্যাঘাত হয় না।"

আমি বলিলাম,—"যখন আপনাদের খাতায় প্রণামী জমা হওয়া এত গুরুতর ব্যাপার এবং তাহা না হইলে যখন এত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তখন সে সম্বন্ধে আপনাদের বড়ই সাবধান থাকিতে হয় তো।"

তিনি বলিলেন,—"ওঃ সে বিষয়ে সাবধানতার কোন ত্রুটি নাই। নিয়ম এই, যিনি যখন গোমস্তা থাকিবেন তাঁহাকে স্বহস্তে বিবাহের প্রণামী জমা করিতে হইবে এবং যেটি যে তারিখে আসিবে সেটি সেই তারিখেই জমা করিতে হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলেও ছাড়াছাড়ি নাই। তার পর এখান হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে, রূপনগর গ্রামে রাজসরকারের সদর কাছারি আছে। সেই কাছারিতে একজন নায়েব ও অন্যান্য আমলা থাকেন। এ প্রদেশে রাজসরকারের যত বিষয় সম্পত্তি আছে, সেইটাই তাহার কাছারিবাড়ী। ঠাকুরবাড়ীর কাগজপত্রও আমাদের সেখানে দাখিল করিতে হয়। অন্যান্য কাগজপত্র নিয়মমত সময়ে সময়ে পাঠাইতে হয়, কিন্তু বিবাহের প্রণামী যেদিনকার যেটি সেই দিনই সেটি চালান সহ লিখিয়া পাঠাইতে হয়। সেখানে চালানখানি সেরেস্তায় থাকে, আর পাকা খাতায় সেটী জমা হয়, এবং সে পাকা খাতা অতি সাবধানে রাখা হয়।"

আমি বলিলাম,—"এ সকল অতি সুব্যবস্থা সন্দেহ নাই। আমি একবার আপনাদের এই বিবাহের খাতা

দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি মহাশয় কৃপা করিয়া একবার দেখান।"

তিনি বলিলেন,—"তার আর বিচিত্র কি? এখনই আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি। এ বিষয়ে আপনার কোন গোল উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? তা সেজন্য কোন চিন্তা নাই। এ প্রদেশের যদি কোন বিবাহের কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের খাতায় তার নিদর্শন নিশ্চয়ই পাইবেন। কোন্ কুলীন কোথায় ভাঙ্গিয়াছে, কে কোথায় বিবাহ দিয়া জাতি নষ্ট করিয়াছে, কোন শ্রোত্রীয় ফাকি দিয়া কুলীনের ঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে ইত্যাদিরূপ সমস্ত পরিচয় আমাদের খাতা হইতে প্রকারান্তরে পাওয়া যায়। আর যদি এ অঞ্চলে কোন বেশ্যার ছেলে কলেকৌশলে সমাজে চলিবার জোগাড় করে, আমাদের প্রণামীর খাতা তাহার প্রবল শত্রু। এরূপ কোন সংবাদ যদি আপনার দরকার হয়, আপনি আমাদের খাতা হইতে নাম আর তারিখ টুকিয়া লইয়া, যে কোন ভাল ঘটককে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে তখনই আপনাকে সকল সংবাদ বলিয়া দিবে। তবে চলুন, এখনই যদি মহাশয় তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে চলুন। আমি এইরূপ সময়েই প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ী গিয়া থাকি।"

আমি বলিলাম,—"চলুন তবে। আমার এখনই তাহা দেখিবার দরকার।"

গোমস্তা মহাশয়ের বাক্য-স্রোত থামিল না। কথা কহিতে কহিতে আমরা ঠাকুরবাড়ী আসিলাম। ঠাকুরবাড়ী বৃহৎ ব্যাপার। একদিকে ভোগের মহল, একদিকে লোকজন

থাকিবার মহল, একদিকে গোমস্তার মহল, একদিকে অতিথিশালা। এক প্রকাণ্ড পাঁচ কুকুরি দালানে পাষাণময় হরিহরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ সংস্থাপিত। প্রকাণ্ড উঠান— পাথর ছাওয়া। সম্মুখে নহবৎখানা। আমি গোমস্তা মহাশয়ের সহিত চারিদিক ঘুরিয়া, শেষে তাঁহার মহলে প্রবেশ করিলাম এবং তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন,—"বকেয়া খাতাপত্র সমস্ত পাশের এই ঘরে থাকে। বলিতে গেলে সে ঘর কাগজেই বোঝাই। কিন্তু সকলই বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে—দেখিতে কোন কষ্ট নাই। আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে ঐ ঘরে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। দেখিলাম বস্তুতই সে ঘর কাগজ বোঝাই বটে। তিনি বলিলেন,—"দেখিতেছেন, এ ঘরটি একটি সিন্দুক বলিলেই হয়। এইরূপ হওয়াই উচিত। ঘরের একটি দ্বার। তাহা আবার কেমন মজবুত দেখুন। বাহিরে এই দ্বারের তিন স্থানে তিনটি তালা। ভিতরে এ দ্বার বন্ধ করিবার কোনই উপায় নাই; কারণ ভিতর হইতে বন্ধ করিবার কোন দরকার নাই। ভিতরে কেবল দুইটি কড়া লাগান আছে মাত্র—সেও কেবল ধরিবার ও খুলিবার সুবিধার জন্য।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দোবস্ত ভাল। কাগজপত্র গুলি বৃহৎ বৃহৎ খড়িকায় রক্ষিত এবং বর্ষে বর্ষে ভাগ করিয়া টিকিট মারা। আমাকে গোমস্তা মহাশয়

জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কোন বর্ষের কাগজ দেখিতে চাহেন ?"

আমি বলিলাম,—"১২১১ সালের আগে।"

তিনি আমাকে ১২১১ সালের ঘড়িঞ্চা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহার বামদিকে উত্তরোত্তর আরও আগেকার কাগজ দেখিতে পাইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে ইচ্ছামত ও আবশ্যকমত কাগজ পত্র দেখুন। আপাততঃ কৃপা করিয়া আমাকে একটু ছুটী দিউন; আমি সরকারী কাজ দেখিতে যাই।"

আমি বলিলাম,—"আপনি যাইবেন বই কি? আপনি যতটুকু অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহা আশাতীত। আমি আপনার শিষ্টাচারে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি।"

গোমস্তা মহাশয় চলিয়া গেলেন; আমি ১২০৯ সালের ১নং জমা খরচ বহি বাহির করিলাম। আমি জানিতাম, ১২১১ সালে রাজা প্রমোদরঞ্জনের জন্ম হয়। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে, তাহার দুই বৎসর আগে, তাঁহার পিতা মাতার বিবাহ হইয়াছিল ধরিতে হয়; কিন্তু যে কয়টা মাসে বিবাহ হয়, সে সব কয়টাই দেখিলাম। কত বিবাহের বাবদে কত টাকাই প্রণামী জমা দেখিলাম, কিন্তু এ সংক্রান্ত তো কিছুই দেখিলাম না। তাহার পর ১১০৮ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ—কিছু নাই। শ্রাবণ—কিছু নাই। অগ্রহায়ণ—কিছু নাই। মাঘ—আছে আছে! দেখিলাম পত্রের শেষভাগে, স্থানের অল্পতা হেতু একটু ঠেসাঠেসি করিয়া এই বিবাহের প্রণামী জমা করা আছে। লিখিত রহিয়াছে, রাজা বসন্তরঞ্জন

রায়ের সহিত কুসুমকামিনী দেবীর বিবাহ বাবদ প্রণামী জমা ১০০৲। ইহার অব্যবহিত পর পৃষ্ঠার উপরে, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বিবাহের উল্লেখ আছে। আমার সহিত নামের সমতা হেতু আমি তাহা মনে করিয়া রাখিলাম। রাজার বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে তাহাও আমি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম এবং পাছে ভুলিয়া যাই ভাবিয়া, পকেট বহিতে এ সকল সংবাদ লিখিয়া লইলাম। কেবল স্থানের অত্যল্পতা হেতু অতিশয় ঘেঁসাঘেসি ভিন্ন রাজার বিবাহ বিষয়ে আর কোন সন্দেহজনক ভাব পরিদৃষ্ট হইল না। যে রহস্য এখনই উদ্ভেদ করিতে সক্ষম হইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে হতাশ হইলাম। ঠাকুরবাড়ীর খাতায় যাহা দেখিলাম তাহাতে রাজা প্রমোদরঞ্জনের জননী সংক্রান্ত কোনই বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখিলাম না। বরং তাঁহার সততা সম্বন্ধেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর কি কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে, খাতা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গোমস্তা মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের কাজ শেষ হইয়াছে?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সন্তোষজনক হইল না।"

তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, খাতায় কি তাহার বিরোধী প্রমাণ দেখিতে পাইলেন?"

আমি বলিলাম,—"তাই বটে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, যদিই মনে বিশেষ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আপনি রাজপুরের সদর কাছারীর খাতা ও চালান মিলাইতে পারেন। যদিও এখানকার খাতার সহিত সেখানকার কাগজ পত্রের কোনরূপ অনৈক্যের সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনের ধুকফুকানি মিটাইয়া ফেলাই ভাল।"

আমারও মনে হইল, অধুনা তাহাই সৎপরামর্শ, একবার রাজপুরের খাতা সন্ধান করা নিতান্তই কর্ত্তব্য; যদিও তাহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সেটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাইলে, কার্য্য অসমাপিত থাকিবে। অতএব অদ্য এখনই এই দুই তিন ক্রোশ পথ আমি পদব্রজে গমন করিতে সংকল্প করিলাম। তদনন্তর বিহিত বিধানে গোমস্তা মহাশয়ের সহিত শিষ্টাচার সমাপ্ত করিয়া আমি রাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাজপুর একটা মহকুমা এবং রামনগরের ন্যায় নিতান্ত পল্লিগ্রাম নহে। ডাক্তার বিনোদ বাবুর বাটী রাজপুরের নিকটেই এবং কৃষ্ণ সরোবর রাজপুর হইতে বেশী দূর নহে। আমি পূর্ব্বে একবার রাজপুরের, নিকটে বিনোদ বাবুর বাটীতে এবং কৃষ্ণ সরোবরের রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলাম।

ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর আসার পর, আমি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিদ্বয় এবং তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কিয়ৎকাল পরে তন্মধ্যস্থ এক জন

রামনগরের দিকে চলিয়া গেল এবং অপর দুইজন আমার অবলম্বিত পথেই চলিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আমারই অনুসরণ করিতেছে বুঝিয়া আমার মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। কারণ ঠাকুরবাড়ীর অনুসন্ধান শেষ হইলে আমি নিশ্চয়ই রাজপুরে যাইব একথা অবশ্য রাজা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই অনুসরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং রাজপুরে কোন না কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা কখন অসঙ্গত নহে। আবার আশার সঞ্চারে আমার হৃদয় বলীয়ান হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম; লোক দুইটাও কিছু দূরে দূরে সমানভাবে আমার সঙ্গে আসিতে লাগিল। দুই একবার তাহারা একটু অধিকতর বেগে চলিয়া আমার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আবার তখনই দাঁড়াইয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ দূরে দূরে আসিতে লাগিল। তাহাদের মনে যে কোন দুরভিসন্ধি আছে তাহার সন্দেহ নাই। সেই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সদুপায়ের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছে, ইহা আমার বেশ বোধ হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি, তাহা যদিও আমি স্থির করিতে পারিলাম না, তথাপি নির্ব্বিঘ্নে রাজপুর গমন করার পক্ষে আমার ব্যাঘাত

ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। শীঘ্রই এ আশঙ্কা সফলিত হইল।

রাস্তা নিতান্ত জনহীন। একস্থানে উহা অতিশয় বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই বাঁকের নিকটস্থ হইবামাত্র, পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, লোক দুইটা আমার খুব নিকটে আসিয়াছে। যেই আমি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম, সেই যে লোকটা কলিকাতায় আমার সঙ্গ লইয়াছিল, সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আমার বাম দিকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা এইরূপে আমার সঙ্গ লওয়ায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, তাহার পর এই ব্যবহারে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলাম, এবং হস্ত দ্বারা লোকটাকে ঠেলিয়া দিলাম। সে তখনই 'বাবা গো, মেরে ফেলিল গো, দোহাই কোম্পানি, কে আছ, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল, পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি আমার বাম হস্ত ধারণ করিল। এইরূপে তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। তাহারা উভয়েই আমার অপেক্ষা বলশালী; সুতরাং তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি অগত্যা নিরস্ত হইয়া থাকিলাম এবং সন্নিকটে যদি অপর কোন লোক দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার নিকট সাহায্য পাইব আশা করিয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, অদূরে মাঠে, একজন কৃষক কর্ম্ম করিতেছে। সে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে বিবেচনায়, আমি তাহাকে আমাদের সহিত আস

পুর পর্য্যন্ত আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি নিতান্ত অসভ্যভাবে ঘাড় নাড়িয়া, অপর দিকে চলিয়া গেল। আমার শত্রুদ্বয় এই সময়ে ব্যক্ত করিল যে, তাহারা নগরে উপস্থিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে মারপিটের নালিশ করিবে। আমি তাহাদের বলিলাম,—"তোমরা আমার হাত ছাড়িয়া দেও। আমি তোমাদের সঙ্গে রাজপুর যাই-তেছি, চল।" আমার অপরিচিত ব্যক্তি নিতান্ত কর্কশ-ভাবে, হাত ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু অপর ব্যক্তি, এ ব্যবহার অসঙ্গত ও বিগর্হিত বোধে, হাত ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল এবং তাহার সঙ্গীকেও সেইরূপ করিতে বলিল। তাহারা উভয়ে আমার হাত ছাড়িয়া দিলে. আমি স্বাধীনভাবে তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিলাম।

বাঁক ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর মাত্র যাইয়া আমরা রাজপুর গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের প্রবেশমুখেই থানা। ব্যক্তিদ্বয় আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেল এবং আমার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ উপস্থিত করিল। দারোগা মহাশয়, উভয় পক্ষের বক্তব্য লিখিয়া লইয়া, আমাদের সকলকে তখনই চালান দিলেন। ডিপুটী বাবুর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম। লোকটি বড় রুক্ষস্বভাব এবং আপনার ক্ষমতাগৌরবে বড়ই অহঙ্কৃত। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, স্বাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসিলে, অভিযোগ-কারীদ্বয় সেই চাষার নামোল্লেখ করিল দেখিয়া, আমি অতি-শয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি অভিযোগকারীদিগকে সেই স্বাক্ষী আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া আমাকে আপাততঃ

জামিনে খালাস দিতে চাহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আমি বিদেশী লোক না হইলে, তিনি আমার জামিন চাহিতেন না। আবার তিন দিন পরে মোকদ্দমা হইবে।

আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার সময় নষ্ট করিয়া, কোনরূপে আমার উদ্দেশ্যসাধনে বিলম্ব ঘটানই এই দুই ব্যক্তির অভিপ্রায়। যেরূপে হউক, কিছু সময় অতীত করাই তাহাদের অভিসন্ধি। বর্ত্তমান মোকদ্দমা তাহারই একটা উপায় মাত্র। সম্ভবতঃ, এইরূপে কিছু সময় কাটাইতে পারিলে, তাহারা মামলা চালাইবে না। আমার মন এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এতই চঞ্চল হইল যে, আমি ডিপুটিবাবুকে, গোপনে পত্র লিখিয়া, সমস্ত ব্যাপার জানাইতে ইচ্ছা করিলাম। তদর্থে কালী, কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পর, এ কার্য্যের একান্ত অবৈধতা আমার হৃদ্গত হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় আমাকে এরূপে বিচলিত করিয়াছে স্মরণ করিয়া, আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল যে এ প্রদেশে আমার একজন পরিচিত লোক আছেন—তিনি ডাক্তার বিনোদ বাবু। মনোরমা দেবীর পত্র লইয়া আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলাম। সে পত্রে মনোরমা আমাকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এই পূর্ব্ব পরিচয়-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলাম এবং অধুনা যে বিপদে পতিত হইয়াছি তাহাও উল্লেখ করিলাম। এরূপ

বন্ধুবিহীন অপরিচিত স্থানে তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই, তাহাও লিখিলাম। আদালত হইতে হুকুম লইয়া একটা ঠিকা লোক নিযুক্ত করিলাম এবং যাতায়াতের গাড়িভাড়া করিয়া ডাক্তার বাবুকে আনিবার নিমিত্ত, পত্রসহ লোক পাঠাইয়া দিলাম। পথ অতি সামান্য; সুতরাং শীঘ্রই আমার নিষ্কৃতির উপায় হইবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

যখন পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল, তখন বেলা আন্দাজ ১৷৷ টা। বেলা প্রায় ৩৷৷ টার সময় আমার প্রেরিত লোক সঙ্গে ডাক্তার বিনোদ বাবু আসিয়া আদালতগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ বাবুর এই অত্যদ্ভুত সৌজন্যে ও অনুগ্রহে আমি বিমোহিত হইলাম। তখনই জামিন মঞ্জুর হইয়া গেল। বেলা ৪ টার পূর্ব্বে আমি রাজপুরের পথে ডাক্তার বিনোদ বাবুর সদভিব্যাহারে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম। বিনোদ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে আহার করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য, সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি সবিনয়ে এ যাত্রা তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষায় আমার অক্ষমতা জানাইয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। সময়ান্তরে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং সদর কাছারির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমি যে জামিনে খালাস হইয়াছি, এ কথা নিশ্চয়ই অবিলম্বে রাজা প্রমোদরঞ্জন জ্ঞাত হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ

অভিনব কৌশলের উদ্ভাবনা করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি যে রকম লোক, সন্নিহিত প্রদেশে তাঁহার যেরূপ সম্ভ্রম ও আধিপত্য, তাহাতে তিনি মনে করিলে অনেক অনর্থই ঘটাইতে পারেন। যতক্ষণ তাঁহার সর্ব্বনাশের অবিসম্বাদিত প্রমাণ হস্তগত করিয়া, তাঁহাকে আয়ত্তগত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বিচার করিয়া আমি স্বত্বর জমিদারী কাছারিতে উপস্থিত হই-লাম।

সৌভাগ্যক্রমে তখন কাছারিতে নায়েব মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্য জানাইলে, তিনি তৎ-ক্ষণাৎ একজন আমলাকে খাতা দেখাইতে আদেশ করি-লেন। আমি খাতা অন্বেষণ করিয়া ১২০৮ সালের মাঘ মাস বাহির করিলাম এবং ঠাকুরবাড়ীর খাতায় রাজার বিবাহের পূর্ব্বে যে বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলাম। পরে আমার নামধারী যে এক বিবাহ লিখিত আছে তাহাও দেখিলাম। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে——? কিছু নাই! রাজা বসন্ত-রঞ্জন রায়ের বিবাহবিষয়ক বিন্দুবিসর্গেরও উল্লেখ নাই! সর্ব্বনাশ!

তখন আমার মনের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। আমার শিরায় বিদ্যুদ্বেগে শোণিত ধাবিত হইতে লাগিল! এত পরিশ্রম—এত যত্নের পর আমার আশার সফলতা হইল! বস্তুতই এ বিবাহ খাতায় উঠে নাই তো! আমার চক্ষুর ভুল হয় নাই! আবার দেখি—ভাল করিয়া দেখি। না—

নিঃসন্দেহ রাজা বসন্তরঞ্জনের বিবাহের প্রণামী সদর কাছা-রির খাতায় জমা নাই। এত কষ্টের পর আমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল; রাজা প্রমোদরঞ্জনের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইল; আমি তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হইলাম। ওহো, এই রহস্য না বুঝিতে পারিয়া কত সম-য়েই কত সন্দেহ করিয়াছি, কত রকম ভাবনাই ভাবি-য়াছি। কখন মনে করিয়াছি, রাজা হয়ত মুক্তকেশীর পিতা, আবার কখন মনে করিয়াছি, তিনি হয়ত মুক্তকেশীর স্বামী। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে সন্দেহ কদাপি আমার মনে হয় নাই।

এখন কি বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে রাজা প্রমোদ-রঞ্জন বেশ্যাপুত্র। তাঁহার জননীর সহিত তাঁহার পিতার কোন কালে শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ হয় নাই। সুতরাং রাজা যে উপাধি ও পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই অধিকার নাই। তাঁহার পিতামাতা স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কদাপি বিবাহ হয় নাই। রাজা প্রতারণা করিয়া, ধূর্ত্ততা সহকারে, ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই প্রতারণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য, কৌশলে, হরিমতির সাহায্যে, ঠাকুরবাড়ীর খাতায় জাল করিয়া রাখিয়াছেন। সদরের খাতায় সেরূপ জাল করিবার সুবিধা হয় নাই। কোন সন্দেহ হইলে ঠাকুরবাড়ীর খাতাই লোকে দেখে, সদরের খাতা পর্য্যন্ত কেহ সন্ধান করিতে আইসে না ভাবিয়া, তিনি ততদূর সতর্কতার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই।

তাঁহার প্রতারণা এখন সহজেই ধরা পড়িতেছে। চালানে নাই, সদরের খাতায় নাই, সেখানকার লেখাও পত্র শেষের স্বল্প স্থানে গুঁজিয়া দেওয়ার মত। সুতরাং তাহা যে জাল তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

কেন যে রাজার ব্যবহার দারুণ অস্থিরতাপূর্ণ ও সন্দিগ্ধ, কেন যে তিনি মুক্তকেশীকে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য এরূপ ব্যাকুল, কেন যে তিনি হরিমতিকে অর্থ দ্বারা এইরূপে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি সকল কথাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইল। যে কল্পনাতীত অতি ভয়ানক রহস্য এই সকল ব্যবহারের কারণ তাহা অতঃপর আমার হস্তগত। আমি এখন একটী মুখের কথায় রাজার পদপ্রতিষ্ঠা, মান সম্ভ্রম জল বুদ্বুদের ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারি। এক কথায় তাঁহাকে সম্ভ্রমহীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন, অর্থহীন ভিখারী করিয়া দিতে পারি। তখন আমার মনে হইল যে রাজা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশের আর কোন বিলম্ব নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম সাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন এমন বোধ হয় না। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, রাজা হয় ত এই প্রতারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিলুপ্ত করিতেও প্রয়াসী হইতে পারেন। হয় ত তিনি এই সকল খাতা ধ্বংস করিয়া সকল প্রমাণ বিদূরিত করিতে উদ্যত হইবেন। এখানকার খাতা কোন রূপে ধ্বংস করা সম্ভব না হইলেও, ঠাকুরবাড়ীর খাতা ধ্বংস করা সহজ হইতে পারে। এই আশঙ্কা মনে উদিত হওয়ার পর, আমি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, ঠাকুরবাড়ী গিয়া

খাতার সেই পত্রের, গোমস্তার সহি ও মোহরযুক্ত, একটা নকল লইবার অভিপ্রায় করিলাম। আমি তাড়াতাড়ি নায়েব মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া, রামনগর অভিমুখে চলিলাম। পথে পাছে পূর্ব্ববৎ কেহ আমার অনুসরণ করিয়া বিবাদ বাধায় এই আশঙ্কায়, বাজার হইতে একগাছি মোটা লাঠি ক্রয় করিয়া লইলাম। দৌড়াইতে আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষ নিপুণ। সুতরাং আবশ্যক হইলে আমার চরণযুগলও আমাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার আশা হইল।

আমি যখন রাজপুর হইতে বাহির হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে এবং একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক ক্রোশ পরিমিত পথ যাওয়ার পর, একটা লোক সহসা আমার পশ্চাৎ দিক হইতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং তখনই পাশে একটা শব্দ হইল। আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং লাঠি গাছটি উত্তম রূপে ধরিয়া ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকারে সমান চলিতে লাগিলাম। কিছু দূরে যাওয়ার পর, পার্শ্বস্থ একটা বেড়ার ধারে খস্ খস্ শব্দ হইল এবং তখনই তিন জন লোক পগারের মধ্য হইতে রাস্তায় উঠিয়া আসিল। আমি একটু সরিয়া গেলেম। কিন্তু তাহাদের একজন আমার নিকটস্থ হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আমাকে আঘাত করিল। সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া মারে নাই; সুতরাং আমার বড় লাগিল না। আমিও তৎক্ষণাৎ আমার লাঠি দ্বারা তাহার মস্তকে এক আঘাত করিলাম। সে ব্যক্তি

দুই তিন পদ পিছাইয়া সঙ্গীদের স্কন্ধে পড়িবার উপক্রম করিল; আমি এই অবকাশে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। তাহারাও আমার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। প্রথমে খানিক-ক্ষণ আমি তাহাদের ছাড়াইয়া বেশী দূর আসিতে পারিলাম বোধ হইল না। অন্ধকারে, অপরিচিত স্থানে, এরূপে দৌড়ান বড়ই বিপজ্জনক। পার্শ্বের যে কোন দ্রব্যে পা বাধিয়া পড়িয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ক্রমে ক্রমে অনুসরণ-কারীগণের পদ-শব্দ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আমার প্রত্যয় হইল তাহারা পিছাইয়া পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে, অন্ধকারে, অলক্ষিত ভাবে, পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক বেড়ার ফাক দিয়া, আমি ময়দানের দিকে গমন করিতে অভিপ্রায় করিলাম। সম্ভবতঃ অনুসরণকারীগণ, আমি সোজা যাইতেছি মনে করিয়া, সোজাই চলিবে, আমি যে অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছি, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারিবে না। এই অভিপ্রায় করিয়া আন্দাজি পাশের এক বেড়ার ফাক দিয়া আমি ময়দানে প্রবেশ করিলাম এবং পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে লাগিলাম। অনুসরণকারীদ্বয়ের এক জন অপরকে নিরস্ত হইতে বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম। তাহারা দৌড় বন্ধ করিল তাহাও বুঝিলাম। তাহাদের পদ শব্দ ও কণ্ঠস্বর কিছুই আর আমার কর্ণগোচর হইল না। আমি আন্দাজে আন্দাজে, অন্ধকারে, ময়দানের মধ্যে, দৌড়িতে লাগিলাম। যেমন করিয়া হউক, পুরাণ রাম-নগরে আমার যাইতেই হইবে, তা যত বিপদই হউক, আর যে

অসুবিধাই হউক। কেবল এক সঙ্কেত আমি স্থির রাখিলাম। যখন আমি রাজপুর হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন আমার পিছনে ঝড় বহিতেছিল। এখনও সেই ঝড় পিছনে রাখিয়া আমি ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে বেড়া, খানা, ডোবা, ঝোপ পার হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে চলিতেছি, এমন সময়ে দূরে আলোক জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি পথ জানিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলাম; নিকটস্থ হইতে না হইতে দেখিলাম, একটা লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরে আসিতেছে। আমাকে দর্শনমাত্র সে ব্যক্তি আমার মুখের দিকে লণ্ঠন উচ্চ করিয়া ধরিল। আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক পুরাণ রামনগরেই আসিয়া পড়িয়াছি। লণ্ঠনধারী ব্যক্তি অপর কেহই নহেন, আমার প্রাতের পরিচিত গোমস্তা মহাশয়। দেখিলাম তাঁহার ভাব ভঙ্গীর অতিশয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাকে নিতান্ত অস্থির ও সন্দেহযুক্ত বোধ হইল। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মই আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"চাবি কোথায়? আপনি লইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"চাবি কি? আমি তো এই রাজপুর হইতে আসিতেছি। চাবি কিসের?"

বৃদ্ধ নিতান্ত অস্থির ভাবে বলিলেন,—"ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবি—যেখানে কাগজ থাকে। এখন উপায় কি? ভগবান্ কি ঘটাইলে? শুনিতেছেন মহাশয়, চাবি সব হারাইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"কেমন করিয়া হারাইল? কখন? কে লইল?"

অনিশ্চিত দৃষ্টির সহিত গোমস্তা বলিলেন,—"কিছু জানি না। আমি ঠাকুরবাড়ী হইতে এই ফিরিয়া আসিতেছি। তার পর বড় দুর্য্যোগ দেখিয়া দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তার পর ঐ দেখুন জানালা খোলা; কে ভিতরে ঢুকিয়া চাবি লইয়া গিয়াছে।"

তিনি আমাকে খোলা জানালা দেখাইবার নিমিত্ত যেমন হাত নাড়িলেন, তেমনই লণ্ঠন খুলিয়া গেল এবং দমকা বাতাস লাগায় বাতি নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম,—"শীঘ্র আর একটা আলো লইয়া আসুন। তাহার পর চলুন ঠাকুরবাড়ী যাই। শীঘ্র. কোন বিলম্ব না হয়।"

যে আশঙ্কা আমি করিয়াছি, তাহাই দেখিতেছি ফলিল! এত যত্ন করিয়া যে ভয়ানক প্রতারণা আমি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং যে জন্য আমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপ করতলগত বলিয়া বোধ করিতেছি, তাহার নিদর্শন বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়। কারণ যদি রাজা ঠাকুরবাড়ীর খাতা সরাইয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জালের প্রমাণ আর থাকিল না। তাঁহার মাতার চরিত্র ও নিজ জন্ম বৃত্তান্তের কোন প্রশ্ন এত দিন পরে উত্থিত হওয়া সম্ভব নহে। যদিই বা সে কথা এখন উঠে, তাহা হইলে এদেশে তাঁহার পিতা মাতার বিবাহ হয় নাই বলিলেও, লোকে মানিয়া লইতে পারে। বিশেষতঃ তাঁহার এখন যেরূপ মান সম্ভ্রম, তাহাতে এরূপ কোন সন্দেহ অধুনা লোকের মনে

উদিত হওয়াই অসম্ভব। অতএব এখন খাতা খানি সরাইতে পারিলে রাজার সকল দিক রক্ষা হয় এবং আমারও সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফল হয়। না জানি এতক্ষণে কত সর্ব্ব-নাশই হইয়া গেল ভাবিয়া, আমি আর গোমস্তার আলোক-সহ পুনরাগমনের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; সেই অন্ধকারেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, বিপরীত দিক হইতে একটি মনুষ্য আসিয়া আমার নিকটস্থ হইল এবং সবিনয়ে বলিল,—"রাজা, আমাকে ক্ষমা করুন—"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"অন্ধকারে তোমার ভুল হইয়াছে। তুমি রাজা প্রমোদরঞ্জনকে খুঁজিতেছ কি? আমি রাজা প্রমোদরঞ্জন নহি।"

সে ব্যক্তি থতমত খাইয়া বলিল,—"আমি আপনাকে আমার মুনিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।"

"তুমি কি এই স্থানে তোমার মুনিবকে দেখিতে পাইবে মনে করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে, এই গলিতে অপেক্ষা করার জন্য আমার প্রতি হুকুম ছিল।"

এই বলিয়া সে লোকটা চলিয়া গেল। এদিকে লণ্ঠনসহ গোমস্তা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ব্যস্ততার অনুরোধে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। তিনি উল্লিখিত লোকটাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ও কে? ও কিছু জানে না কি?"

আমি বলিলাম,—"উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই,— চলুন এখন।"

গলির মোড় ছাড়াইলেই ঠাকুরবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা গলির মোড় ছাড়াইবামাত্র একটী পল্লীবাসী শিশু আমাদের নিকটস্থ হইয়া গোমস্তা মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দাদা ঠাকুর, দপ্তরখানার ভিতর মানুষ ঢুকিয়াছে। ভিতরের দিক হইতে কুলুপ বন্ধ করার শব্দ আমি শুনিয়াছি; আর দিয়েশলাই জ্বালিয়াছে, তার আলো জাঁনালার ফাক দিয়া দেখিয়াছি।"

গোমস্তা ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া আমার গায়ের উপর ভর দিলেন। আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম,—"ভয় কি? চলুন না শীঘ্র। এখনও বিশেষ দেরি হয় নাই। সে যেই হউক না, আমরা এখনই তাহাকে ধরিতে পারিব; আপনি লণ্ঠন লইয়া যত শীঘ্র পারেন আমার সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর অভিমুখে চলিলাম। হঠাৎ পার্শ্বে কোন লোকের পদ শব্দ শুনিয়া আমি ব্যগ্রতাসহ সেই দিকে ফিরিবামাত্র দেখিতে পাইলাম সেই চাকরটাও ছুটিয়া আসিতেছে। আমি তাহার দিকে ফিরিবামাত্র সে বলিল,—"আমি আমার মুনিবের সন্ধানে আসিয়াছি।" আমি তাহার কথায় মনোযোগ না দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যেই গলির মোড় ছাড়াইলাম, সেই ঠাকুরবাড়ী নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিতে পাইলাম দপ্তরখানার বহুতর ঘুলঘুলি দিয়া অতিশয় আলোক বাহির হইতেছে। দপ্তর

খুব নিকটস্থ হইলাম, তখন কাগজ ও কাপড় পোড়া গন্ধ পাইতে লাগিলাম এবং চটপট শব্দও শুনিতে পাইলাম। ক্রমেই ঘুলঘুলির আলোক অধিকতর প্রবল হইতে লাগিল। আমি দৌড়িয়া গিয়া দরজায় হাত দিলাম। কি সর্ব্বনাশ! দপ্তরখানায় আগুন লাগিয়াছে! এই ভয়ানক ঘটনা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পর, আমি সে স্থান হইতে পদমাত্র নড়িবার পূর্ব্বে, এবং একবার নিশ্বাস ফেলিবারও পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম, কে ঘরের ভিতর হইতে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল এবং তালায় চাবি ঘুরাইতে লাগিল; আর শুনিতে পাইলাম, কে দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে সাহায্যের জন্য অতি ভয়ানক হৃদয় বিদারক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যে চাকরটার সঙ্গে আমার তুইবার দেখা হইয়াছিল সে নিতান্ত অবসন্ন ও কাতর হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল এবং বলিল,—"হে ভগবান্ কি করিলে? নিশ্চয়ই রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের গলা। নিশ্চয়ই তিনি।"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আর একবার ভিতর হইতে তালায় চাবি ঘুরাইবার শব্দ পাওয়া গেল। গোমস্তা বলিলেন,—"হাগবান্, কাহার অদৃষ্টে এরূপ অপমৃত্যু লিখিয়াছ? সর্ব্বনাশ হইয়াছে? ও সেই হউক, উহার মৃত্যু নিশ্চিত। ও যে তালা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে।"

অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তির দারুণ দুষ্কৃতির জন্য মনে তাহার উপর যত ক্রোধ ছিল; ঐ হৃদয়হীন নরাধম সততা ও পবিত্রতা, প্রেম ও অনুরাগ যেরূপে পদবিদলিত করিয়াছে;

তজ্জন্য উহার উপর যে মর্ম্মান্তিক নির্যাতন স্পৃহা ছিল; বহুদিন ধরিয়া উহার পাপোচিত প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যে দুর্দ্দমনীয় বাসনা ছিল, সে সকলই অধুনা আমি বিস্মৃত হইলাম—অতীত স্বপ্নের ন্যায় তৎসমস্ত আমার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন তাহার বর্ত্তমান নিরতিশয় শোচনীয় দশা ভিন্ন আমার আর কিছুই মনে স্থান পাইল না। এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার সাধন ভিন্ন আমার অন্তরে আর কোন প্রবৃত্তি থাকিল না। আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"তালা বিগড়াইয়া গিয়াছে। জানালার নিকট আসিবার চেষ্টা কর। আমরা জানালা ভাঙ্গিবার উপায় করিতেছি। তুমি যে হও, আর বিলম্ব করিলে নিশ্চয়ই মারা যাইবে।"

শেষবার কুলুপের শব্দ হওয়ার পর, অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি আর সাহায্যের জন্য চীৎকার করে নাই। এক্ষণে তাহার সজীবতার নিদর্শনস্বরূপ কোন শব্দই আর শুনা যাইতেছে না। কেবল দাহ্য পদার্থের ফট্ ফট্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, চাকরটা উন্মাদের ন্যায় অধীর হইয়া ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, আর গোমস্তা মহাশয়, দূরে মাটীর উপর বসিয়া, কেবল কাঁপিতেছেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমি সহজেই অনুমান করিলাম, এ দুই ব্যক্তি দ্বারা উপস্থিত ব্যাপারের কোন সহায়তা হওয়া অসম্ভব।

তখন কি করা উচিত তাহা আমার মনে হইল না। অদূরে এক ব্যক্তি দুঃসহ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিতেছে, এই দারুণ কল্পনা আমার বুদ্ধিভ্রংশ করিল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নিকটস্থ কাষ্ঠস্তূপ হইতে একখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ উঠাইলাম এবং সেই চাকরটাকেও তাহা জোর করিয়া ধরিতে বলিলাম। উভয়ে তাহা ধরিয়া একটার জানালার সমীপস্থ হইলাম এবং বারম্বার প্রবল বলে সেই বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা জানালায় আঘাত করিতে লাগিলাম। কিয়ংকাল আঘাত করার পর, সেই জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড! রাশি রাশি অগ্নি লক্ লক্ করিতে করিতে সেই বাতায়ন পথ দিয়া বাহিরে ধাবিত হইতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম, এই উপায়ে কিয়ংপ্রমাণ বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যস্থ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিলেও করিতে পারে। কিন্তু বায়ু প্রবেশের অবসর কোথায়? তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় ও হতাশ হইয়া বলিলাম,—"হায় হায়! লোকটাকে বাঁচাইবার কি আর কোন উপায় নাই?"

বৃদ্ধ গোমস্তা বলিলেন,—"কোন আশাই নাই। বৃথা চেষ্টা; যে ভিতরে আছে, সে এতক্ষণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।"

ক্রমে পিল্ পিল্ করিয়া লোক আসিয়া কলরব বাধা-ইল। আমার তখনও মনে হইতে লাগিল, হয়ত হতভাগা এখনও মূর্চ্ছিত হইয়া অধোবদনে ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে। হয়ত এখনও চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঁচান যাইতে পারে। 'এই মনে করিয়া আমি সমাগত দর্শকগণের মধ্যে গিয়া বলিলাম,—"প্রত্যেক কলসী জলের দাম দুই পয়সা

করিয়া দিব। তোমরা ঠাকুরবাড়ী হইতে ঘড়া লও, যে যেখান হইতে পার ঘড়া কলসী জোগাড় কর। কুয়া হইতেই হউক, কি ঠাকুরবাড়ীর পুকুর হইতেই হউক, যত পার জল আনিতে থাক। প্রতি কলসী দুই পয়সা।” এই কথায় দর্শকগণের মধ্যে একটা উৎসাহ উপস্থিত হইল। সকলেই জলের জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিল এবং অনেক ঘড়া ও কলসী সংগ্রহ করিতে লাগিল। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি ও গোলযোগ যত হইতে লাগিল, কাজ তত হইতে লাগিল না। যাহা হউক, সারি সারি অনেক কলসী জল আসিয়া জানালার মধ্য দিয়া অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে লাগিল। পয়সা, সিকি, দুয়ানি, ও কিছু টাকা গোমস্তার হস্তে দিলাম। তিনি জলবাহকগণকে হিসাব করিয়া পয়সা দিতে থাকিলেন। এদিকে এইরূপ কার্য্য চালাইয়া, আমি সেই কাষ্ঠস্তূপ হইতে একখানি লম্বা গুঁড়ি বাছিলাম। যে সকল লোক কলসী বা ঘড়া কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারায় জল আনিতে পারিতেছিল না, তাহাদের সাত আট জনকে সেই কাঠের গুঁড়ি টানিয়া আনিতে উপদেশ দিলাম। আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই গুঁড়ি উঠাইল। আমিও তাহা ধরিলাম। পরে সকলে মিলিয়া দপ্তরখানার দরজায় সেই গুঁড়ি দ্বারা বারম্বার প্রচণ্ডরূপে আঘাত করিতে লাগিলাম। যদিও গুলমেঘমারা সেই প্রকাণ্ড দরজা অতিশয় সুদৃঢ়, তথাপি পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রচণ্ড আঘাত কতক্ষণ সহিতে পারে? অবশেষে ভীষণ শব্দ সহকারে সেই বৃহৎ দরজা ঘরের ভিতর দিকে পড়িয়া গেল। তখন সাগ্রহে সকলেই গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তির

জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিন্তু নিকটস্থ হয় কাহার সাধ্য! দারুণ অগ্নিতাপে আমাদের দেহ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। তখন জলবাহীগণকে এই উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া জল ঢালিতে আদেশ দিলাম। কলসী কলসী জল সেই দরজার মধ্যে পড়িতে লাগিল।

চাকরটা কাতরভাবে অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"তিনি কোথায়?"

গোমস্তা বলিলেন,—"সে কি আর আছে? ছাই হইয়া গিয়াছে। কাগজপত্রও ছাই হইয়া গিয়াছে। হা ভগবান, এ কি করিলে?"

নিরন্তর লোকজন তাড়াতাড়ি করিয়া জল আনিয়া ঢালিতে লাগিল। আমি তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া দূরে গিয়া উপবেশন করিলাম। এদিকে ঠাকুরবাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে জানিয়া, থানার দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল ও চৌকিদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগার উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া লোকেরা আরও আগ্রহসহকারে জল আনিতে লাগিল। যাহাতে এই অগ্নি দপ্তরখানা ছাড়াইয়া, ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য মহলে বিস্তৃত না হয়, দারোগা তাহার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। আমার শক্তি ও উৎসাহ কিছুই নাই। আমি বুঝিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই বোধের পর হইতে আমি, নিতান্ত অবসন্নভাবে, সেই অগ্নিকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নিশ্চেষ্টবৎ বসিয়া রহিলাম। ক্রমেই আগুন কমিয়া আসিতে লাগিল।

হয়ত দাহ্যপদার্থের অভাবে, অথবা অবিরত জলপাত হেতু ক্রমে অগ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে অগ্নি হইতে সাদা সাদা ধূম উদ্গত হইতে লাগিল এবং ক্রমে দেখিলাম পুলিষের লোকেরা দল বাঁধিয়া সেই ভগ্ন দ্বার সমীপে দাঁড়াইল এবং সমাগত দর্শকগণ আরও পশ্চাতে দাঁড়াইল। দুইজন কনষ্টেবল দারোগার আদেশক্রমে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং অনতিকাল মধ্যে ধরাধরি করিয়া একটা বোঝা লইয়া ফিরিল। দর্শকেরা সরিয়া আসিল এবং দুই ভাগ হইয়া গেল। সকলেই যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল! স্ত্রীলোক ও শিশুগণ সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিল। ক্রমে সেই বিপুল জনতার মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপ বিভিন্ন উক্তি সমূহ আমার শ্রুতিগোচর হইল।

"পেয়েছে পেয়েছে?" "হাঁ।" "কোথায় পেলে?" "দরজার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল?" "খুব পুড়িয়াছে কি?" "গা পুড়িয়াছে, মুখখানা পোড়ে নাই।" "না মুখও পুড়েছে।" "না না পোড়ে নাই।" "লোকটা কে?" "রাজা, একটা রাজা।" "রাজা তা ওখানে কেন?" "রাজা না হবে।" "না রাজাই বটে।" "নিশ্চয়ই একটা কুমৎলব ছিল।" "তা আর বলিতে?" "দপ্তরখানা জ্বালাইয়া দিতে গিয়াছিল।" "তাই হবে।" "দেখিতে কি বড় ভয়ানক হয়েছে?" "হয়েছে বইকি? "মুখখানা বড় ভয়ানক হয় নাই।" "কেহ তাকে চেনে কি?" "একটা লোক বলছে, চেনে?" "কে সে?" "একটা চাকর। কিন্তু সে

এমনই বেকুবের মত হইয়া গিয়াছে যে দারোগা তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।” “আর কেহই চেনে না কি?”

এমন সময় দারোগা মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“চুপ্‌, চুপ্‌।” তৎক্ষণাৎ সকল গোল থামিয়া গেল। তখন দারোগা মহাশয় বলিলেন,—“যে ভদ্রলোক এই ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?”

বহু কণ্ঠে একসঙ্গে শব্দ উঠিল,—“এই দিকে. এই যে মহাশয়।”

দারোগা মহাশয় লণ্ঠন হস্তে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন—“মহাশয়! একবার কৃপা করিয়া এই দিকে আসিবেন।”

এই বলিয়া তিনি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি তখন কথা কহিতে পারিলাম না; তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেও বলিলাম না। মৃত ব্যক্তিকে আমি কখন দেখি নাই, সুতরাং আমার তাঁহাকে চিনিবার কোন সম্ভাবনা নাই, এই কথা কয়টি বলিব ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। আমি যন্ত্র-পুত্তলির মত তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“মহাশয়, এই মৃত ব্যক্তিকে চেনেন কি?”

সে স্থানটায় অনেক লোক গোল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার সম্মুখে লণ্ঠন হস্তে তিন ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের দৃষ্টি এবং সমবেত সমস্ত লোকের দৃষ্টি আমারই মুখের প্রতি সঞ্চালিত হইল। সম্মুখস্থ ব্যক্তিত্রয় লণ্ঠন নত

করিয়া ধরিল। আমার চরণ সমীপে কি পতিত রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিলাম।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনি চেনেন কি মহাশয় ?"

ধীরে ধীরে আমি দৃষ্টি নত করিলাম। প্রথমতঃ বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থ-বিশেষ আমার চক্ষে পড়িল। তাহার উপর যে এক আধ ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাইলাম। তাহার পর কি দেখিলাম? সেই ক্ষীণালোকে তাঁহার ঝলসিত, জীবনবিহীন বদন আমার চক্ষে পড়িল। এইরূপে ইহজীবনে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইল। নিয়তির অচিন্তনীয় ব্যবস্থাক্রমে, অদ্য এই ভাবে আমাদের দর্শন ঘটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিষ তদন্ত সে দিন যাহা হইবার তাহা হইল। পরদিন বৈকালে থানায় আবার বিশেষরূপ লেখাপড়া হইবে; আমাকেও সেখানেও যাইতে হইবে কথা থাকিল। আমি রাত্রে পূর্ব্বপরিচিত ভজহরির দোকানে নিতান্ত ক্লান্ত ও কাতরভাবে গিয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া ডাকঘরে চিঠির সন্ধানে গমন করিলাম। এদিকে যাহাই কেন ঘটুক না, কলিকাতা হইতে অন্তরে থাকায় লীলা ও মনোরমার জন্য যে দুশ্চিন্তা, কিছুই তাহার সমতুল্য নহে। মনোরমার পত্র পাইলে হৃদয়

কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবে জানিয়া, আমি প্রাতে উঠিয়াই ডাকঘরে গমন করিলাম। মনোরমার পত্র আসিয়াছে। কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই; তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছেন। আমি কোথায় আসিয়াছি মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লীলাকে বলি নাই বলিয়া, লীলা বড়ই অভিমানিনী হইয়াছেন এবং আমি ফিরিয়া গেলে আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিবেন না বলিয়াছেন। মনোরমার পত্রে এ কথা পাঠ করিয়া মন বড়ই আনন্দিত হইল। লীলার সহিত কলহ হইবে! না জানি সে কলহ কত মিষ্ট! লীলা আবার পূর্ব্ববৎ সজীব ও প্রফুল্ল হইয়াছেন, ইহজগতে এতদপেক্ষা শুভসংবাদ আমার পক্ষে আর কিছুই নাই।

আমি মনোরমাকে এখানকার সমস্ত সংবাদ একে একে পরে পরে লিখিয়া জানাইলাম। যাহাতে এ সকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও লীলা জানিতে না পারেন এবং কোন প্রকার সংবাদপত্র লীলার হস্তে না পড়ে, তজ্জন্য মনোরমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। অন্য স্ত্রীলোক হইলে, এ সকল কথা এরূপ ভাবে আমি কখনই জানাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু বিগত বৃত্তান্ত দ্বারা মনোরমার যেরূপ সাহস, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে তাঁহাকে এ সকল ব্যাপার জানাইলে কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। পত্রখানি নিতান্ত দীর্ঘ হইল। বৈকালে আমাকে থানায় যাইতে হইল।

যথাসময়ে থানায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, ইনিস্পেক্টর,

সবইনিস্পেক্টর, হেডকনষ্টবল, কনষ্টবল প্রভৃতিতে থানা গস্ গস্ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইলে তাঁহাদের তদন্ত আরম্ভ হইল। বহুতর স্বাক্ষী উপস্থিত হইয়াছে; আমিও তাহার মধ্যে অন্যতম। এ সম্বন্ধে কয়টি অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। ১মতঃ মৃত ব্যক্তি কে? ২য়তঃ তাহার মৃত্যু কেমন করিয়া ঘটিল? ৩য়তঃ ঠাকুরবাড়ির দপ্তরখানায় আগুন লাগাইবার কারণ কি? ৪র্থতঃ চাবি অপহরণ করিবার উদ্দেশ্য কি? ৫মতঃ একজন অপরিচিত ব্যক্তি তৎকালে কেন উপস্থিত ছিল? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পুলিষ, রাজপুর হইতে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের পরিচিত কয়েকজন লোক আনাইয়াছেন। চাকরটা এমন বিকলচিত্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার কোন কথা প্রামাণিক বলিয়া পুলিষ বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু রাজপুর হইতে আগত কয়েকজন ভদ্রলোকের স্বাক্ষ্য দ্বারা, অধিকন্তু মৃত ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘড়ি দেখিয়া, তিনি যে রাজা প্রমোদরঞ্জন রায় তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। যে বালক প্রথমেই গোমস্তাকে দেশলাই জ্বালার খবর দিয়াছিল, স্বাক্ষীশ্রেণীর মধ্যে সেও ছিল। সে নির্ভীকচিত্তে সুস্পষ্টরূপে সকল কথাই বলিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে অধিক কথা বলিতে হইল না। আমি বলিলাম যে মৃত ব্যক্তিকে কখন দেখি নাই; তিনি যে তৎকালে পুরাণ রামনগরে ছিলেন তাহাও আমি জানিতাম না; দপ্তরখানা হইতে যখন লাস বাহির করা হয়, তখন আমি সঙ্গে ছিলাম না; আমি পথ ভুলিয়া যাওয়ায়, গোমস্তার বাটীর নিকটে পথ জানিয়া লইবার জন্য, দাঁড়াইয়াছিলাম; সেই সময়ে তাঁহার

চাবি হারাইয়াছে শুনিতে পাই ; যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয় এই অভিপ্রায়ে, আমি তাঁহার সহিত ঠাকুরবাড়ী আসি ; আমি সেই স্থানে আসিয়া আগুন দেখিতে পাই . তথায় আমি শুনিতে পাই কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি দপ্তরখানার ভিতর দিক হইতে কুলুপে চাবি ঘুরাইতেছে ; আমি দয়াপরতন্ত্র হইয়া, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করি। অন্যান্য স্বাক্ষীগণকে চাবি চুরি ও আগুন লাগাইবার কারণ সম্বন্ধে নানারূপ জেরা করা হইল। কিন্তু আমি বিদেশী লোক, সুতরাং এ সকল বিষয়ের কিছুই জানি না বিবেচনায়, আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমাকে যখন এ সকল বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না তখন আমি স্বয়ং যাহা স্থির করিয়াছি তাহা বলিতে কখনই বাধ্য নহি। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সে সকল কথা ব্যক্ত করিলে হয়ত কেহই বিশ্বাসও করিবে না ' যেহেতু এই ব্যাপারের আমি যে কারণ নির্দ্দেশ করিব, তাহার প্রমাণ এক্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আর বলিতে হইলে হয়ত আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত, রাজার সমস্ত প্রতারণা ও অসদ্ব্যবহারের কথা, ব্যক্ত করিতে হইবে। উকীল করালী বাবু যেমন সে সকল কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন নাই, এস্থলেও সম্ভবতঃ সেইরূপ ফল হইবে।

সেখানে বলি না বলি, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমার মনের ভাব এস্থলে লিপিবদ্ধ করায় হানি নাই। রাজা যখন শুনিলেন যে আমি রাজপুরের মারপিটের মোকদ্দমায় জামিনে খালাস হইয়াছি, তখন তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া,

আমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত, শেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। পথিমধ্যে আমাকে আক্রমণ চেষ্টা তাহারই একতর এবং দপ্তরখানা হইতে, খাতার যে পত্রে তৎকৃত জাল আছে তাহা অপসারিত করিয়া, তাঁহার দুষ্কৃতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রচ্ছন্ন করা তাহার অন্যতর। শেষোক্ত উপায়ই অধিকতর কার্য্যকর; কারণ তাহা হইলে, তিনি যে প্রতারণা করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান থাকিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার লুক্কায়িত ভাবে দপ্তরখানায় প্রবেশ করা আবশ্যক এবং খাতার সেই পাতখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পুনরায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বহির্গত হওয়া আবশ্যক। যদি আমার এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অসঙ্গত নহে যে, সুযোগের জন্য তাঁহাকে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাত্রে সুযোগ ক্রমে চাবি হস্তগত করিয়া, তিনি দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় আবশ্যকানুসারে তাঁহাকে দেশলাই জ্বালিতে হইয়াছিল এবং পাছে আমি বা অন্য কোন কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া প্রতিবন্ধক হই এই আশঙ্কায় তাঁহাকে অগত্যা দপ্তরখানার দরজার ভিতরদিকের কড়ায় তালা লাগাইতে হইয়াছিল।

ইচ্ছাপূর্ব্বক দপ্তরখানায় অগ্নিপ্রয়োগ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। অসাবধানতা ও অত্যন্ত ব্যস্ততা হেতু দৈবাৎ আগুন লাগিয়া যাওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই তিনি প্রথমতঃ আগুন নিভাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অগত্যা পলাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় তিনি সম্ভবতঃ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রিংএ অনেক চাবি ছিল। তিনি ভয় ও ব্যস্ততা প্রযুক্ত হয়ত অন্য চাবি লাগাইয়া তালায় অতিশয় বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তালাটি এককালে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবিলম্বেই আগুন এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে তাঁহার পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া পড়ে। আমরা যৎকালে জানালা ভাঙ্গিয়া পথ পরিষ্কার করি তখন তাঁহার জীবলীলার অবসান না হইলেও, তিনি মরণোপম মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আর কোন যত্ন করিলেও সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যখন আমরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, তাহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আমি মনে মনে সমস্ত ঘটনার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম।

চাকরটাকে বস্তুতই মতিভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। সে বলে মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার প্রভু এবং ঐ গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ছিল। শুনিয়াছি ডাক্তার পরে পরীক্ষা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ঘটনায় ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

আমি নিতান্ত ক্লান্ত শরীর ও অবসন্ন হৃদয় হইয়া ভজহরির দোকানে ফিরিয়া আসিলাম এবং শুইয়া পড়িলাম। পরশ্ব আমার রাজপুরের মোকদ্দমা হইবে। সুতরাং কল্য আমার আর কোন কাজ হাতে নাই। আমার অবস্থা ভাল হইলে আমি কল্য কলিকাতায় গিয়া লীলামনোরমাকে দেখিয়া

আসিতাম। আমার হস্তস্থিত অর্থের ভূরিভাগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ দুরবস্থাপন্ন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ অপব্যয় অসম্ভব।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আমি পূর্ব্ববৎ ডাকঘরে গমন করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ববৎ মনোরমার প্রীতিপ্রদ পত্র পড়িয়া আছে। মনোরমার পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলাম, যতই আমার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে ততই অভিমানিনী লীলাবতীর ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তিনি আমাকে অপরাধোচিত শাস্তি দিবার বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

ডাকঘর হইতে ফিরিবার সময় বিগত রাত্রের ভয়ানক ব্যাপার সমূহের অভিনয় স্থল অদ্য দিবালোকে একবার দর্শন করিতে বাসনা হইল। ইহসংসারের সর্ব্বত্র কঠোর ও মধুরের অপূর্ব্ব মিলন। যে আকাশে প্রদীপ্ত দিবাকর পরিদৃষ্ট হয়, সেই আকাশেই সুধাংশু বিরাজ করে। যে মুহূর্ত্তে বসুন্ধরায় মানব শমন-সদনে গমন করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনব শিশু জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। যে স্থানে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে একজন মানব যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই স্থান অধুনা সম্পূর্ণরূপ উৎসাহ-বিহীন। দেখিলাম, গোমস্তা মহাশয় আপনার ঘরে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। পোড়া ঘরের ছাই মাটী ও অর্দ্ধদগ্ধ দ্রব্যাদি অন্বেষণ ও বাহির করিবার জন্য কয়েকজন মজুর লাগিয়াছে। যে স্থানে সেই অভাগার মৃত দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে অধুনা একজন মজুরের শানকপূর্ণ খানা গামছা জড়ান রহিয়াছে। অগ্নি সন্দর্শনে বহুপ্রকার পতঙ্গ

সন্নিহিত প্রদেশে প্রাণত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছে। কয়েকটী কাক সাগ্রহে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। একটি সুশ্যামাঙ্গী পরিণতাবয়বা যুবতী সগৌরবে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর একজন অনুরূপ যুবা তৎকালে বিপরীত দিক দিয়া আসিতেছে। উভয়ে এই স্থানের নিকটস্থ হইলে, কাহারও নয়ন সাকাঙ্ক্ষ ও সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিল না এবং কাহারও অধর ঈষৎ হাস্যের শোভা বিস্তার না করিয়া নিরস্ত হইল না। এই ত সংসারের প্রকৃতি!

রাজার মৃত্যু হওয়ায়, লীলার স্বত্বপত্র সমর্থন চেষ্টা আপাততঃ সম্পূর্ণরূপ বিফল হইল। এ চিন্তা বহুবারই আমার মনে উদিত হইয়াছিল, অধুনা সেই ভয়াবহ দৃশ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও এই চিন্তা আমার চিত্তে পুনরুদিত হইল। তাঁহার জীবলীলার অবসান হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভূত যত্ন, যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম এবং অপরিমেয় অনুরাগ সকলই ব্যর্থ ও বিফল হইল এবং সমস্ত আশার অবসান হইল। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যদিই তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলেই বা কি হইত? যে রহস্য আমি এত যত্ন করিয়া উদ্ভেদ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে, রাজার সম্পত্তি ও সম্ভ্রমের যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তরাধিকারী তাহারই উপকার হইত। রাজা বেশ্যাপুত্র হইয়াও, প্রবঞ্চনার দ্বারা, প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এক্ষণে রাজার এই রহস্য প্রচারিত হইলে সেই ব্যক্তিরই উপকার হইত। লীলার স্বত্বপত্র সমর্থন বিষয়ে

এই ব্যাপার কোন সহায়তা করিতে পারিত এমন বোধ হয় হয় না। মনে এইরূপ ভাবোদয় হওয়ায়, কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলাম।

ফিরিবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে হরিমতির বাটী তাহারই পাশ দিয়া আমি আসিলাম। আর একবার হরিমতির সহিত দেখা করিয়া যাইব কি? দরকার কি? রাজার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই তিনি বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকালে রাজার সম্বন্ধে তিনি যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িল এবং বিদায় কালে আমার প্রতি যেরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাহাও আমার মনে পড়িল। তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। আমি ধীরে ধীরে ভজহরির দোকানে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় দোকানে বসিয়া ভজহরির সহিত নানা প্রকার গল্প করিতেছি, এমন সময় একটি বালক আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। আমি আলোক সন্নিহিত হইয়া পত্রের শিরোনাম পাঠ করিতে অন্যমনস্ক হইয়াছি, এমন সময় বালক পলাইয়া গেল। তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করা অনর্থক বোধে, আমি অগত্যা পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্র খানি আমার নামে লিখিত। তাহাতে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই এবং হস্তাক্ষরও বিকৃত করিয়া লিখিত। কিন্তু প্রথম দুই এক ছত্র মাত্র পাঠ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম এ পত্র কাহার লিখিত। হরিমতিই এ পত্র লেখিকা। নিম্নে তাহার অবিকল নকল প্রদত্ত হইতেছে।

হরিমতির কথা।

মহাশয়!

আপনি বলিয়াছিলেন, আর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু আইসেন নাই। তা আসুন বা না আসুন, খবর সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, সেই ব্যক্তির সর্ব্বনাশের সময় হয় ত উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনিই হয় ত তাহার বিধি-নিয়োজিত উত্তরসাধক। কথা ঠিক—আপনি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শুনিলাম আপনি সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি আপনি কৃতকার্য্য হইতেন তাহা হইলে আপনাকে আমি পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতাম। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকিলেও, আপনার সাহায্যে আমার বাসনা সফল হইয়াছে। আমার তেইশ বৎসরের জাতক্রোধ আজি মিটিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা আজি ক্ষান্ত হইয়াছে। আপনার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলেও, আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

যে ব্যক্তি আমার এই মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। এ ঋণ কি প্রকারে শোধ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার বয়স দিন থাকিত, যদি আমার যৌবন থাকিত তাহা হইলে নির্জ্জনে প্রেমের রহস্যালাপ করিবার জন্য, আপনাকে

ডাকিয়া পাঠাইতাম। বিশ বৎসর আগে আপনাকে সেরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠাইলে, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আপনার কখনই সাধ্য হইত না। কিন্তু এখন আমার সে দিন আর নাই। অধুনা আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া ঋণ পরিশোধ করা ভিন্ন অন্য উপায় আমার নাই। আপনি যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন কোন কোন বিষয় জানিবার জন্য আপনার মনে অতিশয় কৌতূহল ছিল। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে সকল কথা আমি এক্ষণে জানাইতেছি।

১২২৭ সালে বোধ হয় আপনি বালক ছিলেন। আমি কিন্তু তৎকালে সুন্দরী যুবতী। পুরাণ রামনগরে আমি তখন বাস করিতাম। একটা মূর্খ লোক আমার স্বামী ছিল। যেরূপে হউক, সে সময়ে কোন একজন বড় লোকের সহিত আমার আলাপ ছিল। তাহার নাম করিলাম না, কারণ তাহার নাম সম্ভ্রম কিছুই তাহার নিজের নহে। আপনিও তাহা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছেন।

কিরূপে সে আমার কৃপালাভ করিল তাহা এক্ষণে বলা ভাল। সোণাদানা ও ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত থাকিতে সকল মেয়েমানুষই ভালবাসে, আমিও বড় ভালবাসিতাম। সে ব্যক্তি আমার মন বুঝিয়া, ঠিক আমার পছন্দ মত জিনিষগুলি নিয়তই আমাকে দিত। নিঃস্বার্থ ভাবে সে কখন আমাকে সেই সকল উপহার দিত না। প্রতিদান স্বরূপে আমার নিকট হইতে সে একটা অি

তুচ্ছ প্রার্থনা করিত। আমার স্বামীর অজ্ঞাতসারে, ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরখানার চাবি হস্তগত করিবার সে প্রার্থী। চাবিতে তাহার কি দরকার জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিত। কিন্তু আমি যখন আমার প্রার্থনা মত সামগ্রী পাইতেছি, তখন তাহার উদ্দেশ্য জানিবার আমার দরকার কি? আমি স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহাকে চাবি দিলাম এবং তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার কার্য্যের উপর চক্ষু রাখিলাম। একবার দুইবার, তিনবার, চারিবার, এইরূপে চাবি লইল—চতুর্থবারে আমি তাহার অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম সে ঠাকুরবাড়ীর বিবাহের প্রণামীর খাতায় একটা জমা বাড়াইয়া দিতে চায়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? কাজটা অন্যায় বটে, কিন্তু তাহা লইয়া গোল করিলে গহনাগুলি আমাকে তখন দেয় কে? আমি জানিতে পারিয়াছি বুঝিয়া সে আমাকে চক্রান্তে মিশাইয়া লইল এবং তখন কলে ও কৌশলে আমি ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম।

তাহার পিতামাতার মোটে বিবাহই হয় নাই। অন্য লোকে কেহই একথা জানিত না। তাহার পিতা তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজমুখে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং এক খানি উইল পর্য্যন্ত না করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ছেলে, পিতার মৃত্যু হইবামাত্র, সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিল এবং পাছে শত্রু পক্ষে জানিতে পারিয়া, গোল তুলে এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারী আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, এই ভয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঠাকুরবাড়ীর খাতায় প্রণামী

জমা করিয়া সে সকল আশঙ্কা নির্ম্মূল করিতে মনস্থ করিল। এজন্য তাহাকে নিন্দা করা অন্যায়। সংসারে কে আপনার স্বার্থ এরূপে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে? এই অভিপ্রায়ে দপ্তরখানার খাতা অন্বেষণ করিতে করিতে, যে বৎসরে বিবাহ হইলে তাহার জন্ম হওয়া সঙ্গত হয়, সেই বৎসরের একটা পাতার নীচে একটু ফাঁক দেখিতে পাইয়া তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। এমন সুযোগ ঘটিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎকালে তাহার উপর আমার বড় দয়া হইয়াছিল। তাহার মাতা ব্যভিচারিণী, বা তাহার পিতা দুশ্চরিত্র, অথবা তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই ইত্যাদি কারণে তাহাকে অপরাধী করা কখনই সঙ্গত নহে। অপরাধ যদি কাহারও থাকে তাহা হইলে সেজন্য তাহার পিতামাতাই অপরাধী; ন্যায় বিচার করিলে, আমি কেন, কেহই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

এদিকে খাতার কালীর মত কালী ও তদনুরূপ লেখা তৈয়ার করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। যাহা হউক শেষে সব ঠিকঠাক হইলে সে কাজ গুছাইয়া ফেলিল। এ পর্য্যন্ত আমার সহিত সে কোন মন্দ ব্যবহার করে নাই। আমাকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল সে সকলই দিয়াছে, এবং কোন সামগ্রী ফাঁকি দিয়া ছেলে ভুলানর মত দেয় নাই। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হয়ত আপনি রোহিণীর মুখে শুনিয়াছেন। চারিদিকে অকারণে আমার নিন্দা প্রচার হইয়া উঠিল! উক্ত বড়লোক মহাশয়কে ও আমাকে

নির্জ্জনে, রাত্রিকালে বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া আমার স্বামী যাহা মনে করিলেন তাহা বোধ করি আপনি শুনিয়াছেন। তাহার পর সেই বড়লোক মহাশয় আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা বোধ করি আপনি শুনেন নাই। আমি তাহা বলি শুনুন।

ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া আমি তাহাকে সকাতরে বলিলাম,—"দেখ, অকারণে আমার স্বামী আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন এবং আমাকে সত্য সত্যই কলঙ্কিনী বলিয়া মনে করিতেছেন। তুমি দয়া করিয়া আমার এই কলঙ্ক দূর করিয়া দেও। তোমাকে অন্যান্য সকল বৃত্তান্ত বলিতে হইবে না। তুমি কেবল আমার স্বামীকে বুঝাইয়া দেও, তিনি যে বিষয়ে আমাকে অপরাধিনী মনে করিতেছেন, তাহাতে আমার এক বিন্দুও অপরাধ নাই। তোমার জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমার এই উপকার তোমাকে করিতেই হইবে।" সে স্পষ্ট বলিল যে, এ কার্য্য সে পারিবে না। সে আরও বলিল যে, এই মিথ্যা কথা আমার স্বামী ও অন্যান্য সকলে বিশ্বাস করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল; কারণ যতদিন তাহাদের মনে এই বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন প্রকৃত বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমি তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলাম এবং বলিলাম আমি প্রকৃত কথা সকলকে বলিয়া দিব। তাহার উত্তরে সে বলিল, কথা ব্যক্ত হইলে তাহারও যেমন সাজা হইবে, আমারও তেমনই সাজা হইবে; আইনের চক্ষে উভয়েই সমান অপরাধী।

কথা সত্য! এই নরাধম আমাকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছে। আমি আইন কানুন কিছুই বুঝি না, পরিণামে কি হইবে তাহাও চিন্তা করি নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া, তাহার প্রয়োজন ও আগ্রহ বুঝিয়া তৎপ্রদত্ত অলঙ্কারাদির লোভে পড়িয়া আমি গলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার সহায়তা করিয়াছিলাম। এখন কাযেই আমিও জড়াইয়া পড়িয়াছি। একথা ব্যক্ত হইলে তাহারও যে দণ্ড আমারও সেই দণ্ড। এই রূপে সেই দুরাত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমাকে তাহার ভয় করিয়া চলিতে হইল। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, কেন আমি সেই পাপিষ্ঠ প্রবঞ্চককে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যে মহাত্মা সেই নরাধমের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ যত্নবান হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এত কথা কেন আমি সন্তোষ সহকারে লিখিয়া জানাইতেছি?

আমাকে সম্পূর্ণরূপে চটাইতেও তাঁহার সাহস হইল না! আমার ন্যায় স্ত্রীলোককে অতিশয় বিরক্ত করাও যে নিরাপদ নহে তাহাও সে বুঝিত। এজন্য সে আমাকে আর্থিক সাহায্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তাহার দয়ার সীমা নাই! পাপিষ্ঠ আমাকে দয়া করিয়া কিছু পুরস্কার এবং আমাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহার জন্য আমার কিছু ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব করিল। আমি দুইটি সর্ত্ত পালন করিলে, সে আমাকে তিন মাস অন্তর যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবে, স্বীকার করিল। ও: তাহার কি দয়া!

শয়তা ! সে দুই সর্ত্ত কি শুনুন। ১ম, তাঁহার এবং আমার উভয়েরই ইষ্টের জন্য, আমি এ সম্বন্ধে নীরব থাকিব। ২য়, তাহার অনুমতি না লইয়া, আমি রামনগর হইতে অন্য কোথায় যাইতে পারিব না। কিন্তু আমার তখন আর উপায় নাই। কাজেই পাপিষ্ঠের এই সকল সর্ত্তে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইল। আমার মূর্খ স্বামী ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, আমার দুর্নাম প্রচার করিয়াছে। এক্ষণে, তাহার গলগ্রহ হওয়ার অপেক্ষা, এই নরাধমের সাহায্যে সুখ-সচ্ছন্দে থাকাই ভাল। মোটা টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। যে সকল সতী লক্ষ্মীরা আমাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার দিন কাটিতে লাগিল ভাল।

এই রূপে সেই স্থানে থাকিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবার জন্য আমি বিশেষ যত্নশীল থাকিলাম, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলাম। তাহার প্রমাণ আপনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। এই গুপ্ত কাণ্ড আমি কিরূপে গোপন করিয়া রাখিলাম এবং আমার পরলোকগত কন্যা মুক্তকেশী তাহার কিছু জানিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা জানিতে আপনি নিশ্চয়ই কৌতূহল-যুক্ত হইয়াছেন। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, সুতরাং কোন কথাই আমি গোপন করিব না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, দেবেন্দ্র বাবু, আপনি যে আমার কন্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্ধেতু আমি বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না। আমি তাহার কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। যদি তাহার বাল্যজীবন জানিতে আপনার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনি রোহি-

ণীর নিকট হইতে তাহা জানিবেন। কারণ তিনি সে বৃত্তান্ত আমার চেয়ে ভাল জানেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল আমি মেয়েটাকে কখনই বড় ভাল বাসিতাম না। সে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার জ্বালার কারণ ছিল; বিশেষতঃ তাহার স্থূলবুদ্ধি আমার বড়ই বিরক্তিকর। আমি সরল ভাবে সকল কথা বলিলাম; আশা করি ইহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

রাজার সর্ত্ত পালন করিয়া, আমি তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ভোগ করিতে লাগিলাম এবং স্বচ্ছন্দরূপে দিনপাত করিতে থাকিলাম। যদি কখন আমার কোন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইত তাহা হইলে আমার এক নূতন প্রভুর নিকট আমাকে হুকুম লইতে হইত। তিনি তাদৃশ স্থলে অনুমতি প্রদান করিতে প্রায়ই কুণ্ঠিত হইতেন না। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে নরাধম আমার উপর অত্যধিক অত্যাচার করিতে কখনই সাহসী হইত না। তাহার গুপ্ত কাণ্ড, নিজ সাবধানতার অনুরোধেও, যে আমি সহসা প্রকাশ করিতে পারিব না, তাহা সে বেশ জানিত। আমি একবার আমার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর মরণকালে শুশ্রূষা করিতে শক্তিপুরে গিয়া অনেক দিন ছিলাম। শুনিয়াছিলাম, তাহার অনেক টাকা ছিল। মনে করিয়াছিলাম যে যদি এখন কোন কারণে আমার ত্রৈমাসিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য দিকে, সময় থাকিতে, চেষ্টা দেখা মন্দ নয়। কিন্তু আমার কষ্টই সার হইল। সিকি পয়সাও পাওয়া গেল না, কারণ তাহার কিছুই ছিল না।

শক্তিপুরে যাইবার সময় আমি মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। রোহিণী যে তাহাকে নয় করিয়া লইতেছে এজন্য আমি কখন কখন বড় বিরক্ত হইতাম এবং তাহাকে কাড়িয়া আনিতাম। রোহিণীকে আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না; ও রকম বেকুব মেয়েমানুস আমার দুচক্ষের বিষ। আমি তাহাকে জ্বালাতন করিবার জন্যই, সময়ে সময়ে মুক্তকেশীকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতাম। এই রূপ কারণেই তাহাকে শক্তিপুরে সঙ্গে লইয়া যাই। সেখানে তাহাকে আনন্দধামের মেয়ে স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলাম; আনন্দধামের জমিদারণী শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর চেহারা অতি সাধারণ ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া-ছিল। যাহা হউক, বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সেই জমিদারণী ঠাকুরাণী আমার কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগি-লেন। স্কুলে সে তো কিছুই শিখিত না, বাড়ার ভাগ আনন্দধামে আদর পাইয়া আরও বিগড়াইয়া উঠিল। তাহার অনেক খেয়াল ছিল; তাহার উপর আবার আনন্দধাম হইতে সর্ব্বদা সাদা কাপড় পড়ার খেয়াল বাড়িয়া আসিল। আমি নিজে নানা প্রকার রঙ্গীন কাপড় পরিতে ভাল বাসি-তাম। সুতরাং মেয়ের অন্য ভাব আমার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইল এবং আমি বাড়ী ফিরিয়াই তাহার ঘাড় হইতে এ ভূত ছাড়াইব স্থির করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন ক্রমেই তাহার এ সংস্কার আমি দূর করিতে পারিলাম না। তাহার প্রকৃতিই এইরূপ। যদি তাহার মাথায় কোন

কথা একবার ঢকে তাহা হইলে তাহা আর কোন মতেই সে ছাড়ে না। সকল বিষয়েই তাহার এইরূপ ভয়ানক এক-গুঁয়েমি। তাহার সহিত আমার অবিশ্রান্ত ঝগড়া চলিতে লাগিল। রোহিণী আমাদের এই ভাব দেখিয়া মুক্তকেশীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিতে চাহিলেন। যদি রোহিণীও তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাদা কাপড় পরায় মত না দিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে মেয়েকে যাইতে দিতাম। কিন্তু মেয়ের দিকে হইয়া আমার বিপক্ষতা করায়, আমি তাহাদের দুই জনকেই জব্দ করিব স্থির করিলাম এবং মেয়েকে রোহিণীর সহিত কোন মতেই আসিতে দিলাম না। মেয়ে আমার নিকটেই থাকিল। ক্রমে গ্রামমধ্যে আমার সুযশ ব্যক্ত হইতে লাগিল এবং আমার মেয়েটিকে অনেকেই ভালবাসিতে লাগিল। তাহার সাদা কাপড়ের ঝোঁক আমি আর বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতাম না। কিছু দিন বাদে ঐ পাপিষ্ঠের গোপনীয় কাণ্ড সম্বন্ধে বিষম এক বিবাদ বাধিয়া গেল।

আমি একবার কাশী যাইব মনস্থ করিয়া, অধুনা সরকস্থ বড়লোক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠাই। তিনি আমার পত্রের উত্তরে নানাবিধ অতি কুৎসিত ও ঘৃণিত কটূক্তি পূর্ণ এক পত্র দ্বারা আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পাঠান। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমার এতই রাগ হয় যে, আমি মেয়ের সাক্ষাতেই তাহাকে নানাপ্রকার গালি দিতে আরম্ভ করি এবং বলিয়া ফেলি যে, "নরাধম জানে না যে, আমি একটি মুখের কথায় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে

পারি।" কেবল এই টুকুমাত্র বলার পর, মুক্তকেশী সাগ্রহে কৌতূহলযুক্ত হইয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছে দেখিয়া, আমার চৈতন্য হইল এবং আমি চুপ করিলাম। আমার বড়ই ভাবনা হইল। মেয়ের মাথার ঠিক নাই। সে যদি লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় যে তাহার মা মনে করিলে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা হইলেও লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই ভাবিয়া আমি মেয়েকে কাছ ছাড়া হইতে না দিয়া সাবধান করিয়া রাখিলাম। কিন্তু মহাশয়, পর দিনই বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

বলা নাই কহা নাই, পর দিন বড়লোক মহাশয় আমার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে সে যে কঠোর পত্র লিখিয়াছে তজ্জন্য তাহার অনুতাপ হইয়াছে। পাছে আমি বড় রাগ করিয়া থাকি, এই ভাবনায় সে আমাকে ঠাণ্ডা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে দিন তাহার নিজের মেজাজ খুব খারাপ। সে মুক্তকেশীকে দেখিতে পারিত না, মুক্তকেশীও তাহাকে দেখিতে পারিত না। এক্ষণে মুক্তকেশীকে ঘরে দেখিয়া সে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিল। কিন্তু মুক্তকেশী সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। ভয়ানক চীৎকার করিয়া আপনাদের বড়লোক বলিল,—"শুনিতে পাচ্ছিস্? এ ঘর থেকে বেরিয়ে যা।" মুক্তকেশীও অতিশয় রাগিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমার সহিত ভদ্রভাবে কথা কহ।" দুর্ব্বৃত্ত আমার দিকে

চাহিয়া বলিল,—"এ পাগলটাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেও।" মুক্তকেশী চিরকালই আপনাকে যথেষ্ট বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করে; তাহাকে পাগল বলায় সে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, সে এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যদি ভাল চাও, এখনই আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। এখনই তোমার গুপ্ত কথা আমি বলিয়া দিব। জান না তুমি, একটি মুখের কথায় তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারি।" কালি আমি যে কথা বলিয়াছি সে আজি ঠিক সেই কথাই তাহাকে বলিল। যেন সে সকলই জানে। বড়লোক মহাশয়ের যে ভাব হইল তাহা বলিয়া বুঝান ভার। সে দারুণ ক্রোধে যে সকল কথা বলিয়া আমাকে গালি দিতে লাগিল তাহা এতই ঘৃণাজনক যে, এস্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব। যাহা হউক, গালি গালাজের স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে, নরাধম নিজের সাবধানতার জন্য মুক্তকেশীকে পাগলা গারদে আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তাব করিল। মুক্তকেশী ভিতরকার কথা কিছুই জানে না, আমি তাহাকে রাগের ভয়ে কেবল ঐ কথা বলিয়াছি; সে কেবল ঐ কথাই জানে; আর কিছু সে জানে না; ইত্যাদি নানা কথায় আমি তাহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিলাম। কত দিব্য ও শপথ করিলাম। কিন্তু সে, কিছুই বিশ্বাস করিল না। সে স্থির করিল, নিশ্চয়ই আমি কন্যাকে সকল কথা জানাইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া আমাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। মুক্তকেশীর মনে বদ্ধমূল সংস্কার হইল যে, তাহার ঐ কথায় নরাধম যখন এত ভয় পাইয়াছে

তখন অবশ্যই এ কথা তাহার পক্ষে বড়ই সাংঘাতিক; সে তখন সুযোগ পাইলেই এই কথা সকলকে বলিতে লাগিল। সে পাগলা গারদে গিয়া সেখানকার লোকদিগকে প্রথমেই বলিল যে, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে সে রাজার সর্ব্বনাশ করিবে। আপনি যখন তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তখন কথা উঠিলে, সে হয় ত আপনাকেও একথা বলিত। আমি শুনিয়াছি, এই অতি বড় ভদ্রলোক যে অভাগিনী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মুক্তকেশী তাঁহাকেও একথা বলিয়াছিল। কিন্তু আপনি কিম্বা সেই মন্দভাগিনী যদি মুক্তকেশীকে কখন বিশেষ করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। মুক্তকেশী গুপ্ত কথার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। সে বুঝিয়াছিল যে, একটা গোপনীয় কথা আছে সত্য। কিন্তু কি সে কথা, তাহার এক বর্ণও সে জানিত না।

বোধ করি এতক্ষণে আমি আপনার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছি। আমার সম্বন্ধে বা কন্যার সম্বন্ধে আর কিছুই আমার বলিবার নাই। মনোরমা নাম্নী একটি মেয়ে মানুষ আমাকে মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবে জানিয়া, আপনার ভদ্রলোক মহাশয়, উত্তরের জন্য, আমার কাছে একটা মুসাবিদা রাখিয়াছিল। নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোকের নিকট নরাধম আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়াছে। বলুক, সে যখন আর নাই, তখন তাহার কথায় আর ক্ষতি বৃদ্ধি নাই

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত বন্ধুভাবে আপনাকে সমস্ত বিব-

রণ জানাইলাম ; কিন্তু অতঃপর আপনাকে অতিশয় ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিয়া পত্রের সমাপ্তি করিব। আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে, আপনি অতীব সাহসিকতা সহকারে মুক্ত-কেশীর পিতৃবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন ; যেন তাহাতে সন্দেহের বিষয় আছে। ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অভদ্রোচিত অকর্ত্তব্য ব্যবহার হইয়াছে। আপ-নাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিলে, আপনি কদাচ তাদৃশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। যদি আপনি মনে করেন যে, আমার স্বামী মুক্তকেশীর পিতা নহেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করা হইবে। যদি এ বিষয়ে আপনার কোন কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে সে কৌতূহল ক্ষান্ত রাখিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি। দেবেন্দ্র বাবু, পর-কালের কথা বলিতে পারি না, ইহকালে সে কৌতূহল নিবৃত্তির আর উপায় নাই।

অতঃপর আমার নিকট আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যদি আর কখন আপনি আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন তাহা হইলে আপনাকে আমি সমাদর করিব। যদি কখন সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে এ পত্রের কোন কথা তুলিবেন না। কারণ এ পত্র যে আমি লিখি-য়াছি তাহা আমি কখনই স্বীকার করিব না। সতর্কতার অনুরোধে আমি পত্রে স্বাক্ষর করিলাম না। এপত্রের লেখার ভঙ্গীও আমার হস্তাক্ষর অপেক্ষা বিস্তর ভিন্ন। আর এরূপ সুকৌশলে এ পত্র আপনার নিকট পাঠাইলাম যে, ইহা

আমার প্রেরিত বলিয়া স্থির করা কখনই সম্ভব হইবে না, এরূপ সাবধানতায় আপনার ক্ষতি কিছুই নাই। কারণ যে সংবাদ ইহাতে আছে, আমার সাবধানতা হেতু, তাহার কোন অন্যথা হইতেছে না।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিমতির এই অত্যদ্ভুত পত্র পাঠ করিয়া প্রথমে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল। পত্রের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে অস্বাভাবিক কঠিনহৃদয়তা, লজ্জাহীনতা ও মনোবৃত্তির নীচতা পরিলক্ষিত হইতেছে, যে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত আমি সবিশেষ চেষ্টাশীল ছিলাম, তাহাই নানা কৌশলে আমার স্কন্ধে আরোপিত করিবার জন্য পত্রের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রযত্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে; তৎসমস্ত মনে করিয়া আমার অন্তরে এতই ঘৃণার উদয় হইল যে, আমি তখনই সেই লিপি খণ্ডবিখণ্ডিত করিতে ছিলাম; কিন্তু সহসা মনোমধ্যে অন্য এক ভাবের উদয় হওয়াতে, আমি বিরত হইলাম।

আমার মনে হইল, পত্র খানির দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও, মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ পক্ষে ইহা আমার সহায় হইতে পারে। মুক্তকেশীর পিতা কে স্থির করা আমার পক্ষে আবশ্যক এবং তাহা আমার অনুসন্ধানের একাংশ

স্বরূপ। তাহার সহিত উপস্থিত ব্যাপারের কোন সংশ্রব থাকা অসম্ভব নহে। পত্রমধ্যে দুই একটি স্থানে এরূপ দুই একটি উক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহা ধরিয়া বিচার, আলোচনা ও অনুসন্ধান করিলে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এখনকার তাহা সময় নয়। সময়ান্তরে, অবকাশ মতে আমি তাহাতে মনঃসংযোগ করিব। অতএব এখন পত্র খানি তুলিয়া রাখাই বিধেয়। এই বিবেচনায় আমি তাহা পকেট বহির মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

কালি একবার আমাকে রাজপুরের ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইবে, তাহার পর এখানকার কার্য্যের শেষ হইবে। প্রাতে উঠিয়াই আমি যথারীতি ডাকঘরে গমন করিলাম। পত্র পাইলাম, কিন্তু তাহা বড় হালকা; যেন তাহার ভিতর কিছুই নাই। আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার খাম খুলিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম ভিতরে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজ ভাঁজা রহিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি কালী চোপসান, ও ব্যস্ততা সহ লিখিত কথা রহিয়াছে মাত্র।

"যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস! আমি বাসা বদলাইতে বাধ্য হইয়াছি। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গলি. ৩নং বাটীতে আসিবে। আমাদের জন্য কোন ভয় করিও না। আমরা উভয়েই নিরাপদ ও সুস্থ আছি। যাহা হউক, শীঘ্র আসিবে।

—মনোরমা"

পত্র পাঠ করিয়াই আমার মনে হইল জগদীশনাথ চৌধুরী নিশ্চয়ই কোন দৌরাত্ম্যের সূচনা করিয়াছেন। ভয়ে আমার

অন্তর অভিভূত হইয়া গেল। আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। না জানি কি হইয়াছে! ধূর্ত্ত জগদীশনাথ চৌধুরী না জানি কি চক্রান্ত করিতেছে! নাগাইদ সন্ধ্যা আমি সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কতই অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহার ঠিক কি? কল্য বৈকালে মনোরমা এই পত্র লিখিয়াছেন, তাহার পর এক রাত্রি অতীত হইয়াছে। কে জানে, হয়ত এই সময়ের মধ্যেই কত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে। কেবল মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের উপর আমার অত্যধিক বিশ্বাসই আমাকে এখনও স্থির হইয়া ভাবিতে সক্ষম রাখিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাজদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিবার সংকল্প করিলাম। পাছে সময় নষ্ট হয় এই ভয়ে, আমি রেলের নিকট হইতে, রাজপুর যাইবার জন্য, এক খানি ঠিকা গাড়ি ভাড়া করিলাম। আমি যখন গাড়িতে উঠিতেছি, তখন আর একটি ভদ্রলোক আমার গাড়িতে অংশিদার হইতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কারণ এ উপায়ে গাড়ির পুরা ভাড়া আমাকে দিতে হইবে না। গাড়িতে বসিয়া আমরা নানাবিধ গল্প করিতে করিতে চলিলাম। এই অগ্নিকাণ্ড ও রাজা প্রমোদরঞ্জনের অপমৃত্যু তৎকালে এদেশের প্রধান ঘটনা; সুতরাং সহজেই সেই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। যে ভদ্র লোকটি আমার অংশিদার হইয়া গাড়িতে উঠিলেন, রাজার উকীল মনি বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ আছে। রাজার এইরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া মনি বাবু, সমস্ত বিষয় অবধারণ

ও সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার সম্পত্তি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ইত্যাদি বিষয়ে মনি বাবুর সহিত এই ভদ্রলোকটির অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। রাজার দেনা এতই অধিক যে, তাহা আর কাহরও জানিতে বাকী নাই। এজন্য উকীল বাবু সে কথা আর গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজা মরণের পূর্ব্বে কোন উইল করিয়া যান নাই; আর উইল করিবার মত তাঁহার কোন সম্পত্তিও ছিল না। স্ত্রীর যে সম্পত্তি তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই পাওনাদারেরা গ্রাস করিয়াছিল। রাজা বসন্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাইয়ের এক পুত্র আছেন। অধুনা তিনি এই ঋণজড়িত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যাহা হউক, তিনি যদি হিসাব করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে বহুকালে সম্পত্তি ঋণমুক্ত হইলেও হইতে পারে।

যদিও শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল, তথাপি এসকল সংবাদ সহজেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমি বিবেচনা করিলাম, রাজার এই জালের সংবাদ ব্যক্ত না করাই সৎ পরামর্শ। যে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া এই ২৩ বৎসর কাল তিনি এই সমস্ত আয় ভোগ করিয়া আসিতেছেন ও যে সম্পত্তি উৎসন্ন করিয়াছেন, সেই সম্পত্তি এক্ষণে ঘটনাচক্রে সেই প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইতেছে। এক্ষণে রাজার জালের কথা ব্যক্ত করায় কাহারও

কোন ইষ্ট সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া লীলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এতাদৃশ নীচতা ও পাপিষ্ঠতা জগতে প্রচারিত না হওয়াই সৎপরামর্শ। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তৎকালে এ কথা ব্যক্ত করিলাম না। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই আখ্যায়িকা বর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের কল্পিত নাম ব্যবহার করিতেছি।

রাজপুরে সমাগত হইয়া আমি এই ভদ্র লোকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম এবং আদালত গৃহে উপস্থিত হইলাম। যাহা আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সেখানে, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত, কেহই উপস্থিত নাই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমার নিষ্কৃতি হইল। আদালত হইতে বাহিরে আসিবামাত্র ডাক্তার বিনোদ বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু তিনি বলিয়া রাখিতেছেন যে, তাঁহার দ্বারা যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি পত্রোত্তরে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম যে, নিতান্ত গুরুতর কার্য্যানুরোধে আমাকে তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। এজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার নিকট আমার চির কৃতজ্ঞতা বাচনিক ব্যক্ত করিয়া যাইতে না পারায়, আন্তরিক দুঃখিত থাকিলাম।

যথাসময়ে আমি ডাকগাড়িতে চড়িয়া কলিকাতায় চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি বেলা ৪।৷০ টার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া এবং দর্প-নারায়ণ ঠাকুরের গলিতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটী বেশ ছোট খাট—দেখিতেও বেশ পরিষ্কার। আমি দরজার কড়া নাড়িবা মাত্র এক সঙ্গে লীলা ও মনোরমা উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়দিন মাত্র আমাদের সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু বোধ হইল যেন কত কালই আমরা তফাৎ হইয়া আছি। প্রথম সাক্ষাতে সকলেরই নয়ন যে প্রকার উৎফুল্ল হইল, মুখ যেরূপ উজ্জ্বল হইল, তাহাতে হৃদয়ে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। লীলার বড় অভিমান। পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঝগড়া করিবার অনেক আয়োজন করিয়াছেন; এত সাধের ঝগড়াও তাঁহার করা হইল না। তিনি আমাকে দর্শন মাত্র হাসিয়া ফেলিলেন এবং আনন্দাশ্রু-সিক্ত নয়নে আমার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম—"লীলা, লেখা চলিতেছে তো?" অভিমানিনী লীলা দুর্দ্দমনীয় হাস্যবেগ চাপিয়া বলিলেন,—"যাও, তুমি বড় দুষ্ট, তোমার সহিত আমার আর কথা নাই।"

আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং সকলে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলাম। আমি তখন মনোরমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা

হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাদের নিকট যে আবার আসিতে পারিব তাহা আমার মনে ছিল না।"

লীলা সাগ্রহে আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"অ্যাঁ! কি হইয়াছিল?"

আমি বলিলাম,—"তুমি যদি আমার উপর রাগ ত্যাগ কর তবে সব বলি।"

লীলা বলিলেন,—"রাগ আমি কখন করি নাই, রাগ কখন করিবও না। তুমি এখন বল কি হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম,—"তুমিও যেমন আমার উপর রাগ কর নাই, আমারও তেমনি কিছুই হয় নাই। তোমার কথাও যেমন মিছা, আমার কথাও তেমনই মিছা। এখন আমাদের ঝগড়া মিটিয়া গেল, কেমন?"

লীলা বলিলেন,—"কাজেই, তুমি যে দুষ্ট, তোমার সহিত আমি ঝগড়া করিতে পারি কই।"

লীলার জীবনের উপর দিয়া যে দারুণ দুর্দ্দৈব বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে নিরতিশয় অবসন্ন ও প্রপীড়িত করিয়াছিল, কিন্তু মনোরমার প্রভূত যত্নবলে লীলার বদনমণ্ডলে সেই বিষাদ-কালিমা এখন আর নাই। করুণাময়ী জননীকল্প মনোরমা দেবীর উদ্ভাবিত কৌশল ও সদ্যুক্তি পরম্পরায় ক্লিষ্টা, রুগ্না, ব্যথিতা লীলাবতীর দেহে ও হৃদয়ে, বাহ্যে ও অন্তরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সজীবতা ও নবীনতার পূর্ণাবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছে। অপরিমেয় স্নেহের শান্তি-সলিল সংস্পর্শে লীলা নবজীবন লাভ করিয়াছেন।

লীলা কার্য্যান্তর উপলক্ষে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থান-

স্তরে চলিয়া গেলে, আমি বর্ত্তমান ব্যাপারে মনোরমার বুদ্ধি ও সাহসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া, কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলাম।

মনোরমা বলিলেন,—"আমার আর তখন লিখিবার সময় ছিল না, তাই সকল কথা লিখিতে পারি নাই। আমার চিঠি পাইয়া তুমি অতিশয় ভাবিত হইয়াছিলে কি? তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখাইতেছে।"

আমি উত্তর দিলাম,—"প্রথমে আমার খুব ভয় হইয়াছিল। তার পর মনে করিলাম, যেখানে মনোরমা আছেন, সেখানে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, জগদীশনাথ চৌধুরীর কোন নূতন চাতুরী এই ভয়ের কারণ। তাই ঠিক কি?"

তিনি বলিলেন,—"ঠিক! কল্য তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। কেবল দেখা নহে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তাও হইয়াছে।"

"কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? আমরা কোথায় থাকি তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছিল?"

"সে আমাদের বাসায় আসিয়াছিল, কিন্তু উপরতলায় উঠে নাই। কেমন করিয়া কি ঘটিল, বলিতেছি শুন। পুরাণ বাসার উপরকার ঘরে লীলা ও আমি কাজ কর্ম্ম করিতেছিলাম। এমন সময় জানালার ফাক দিয়া দেখিতে পাইলাম, রাস্তার অপর ধারে চৌধুরী একটা লোক সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে।"

"তোমাকে কি সে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইয়াছিল ?"

"না—আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল বোধ হয় না।"

"তাহার সঙ্গে যে ছিল সে কে ? অপরিচিত লোক কি ?"

"না দেবেন্, অপরিচিত নয়। আমি তখনই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে পাগলা গারদের অধ্যক্ষ।"

"চৌধুরী কি তাহাকে আমাদের বাসা দেখাইয়া দিতেছিল ?"

"রাস্তায় পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে যেরূপ ভাবে লোকে কথা কহে, তাহারা সেইরূপ ভাবেই কথা কহিতেছিল। যদি সে সময় লীলা আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত নিশ্চয়ই কি একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং হয় ত অত্যন্ত গোল করিয়া ফেলিত। আমি নিয়ত লীলার দিকে পিছন ফিরিয়া জানালার ফাক দিয়া দেখিতে লাগিলাম। শীঘ্রই তাহারা তফাৎ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিয়া গেল। কিন্তু চৌধুরী আবার তখনই ফিরিয়া আসিল এবং পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া পেনসিল দিয়া কি লিখিল। তাহার পর রাস্তা পার হইয়া, সে আমাদের বাসার নীচের দোকানে আসিল। লীলা আমাকে দেখিতে না পায় এই ভাবে আমি দৌড়িয়া বাহিরে আসিলাম এবং কদাচ তাহাকে উপরে উঠিতে দিব না সংকল্প করিয়া নীচের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তখনই দোকানদারের ছোট মেয়েটি সেই কাগজ টুকু হাতে করিয়া আনিল।

নরাধম তাহাতে লিখিয়াছে,—"সুন্দরি! আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যাবশ্যক একটি কথা বলিবার জন্য আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছি।—জগদীশ!" "আমি মনে করিলাম, এরূপ দুর্জ্জনকে সহসা বিদায় করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা, ইহার বক্তব্য জানিয়া লওয়াই সৎপরামর্শ। বিশেষতঃ তুমি এখানে উপস্থিত নাই। এখন তাহাকে বিরক্ত করিলে অত্যাচারের পরিমাণ দশগুণ বাড়িতে পারে। এই মনে করিয়া আমি মেয়েটিকে বলিলাম,—"ভদ্রলোকটীকে তোমাদের পাশের ঘরে থাকিতে বল। আমি এখনই সেখানে যাইতেছি।" পাছে লীলা টের পায় ইহাই আমার বিশেষ ভয়। আমি তখনই দোকানের পাশের ঘরে উপস্থিত হইলাম। বিলাসিতার পরিচায়ক নানা বস্ত্রালঙ্কার সমাচ্ছন্ন বিরাট-কায় চৌধুরীকে সম্মুখে দেখিয়া, পুনরায় আমার কৃষ্ণসরোবরের দিন মনে পড়িল। পরমাত্মীয় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে যেরূপ কথা কহে, সে সেইরূপ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। যেন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যেন আমরা সম্পূর্ণ আত্মীয়তায় বদ্ধ; যেন অনন্তরজাত ঘটনাসমূহ স্বপ্নবৎ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।"

"কি বলিল তাহা তোমার মনে আছে?"

"ঠিক মুখস্থ বলার মত বলিতে না পারিলেও, আমি তাহার মর্ম্ম তোমাকে ঠিক বলিতে পারিব। আমার বিষয়ে সে যে সকল জঘন্য কথা বলিল তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু তোমার বিষয়ে যাহা বলিল, তাহা আমি এখনই বলিতেছি। আমি পুরুষ হইলে তাহাকে প্রহার করি-

তাম। রাগে আমার অন্তর অস্থির হইলেও আমি নীরবে সমস্ত সহ্য করিলাম। সে দুই বিষয়ের প্রার্থী। ১মতঃ আমার প্রতি তাহার অন্তরের অনুরাগ সে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে অনুমতি চাহে। বলা বাহুল্য আমি তাহার তাদৃশ প্রসঙ্গে কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করিলাম। তাহার ২য় কথা, ত্বদীয় পত্র লিখিত শাসন বাক্যের পুনরাবৃত্তিমাত্র। এ কথা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন কি আমি জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাহার প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সে রাজাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে পুনঃপুনঃ বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু রাজা তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। তখন কাজেই চৌধুরীকে রাজার কথা ছাড়িয়া দিয়া, আত্মসাবধানতায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। যদিই তোমার দ্বারা তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে, তুমি যখন কৃষ্ণসরোবর হইতে ফিরিয়া আইস, তখন চৌধুরী অলক্ষিত ভাবে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের বাসা দেখিয়া যায়। উকীলের লোকেরাও সে দিন তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। চৌধুরী এত দিন আমাদের ঠিকানা জানিয়াও, আমাদের উপর কোন দৌরাত্ম্য করিবার প্রয়োজন দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাজার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার ধারণা হইয়াছে, তুমি নিশ্চয়ই অতঃপর এই চক্রান্তের অপর প্রধান ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ মনে হইবামাত্র, সে পাগলা গারদের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং

তাঁহার পলাতকা বন্দিনী কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে আর কিছু উপকার না হইলেও, তোমাকে নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা করিতে হইবে; সুতরাং তাহার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিতে তোমার আর সময় থাকিবে না। সে এ সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। কেবল একই কারণে সে এখনও উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সাধনে বিরত আছে।"

"কি কারণ?"

"সে কারণ বলা ও স্বীকার করা নিতান্ত লজ্জার কথা। আমিই এ সম্বন্ধে একমাত্র কারণ। এ কথা যখন আমার মনে হয় তখন দারুণ ঘৃণায় আমি আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে থাকি। কিন্তু যাহাই হউক, ঐ পাষাণ-হৃদয় দুরাচার আমার প্রশংসায় বিমুগ্ধ। আত্মসম্মানের অনুরোধে, আমি একথা এতদিন বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু তাহার দৃষ্টি, তাহার ভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাহার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। কি বিড়ম্বনা! কি ভয়ানক লজ্জার কথা! আমার সম্বন্ধে কথা বলিবার সময়ে সত্যই দেবেন্দ্র, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, কারাধ্যক্ষকে বাড়ী দেখাইবার সময় তাহার মনে হইল, প্রিয় ভগ্নী লীলাবতীর সঙ্গশূন্য হইলে আমার যাতনার সীমা থাকিবে না। আমার সেই কষ্ট নিবারণের উদ্দেশে, বাড়ী দেখাইতে গিয়াও সে দেখাইতে পারিল না এবং অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ভাবিয়া নিরস্ত থাকিল। আমি এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, যাহাতে তোমাকে তাঁহার বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইতে না দিই, ইহাই তাহার অনুরোধ। পুনরায় কোন কারণ উপস্থিত হইলে সে হয় ত সাধ্যমত অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। মরিয়া যাই সেও ভাল, তবু তাহার মত লোকের সঙ্গে এরূপ চুক্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কিছুই বলিলাম না।"

আমি বলিলাম,—"কথা সব ঠিক বটে, কিন্তু ভয়ের কারণ কিছুই নাই। চৌধুরী কেবল তোমাকে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। কারাধ্যক্ষের দ্বারা আমাদের কোন বিপদ ঘটাইতে তাহার আর সাধ্য নাই। কারণ এক্ষণে প্রমোদরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং হরিমতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে। আমার কথা চৌধুরী কি বলিল?"

সকলের শেষে সে তোমার কথা বলিল। তখন তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার ভাব পূর্ব্বকালের মত হইল। সে বলিল,—"তোমাদের দেবেন্দ্র বাবুকে সাবধান থাকিতে বলিবে। তাঁহাকে বলিয়া দিবে, আমি যে সে লোক নহি। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিতে পারি, সমাজকে পদবিদলিত করিতে পারি এবং আইন ও রাজশাসনকে পদাঘাতে উপেক্ষা করিতে পারি। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যদি আমার পরামর্শমতে চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে আজি দেবেন্দ্র বাবুর লাস লইয়া পুলিষ তদন্ত হইত। আমাকে উত্যক্ত করিলে দেবেন্দ্র বাবুর কদাপি নিষ্কৃতি নাই! তিনি যাহা লাভ

করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকুন। আমি, আপনার অনুরোধে, তাঁহার সে সুখে প্রতিবন্ধক হইব না। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিবেন যে, জগদীশনাথ চৌধুরী কিছুতেই পিছ পা নহে। আর কিছু বলিব না। অদ্য আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমাকে মনে রাখিবেন।' এই বলিয়া এবং কাতর ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল।"

"ফিরিয়া আসিল না? আর কিছু বলিল না?"

"না, গৃহনিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, আর একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে চলিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম যে, এ বাসায় আর কদাচ থাকা নয়। যখন চৌধুরী ইহার সন্ধান পাইয়াছেন এবং তুমি এখানে উপস্থিত নাই, তখন এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে। লীলার স্বাস্থ্যের জন্য, তুমি এ বাসা হইতে উঠিয়া আর একটু নির্জ্জন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে। আমি লীলাকে সেই কথা মনে করিয়া দিলে, সে বড় আনন্দিত হইল। সে সমস্ত সামগ্রী পত্র গোছ গাছ করিতে লাগিল।"

"বাড়ী ঠিক করিলে কেমন করিয়া?"

"কেন? খবরের কাগজে আমি এই বাড়ীর সংবাদ দেখিয়াছিলাম। আমি তখনই রাস্তা হইতে একটা ঠিকা মুটে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। তখনই উত্তর আসিল এবং সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা গাড়ি ভাড়া করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহই আমাদের দেখিতে পাইল না।"

আমি আন্তরিক সন্তোষের সহিত তাঁহার প্রচুর প্রশংসা করিলাম এবং তাঁহার সাহসের ও সুবুদ্ধির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলাম। তখন তিনি নিতান্ত সভয়নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"চৌধুরী অতি দুরন্ত! নিতান্ত ধূর্ত্ত লোক! সে না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। দেবেন্দ্র, এখন কি করিলে আমরা নিরাপদ হইতে পারি বল!"

আমি বলিলাম,—"উকীল করালী বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর এখনও বহুদিন অতীত হয় নাই। আমি যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হই, তখন তাঁহাকে লীলার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াছিলাম;—লীলা তাঁহার জন্ম ভবন হইতে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর খোদিত নিদর্শন তাঁহার মাতৃ-প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল দুই ব্যক্তি এই বিজাতীয় অত্যাচারের নিমিত্ত দায়ী। সেই জন্ম-ভবনের দ্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় উন্মুক্ত হইবে; এবং সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সেই খোদিত নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। যদিও বিচারাসন সমাসীন বিচারপতি মহাশয়ের ক্ষমতা বলে তাহা সংসাধিত না হয়, তথাপি আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে, আমার নিকটে ঐ দুই ব্যক্তিকে দুষ্কৃতির নিমিত্ত দায়ী ও পদানত করিবই করিব।' সেই দুই জনের একজন অধুনা মানব ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি এখনও আছে; সুতরাং আমার সংকল্পও ঠিক আছে।"

দেখিলাম মনোরমার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং

বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। বুঝিলাম আমার প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি আছে। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে অনেক ব্যাঘাত ও অনেক সন্দেহ আছে। এপর্য্যন্ত যাহা কিছু করা হইয়াছে, বা যে যে বিপদের সম্মুখীন হওয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের তুলনায় তৎসমস্ত অতি সামান্য ও নগণ্য। তথাপি মনোরমা, যাহাই কেন হউক না, এ উদ্যম কদাপি পরিত্যাগ করা হইবে না। সমস্ত আয়োজন ঠিক না করিয়া, জগদীশ নাথ চৌধুরীর ন্যায় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির বিরো-ধিতায় দণ্ডায়মান হইব, এরূপ উন্মাদ আমি নহি। ধৈর্য্যে আমার অভ্যাস আছে, সুতরাং সমুচিত সময়ের জন্য অপেক্ষিত থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি। তাহাকে এখন ভাবিতে দেও, সে তোমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, আমরা যথার্থই তাহাতে ভীত হইয়াছি। আমাদের কোন সংবাদই যেন সে না পায়, আমাদের কোন কথাই যেন তাহার কর্ণ-গোচর না হয়। তাহা হইলে তাহার মনে ধারণা হইবে যে, তাহার অবস্থা সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ হইয়াছে। তাহার পর তাহার দারুণ অহঙ্কৃত প্রকৃতি তাহার সর্ব্বনাশের পথ আপনি উপস্থিত করিয়া দিবে। অপেক্ষা করিবার এই এক কারণ—অপেক্ষা করিবার আরও গুরুতর কারণ আছে। শেষ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, মনোরমা, তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হওয়া উচিত।"

সবিস্ময়ে মনোরমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞা-সিলেন,—"তোমার চেয়ে আত্মীয় ইহজগতে আমাদের কেহই

নাই। তোমার সহিত সম্বন্ধ কিরূপে আরও গাঢ় হইতে পারে?”

আমি একটু বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—“সে কথা দেবি, আমি আজ বলিব না। এখন তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই; কখনও হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আপাততঃ আর একটা কথা আমাদের বিশেষ বিচার্য্য। তুমি লীলাকে, তখন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ না জানাইয়া ভাল করিয়াছ, কিন্তু—”

“আরও অনেক দিন না যাইলে একথা লীলাকে বলা কখনই উচিত নহে।”

“না মনোরমা, আজিই সুকৌশলে, অন্যান্য কোন কথা না বলিয়া, কেবল তাঁহার মৃত্যু সংবাদটি লীলাকে জানান আবশ্যক।”

মনোরমা কিয়ৎ কাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“দেবেন, তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। কিন্তু সে শুভ দিন কি ঘটিবে?”

আমি বলিলাম,—“কেন দিদি, তুমি আশঙ্কা করিতেছ? মনোরমা, তুমি আমাদের মা, তুমি আমাদের ভগ্নী। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া আমাদের সকল ভরসা। এখন আমাদের আর কি কষ্ট আছে! আমরা দরিদ্র হইলেও আমাদের সংসার এখন সুখময়। লীলার ধনসম্পত্তি দেখিয়া আমি কদাপি মুগ্ধ হই নাই। লীলা আমার চক্ষে চির প্রেমময়, চির আনন্দ-ময়। অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্না লীলার অপেক্ষা, দুঃখিনী লীলা

আমার বিবেচনায় আরও মধুর। তবে কেন দিদি, তুমি কাতর হইতেছ ?"

মনোরমা আর কোন উত্তর না দিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরদিন লীলা সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার মৃত্যু হেতু তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রান্তি ও বিষাদ বিদূরিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনা হইয়াছেন।

তদবধি আর কখন আমরা তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই এবং তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক কোন প্রসঙ্গও উত্থাপন করি নাই। আমরা অধিকতর আগ্রহ সহকারে সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলাম এবং ধীর ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। আমাদের মনোগত অভিপ্রায় মনোরমা ও আমি প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। অবৈধ বোধে, আমরা উভয়েই তাহা লীলার নিকট অধুনা ব্যক্ত করিলাম না।

চৌধুরী যদি কলিকাতা হইতে অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমার সকল আশাই ব্যর্থ হইবে। কারণ চৌধুরীকে আয়ত্তগত করিয়া তাহার পাপোচিত দণ্ড বিধান করিতে হইবে ইহা আমার দৃঢ় সংকল্প এবং এই বাসনাই আমার সমস্ত মনোবৃত্তির উপর সতত প্রবল আধিপত্য করিতেছে। আমি জানিতাম, ৫নং আশুতোষ দের লেনে চৌধুরীর বাসা। সেই ৫নং বাটীর মালিক কে তাহা আমি সন্ধান করিলাম। সেই বাটী আমার ভাড়া লইবার আবশ্যক আছে, অতএব তাহা শীঘ্র খালি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। বাড়ীর মালিক বলিলেন যে, বাটীর 'বর্ত্তমান

ভাড়াটিয়া আবার নূতন করিয়া ৬ মাসের এগ্রিমেণ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আগামী আষাঢ় মাসের এ দিকে বাটী খালি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তখন মোটে অগ্রহায়ণ মাস। সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া, মুক্তকেশীর মৃত্যুসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ জানাইব স্বীকার করিয়াছিলাম। একদিন অবসর বুঝিয়া, আমি তদভিপ্রায়ে রোহিণী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম। ঘটনা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আভ্যন্তরিক বৃত্তান্তের কিয়দংশ তাঁহাকে জানাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া, অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু বলিতে হইল। এই সাক্ষাতে যাহা ঘটিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ হেতু, মুক্তকেশীর পিতৃনিরূপণ বিষয়ে, সত্বরবান হইতে আমার ইচ্ছা হইল।

আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনোরমার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলাম এবং তদনন্তর তাঁহারই নাম করিয়া দীনবন্ধু বাবুকে এক পত্র লিখিলাম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হরিমতি স্বামীর ঘরে আসিবার পূর্ব্বে, এই দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে সতত যাতায়াত করিত এবং কখন কখন সেখানে থাকিত। মনোরমার জবানী এই পত্র লিখিত হইল এবং কয়েকটি পারিবারিক তথ্য নিরূপণ এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইল। দীনবন্ধু বাবু

তখনও বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ, তথাপি একবার লিখিয়া দেখা গেল।

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল এবং তাহা হইতে যে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, কৃষ্ণসরোবরের রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের সহিত দীনবন্ধু বাবুর কখন পরিচয় ছিল না এবং তিনি কখন দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে পদার্পণ করেন নাই। আনন্দধামের ৺ প্রিয়প্রসাদ রায়ের সহিত দীনবন্ধু বাবুর বিশেষ বন্ধুতা ছিল এবং তিনি সতত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। পুরাতন পত্রাদি দেখিয়া দীনবন্ধু বাবু নিঃসংশয়িত রূপে বলিতে সক্ষম, যে, ১২২৬ সালের ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তিন মাস কাল প্রিয়প্রসাদ বাবু দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে ছিলেন। তাহার পর তিনি চলিয়া যান এবং অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার বিবাহ হয়।

মোটামুটি দেখিলে এ সকল সংবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু মনোরমা ও আমি সুক্ষ্মরূপে অন্যান্য বৃত্তান্তের সহিত ঐক্য করিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইলাম, তাহা আমাদের মনে অকাট্য বলিয়া বোধ হইল।

ইহা আমরা জানি যে ১২২৬ সালে হরিমতি সতত দীনবন্ধু বাবুর বাটীতে যাওয়া আসা করিত এবং সেই সময়েই প্রিয়প্রসাদ বাবুও সেই স্থানে ছিলেন। লীলার সহিত মুক্তকেশীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সমতার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন এবং লীলা যে আকৃতি বিষয়ে মাতৃ অনুরূপা নহেন—

পিতার অনুরূপ তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রিয়প্রসাদ বাবু অতিশয় রূপবান এবং অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ ছিলেন। সুতরাং এরূপ স্থলে কিরূপ মীমাংসা সঙ্গত তাহা বলা অনাবশ্যক।

হরিমতির পত্রও এস্থলে আমাদের মীমাংসার সহায়তা করিল। সে নিষ্প্রয়োজনে তাহার লিখিত পত্র মধ্যে, বরদেশ্বরী দেবীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছে যে, তাঁহার "চেহারা অতি সাধারণ ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।" তীব্র গায়ের জ্বালা ভিন্ন সে পত্রে এরূপ কথা লিখিবার কোন দরকার ছিল না। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, বরদেশ্বরী দেবীর উপর হরিমতির বিরক্ত হইবার অবশ্যই কোন কারণ ছিল। সে কারণ কি তাহা অনুমান করা অতি সহজ।

এস্থলে বরদেশ্বরী দেবীর নাম উত্থাপিত হওয়ায়, সহজেই মনে মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, আনন্দধামে মুক্তকেশীকে দেখিয়া, সে কাহার সন্তান তদ্বিষয়ে বরদেশ্বরী দেবীর মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল কি? না। বরদেশ্বরী দেবী তাঁহার স্বামীর বিদেশাবস্থান কালে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহার কোন কোন অংশ মনোরমা আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতে মুক্তকেশীর কথা বিশেষরূপে লিখিত আছে সত্য, কিন্তু স্বতঃ সঞ্জাত স্নেহ ও কৌতূহল ভিন্ন, সেই লেখার অন্য উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। হরিমতি, চরিত্রের এই দারুণ কলঙ্ক প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত, যেরূপ

যত্নবতী ছিল তাহাতে অপর ব্যক্তির এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভাবিত নহে। স্বয়ং প্রিয়প্রসাদ রায়ই মুক্তকেশীকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতেন এমন বোধ হয় না।

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে হইল, পিতা-মাতার পাপে সন্তানেরা দুঃখ পায়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই কথা অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইতেছে। লীলা ও মুক্তকেশী উভয়েই নিরীহ ও নিষ্পাপ। কিন্তু উভয়কেই অকারণ কত কষ্টই সহ্য করিতে হইল!

আপাততঃ মুক্তকেশীর প্রসঙ্গের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গেল। যে মূর্ত্তি প্রথম দর্শনাবধি নিরন্তর আমাকে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গালোচনার এই স্থলেই সমাপ্তি হইল। সে যেরূপ অলক্ষিত ভাবে আমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছিল, সেইরূপ অলক্ষিত ভাবেই কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরও চারি মাস অতীত হইল। ফাল্গুন মাস আসিল—সুখময় বসন্ত দেখা দিল। আমাদের জীবন-প্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে, মন্থর গতিতে এ কয় মাস প্রবাহিত হইল। লীলা এখন সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ, সম্পূর্ণরূপ প্রফুল্ল, সম্পূর্ণরূপ ক্রীড়াময় ও সম্পূর্ণরূপ আনন্দময়। কে বলিবে যে এই কোমল লতিকার উপর

দিয়া সেই প্রবল ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে? সে সকল দুর্দ্দিব অতীতের অনন্তসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আমাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে তাহার কোনই পরিচয় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন লীলাকে দেখিয়া, কাহারও মনে সেই আনন্দধামের প্রফুল্লতাময়ী, উৎফুল্লাননা লীলাবতী ভিন্ন আর কিছুই উদিত হইতে পারে না। এখন মনোরমাকে দেখিয়াও সেই বুদ্ধিমতী, চতুরা, সুস্থকায়া সুন্দরী ভিন্ন আর কিছুই মনে পড়িতে পারে না। কে বলিবে যে আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া অতি ভয়ানক দেড়বৎসর পরিমিত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে?

লীলার জীবনাগত, একমাত্র বিষয়ের যাবতীয় স্মৃতি তাঁহার মানসপট হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটী পরিত্যাগ করার পর হইতে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পার্শ্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকাল পর্য্যন্ত, কোন ঘটনার একবর্ণও তিনি স্মরণ করিতে অক্ষম। নানা কৌশলে আমি তৎসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁহার স্মরণ-পথে পুনরুদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকার্য্য হই নাই।

ধীরে ধীরে এবং অলক্ষিত রূপে আনন্দধামের পূর্ব্বভাব সমূহ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। লীলাকে না দেখিলে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমার সম্মুখে লীলার কেমন লজ্জা হয় এবং বদনকমল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তিনি বদন নত করেন। আমি তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যদি অন্বেষণ করি, তাহা হইলে সাক্ষাৎ হইবা-

মাত্র সে কাজ আমি ভুলিয়া যাই এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হই। তাঁহাকে দেখিলে আমার হৃদয় বিকম্পিত হয়। ক্রমে এমন হইল যে, মনোরমা সমক্ষে না থাকিলে, আমরা কোন কথাই কহিতে অক্ষম হইলাম। আমি সেই সামান্য দীনহীন শিক্ষক—লীলা সেই সুখ-সেবিতা স্বর্গ-কন্যা! এরূপ পার্থক্য স্থলে—এরূপ অসমক্ষেত্রে বিবাহের আশা করা অসঙ্গত। আমি লীলার পাণিগ্রহণার্থী, এ কল্পনাও বাতুলতা বলিয়া আমি অবসন্ন হইতাম। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রমে কাজকর্ম্মে আমার অতিশয় শৈথিল্য ঘটিল।

এদিকে লীলারও সতত চিন্তাকুল অবস্থা। কোথায় বা লেখাপড়া—কোথায় বা কবিতা রচনা। সেই প্রফুল্লাননা লীলা নিয়ত উন্মনা ও বিষণ্ণা হইয়া উঠিলেন। মনোরমা আমাদের উভয়েরই এইরূপ চিন্তাকুল ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি লীলাকে একদিন একথা জিজ্ঞাসিলেন। লীলা বিষাদের হাসি হাসিয়া সকল কথা উড়াইয়া দিলেন।

আমরা কেহই কাহাকে কোন কথা বলিতে পারি না। উভয়ের মনই বহুবিধ ভাবের উত্তেজনায় কাতর, কিন্তু উভয়েই নীরব। একদিন—একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, ভগবান সহসা আমাদের হৃদয়বল সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে পরম সুখী করিলেন।

লীলা তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে পুস্তকাদি লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন; সহসা আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। এতই সাবধানে ও নিঃশব্দে আমি লীলার নিক-

টস্থ হইলাম যে, লীলা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। লীলা নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে কলম লইয়া লিখিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে লীলার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়ালাম। তথাপি লীলা কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন না! তিনি প্রবন্ধ লিখিতেছেন—কি বিষয়ে? 'নির্ব্বাক প্রেম।' কাগজের মাথায় শিরোনাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের আর কিছুই লেখা হয় নাই। একছত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর, আমি বলিলাম,—"লীলা! তোমার প্রবন্ধের বিষয়টি বড়ই সুন্দর।"

লীলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। দারুণ লজ্জায় তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল। লোচনযুগল নত হইয়া পড়িল; তিনি বলিলেন,—"তুমি এখানে আসিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছ? কই আমি তো কিছুই জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম,—"আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি। তা হউক, তোমার প্রবন্ধের বিষয়টি বড় ভাল। তুমি শিরোনাম লিখিয়াছ কিন্তু আর কিছুই লিখিয়া উঠিতে পার নাই। আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানি; তোমাকে তাহা বলিয়া শুনাই। তাহা হইলে তোমার প্রবন্ধ লেখার সুবিধা হইবে।"

লীলা অধোমুখে বলিলেন,—"না। আমি প্রবন্ধ লিখিব না।"

আমি বলিলাম,—"প্রবন্ধ লেখ, বা নাই লেখ কথাগুলি শুনিয়া রাখা ভাল। একদা ঘটনাক্রমে এক অতি

সামান্য দীনহীন ব্যক্তি এক সুন্দরী-শিরোমণি, সুখ-সৌভাগ্য-শালিনী রাজকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়। সেই অভাগা দরিদ্র এরূপ দেবদুর্ল্লভ অমূল্য সম্পত্তি-লাভের জন্য লোলুপ হইলেও, সে কদাপি আপন পদ, অবস্থা ও সামর্থ্যের কথা বিস্মৃত হয় নাই। সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া চন্দ্রলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কাহাকে সে কথা সে বুঝিতে দেয় নাই। যে ভূলোক-ললামভূতা গুণবতীর জন্য তাহার হৃদয় এতাদৃশ উন্মত্ত হইয়াছিল তাঁহাকে লাভ করা তাহার মত হতভাগার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে, তাহা সে জানিত। সেই স্বর্গ-কন্যা তাহার ন্যায় জঘন্য জীবের প্রেমের প্রতিদান করিবেন, ইহাও সে কখন প্রত্যাশা করিত না। তথাপি সে সেই সুন্দরীকে ভাল বাসিত। কিরূপ সে ভালবাসা? সে ভালবাসার জন্য সে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত; হৃদয়ের হৃদয়ে সেই সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, স্নেহ, ভক্তি, মায়া প্রভৃতি কুসুমরাশি দিয়া তাঁহার চরণার্চ্চনা করিয়া সে সুখী; সেই সুন্দরীর কোন সেবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে, অযাচিত ভাবে, তাহা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ। কিন্তু যে প্রেমে তাহাকে জীবন দিতেছে ও তাহার জীবন লইতেছে, যাহার সতেজ শিখায় তাহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে, যে প্রেমের তীব্র জ্বালায় সে অধীর হইয়া রহিয়াছে, সে প্রেমের বার্ত্তা ইহ সংসারে কাহার সমক্ষে সে কদাপি ব্যক্ত করে নাই। যিনি এই সুপবিত্র প্রণয়ের আধার, যে স্বর্গ-কন্যা এই সুদৃঢ় প্রণয়ের লক্ষ্যস্থল, তাঁহাকেও কদাপি সে এ প্রণয়ের কথা বুঝিতে দেয় নাই।

তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক প্রেম। বল সুন্দরি! তাহার প্রতি করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত না করা সে সুন্দরী শিরোমণির কি উচিত কার্য্য হইয়াছে? সে ঘৃণিত হউক, সে সামান্য হউক, সে অধম হউক, কিন্তু সে যথার্থ প্রেমিক। তাহাকে উপেক্ষা করা কি সে সুন্দরীর উচিত ব্যবস্থা হইয়াছে?"

সেই দিন—সেই মুহুর্ত্তে—সেই শুভক্ষণে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম কি? দেখিলাম, লীলাবতী সুন্দরীর সেই কুসুম-সুকুমার গণ্ডস্থল বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু সমূহ দরদরিত ধারায় ঝরিত হইতেছে। আমি সাদরে, সাগ্রহে তাঁহার হস্তধারণ করিলাম। তিনি অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু সেই দেবতা—সেই মহাপুরুষ—সেই আরাধ্যতম বড় মিথ্যাবাদী! সেই মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনী বালা তাঁহার জন্য কত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তিনি একদিনও তাহার বিচার করেন নাই, সেই অভাগিনী কিরূপ ব্যাকুলভাবে কালাতিপাত করিয়াছে তাহা মনে করেন নাই। সে দীনহীনা। তাহার তুচ্ছ প্রেমের কথা সেই স্বর্গ-দেবতাকে সে একদিনও জানাইতে সাহস করে নাই; উপেক্ষার ভয়ে সেই অভাগিনী কদাপি সেই গুণময়ের সমীপে স্বীয় প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারই যথার্থ নির্ব্বাক প্রেম। বল দেবতা! তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত না করা সে মহাপুরুষের কি উচিত কার্য্য হইয়াছে?"

আমি তখনই উভয় বাহু দ্বারা সেই সুখ-সেবিতা সুন্দ-

রীকে আলিঙ্গন করিলাম এবং বারবার প্রীতি পরিপূরিত পবিত্র চুম্বন পরাম্পরায় অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম! তখন পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাকে চিরসুখী করিবার নিমিত্ত সেই সুন্দরী-শিরোমণিকে আমি অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"এই দুঃখিনী, তোমার অযোগ্যা হইলেও. তোমা রই দাসী। দাসীকে চরণসেবায় বঞ্চিত করিও না।"

আমি তখনই মনোরমার সমীপস্থ হইলাম এবং লীলা সহিত আমার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন.—"ভাই দেবেন্! যে দিন আনন্দধামের সরসী-সন্নিহিত সৌধ-মধ্যে তোমাকে.এই প্রেম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; যে দিন অমানুষী ধৈর্য্য ও অত্যদ্ভুত বিবেচনা সহকারে তুমি আমার নিতান্ত কঠোর উপদেশের বশবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিয়াছিলে, সেই দিনের কথা আজি মনে পড়িতেছে। যে যে প্রতিবন্ধক তৎকালে তোমার অতুলনীয় প্রেমের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ঈশ্বরের অপরিসীম করুণাবলে তৎসমস্তের যাব-তীয় নিদর্শন অধুনা বিদূরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সোদরাধিক স্নেহাস্পদ দেবেন্দ্র! তোমার নিকট অপরি-শোধনীয় কৃতজ্ঞতাজালে আমি বদ্ধ। সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারি এরূপ সাধ্য ইহজগতে এ অভাগিনীর নাই। আমার জীবনের জীবন, সমস্ত সুখের কেন্দ্র, একমাত্র আনন্দবর্দ্ধিকা লীলাকে তোমার

রক্ষণশীল হস্তে সমর্পণ করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করা আমার পরম সৌভাগ্য। অতএব ভাই! সত্বর এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা কর। আর কি বলিব ?"

আমি বলিলাম,—"দেবি, আমরা যেরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে জীবনপাত করিতেছি, তাহাতে কোনরূপ উৎসব সহকারে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব। তুমিই আমাদের মঙ্গলময়ী। তুমি আশীর্ব্বাদ সহকারে আমার হস্তে পাত্রী সম্প্রদান করিলে আমি চরিতার্থ হইব। লীলার যে আর বিবাহ হইয়াছিল তাহা আমার কদাপি মনে হয় না। আমার মনে হয়, লীলা আমারই এবং আমি লীলারই ; আমাদের আজীবন এই সম্বন্ধ। বস্তুতই লীলার সে বিবাহ, বিবাহ নামের নিতান্ত অযোগ্য। যদি দারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়া না রাখিত, যদি সেই দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিদ্বয়কে দণ্ডিত করিবার দৃঢ় সংকল্প আমার মনে না থাকিত, যদি সফলতার সুবিমল চিত্র প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে সেই অতীত ভ্রান্তির কথা, সেই লীলার দুর্ব্বিসহ অতীত যাতনার কথা, কদাচ আমাদের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হইত না।"

মনোরমা বলিলেন,—"আজি তোমার কথা শুনিয়া ভাই, এতদিনের সমস্ত অন্তরতাপ নিবারিত হইল। তুমি লীলার সহায়, আশ্রয় ও রক্ষক। সেই লীলা তোমারই হইবে, ইহার অপেক্ষা শুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে? লীলা এখন সম্পত্তিহীনা, আশ্রয়হীনা, আত্মীয়হীনা। এখনও

এই লীলার প্রতি তোমার অনুগ্রহের লাঘব হয় নাই, ইহা পরম সৌভাগ্য।"

আমি বলিলাম,—"দিদি, সম্পত্তিতে আমার কি প্রয়োজন? আমি লীলার সম্পত্তি দেখিয়া কদাপি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই নাই; সুতরাং আজি তাঁহার সম্পত্তি নাই বলিয়াও কাতর নহি। লীলা সমস্ত বসুধার অধিশ্বরীই হউন, বা কপর্দ্দক বিহীনা ভিখারিণীই হউন; অগণ্য হিতৈষী মিত্রমণ্ডলীতে তিনি পরিবৃত থাকুন, বা সংসার সমুদ্রে একাকিনী ভাসিতে থাকুন, আমার চক্ষে তিনি চিরপ্রেমময়ী—চির আদরিণী। তাঁহার যেরূপ দশা-বিপর্য্যয় কেন ঘটুক না, এ অধম তাঁহার চিরদিন মুগ্ধ স্তাবক ও অনুগত প্রেমিক। তবে দিদি, তবে তাঁহার সম্পত্তি, আশ্রয় বা আত্মীয় অনুসন্ধান করিবার আমার প্রয়োজন কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"তোমার এতাদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগের বিষয় আমি বেশ জানি। কিন্তু লীলার এই অবস্থা কি চিরস্থায়ী হইবে? ধন-সম্পত্তি আবাসাদি সকলই থাকিতে, অভাগিনী কি চিরদিনই অপরিচিত ভাবেই কালাতিপাত করিবে? তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারে সে কি চিরবঞ্চিত থাকিবে?"

আমি বলিলাম,—"না, কখনই না। আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেখ মনোরমা; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, লীলার এ অবস্থা আমি কদাপি থাকিতে দিব না। কিন্তু আইনের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন ও বহুকাল অপেক্ষা করা আবশ্যক। আমরা

উভয়েই অশক্ত। আশু উদ্দেশ্য সাধনের আর কোনই উপায় দেখিতেছি না। লীলা পূর্ব্বের ন্যায় লাবণ্যময়ী ও শোভাময়ী হইয়াছেন। এখন হয়ত প্রজাগণ ও দাসদাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং তাঁহার হস্তাক্ষর মিলাইয়া, হয়ত অপর লোকেও তাঁহার স্বরূপত্ব স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু সেই হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকাপ্রসাদ রায় এইরূপ প্রমাণ সমূহ চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন কি? সে সম্বন্ধে আমার কোনই আশা নাই। তিনি যদি গ্রাহ্য না করেন তাহা হইলে সকল উদ্যমই বৃথা। তাঁহার প্রতীতি জন্মাইতে হইলে আরও গুরুতর প্রমাণের প্রয়োজন হইবে। লীলার কৃষ্ণসরোবরের প্রাসাদ পরিত্যাগ ও মুক্তকেশীর মৃত্যু এই দুই ঘটনার তারিখের কখনই সমতা নাই। মুক্তকেশীর মৃত্যুর তারিখ আমরা জানি, কিন্তু লীলার কৃষ্ণসরোবর ত্যাগের তারিখ আমরা জানি না এবং বহু সন্ধানেও এপর্য্যন্ত তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। আর কেহই তাহা মনে করিয়া না রাখিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী, যে ব্যক্তি এই চক্রান্তে লিপ্ত, সে আপনার পাপের পূর্ণ কাহিনী অবশ্যই মনে করিয়া রাখিয়াছে। আর কেহই জানুক আর নাই জানুক, চৌধুরী যে নিশ্চয় সে তারিখ মনে করিয়া রাখিয়াছে তাহার সংশয় নাই। একবার সমুচিত সুযোগ মতে, আমি তাহাকে আয়ত্তগত করিব, তাহার পর অন্য বিচার।"

মনোরমার সহিত তাহার পর বিবাহ সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। বিবাহ কিরূপ প্রণালীতে হইবে, ঘটা কিছু

হইবে কি না, আমোদ আহ্লাদ কিছু হইবে কি না, কি কি লাগিবে ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। একেতো আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাহাতে আমাদের অধুনা অজ্ঞাতবাস। এরূপ স্থলে কোন লোক নিমন্ত্রণ করিয়া ঘটাঘটি করা সঙ্গত ও সম্ভব নহে। তথাপি কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই জানিয়া আমার চিরসুহৃদ্ রমেশ বাবুকে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা স্থির হইল। তিনিই আমাদের বরযাত্র ও কন্যাযাত্র দুইই। অন্যান্য ব্যবস্থার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

দশ দিন পরে, বিধাতার অনুগ্রহে, আমরা অপরিসীম সুখের অধিকারী হইলাম—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর কাল-স্রোত আমাদের পক্ষে যেন অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে নববর্ষ সমাগত হইল এবং প্রথম মাসও অতীত হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস গতপ্রায়। আষাঢ় মাসে চৌধুরীর বাসার মেয়াদ ফুরাইবে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। যদি পুনরায় সে মেয়াদ বাড়াইয়া, নূতন করিয়া এগ্রিমেণ্ট করে, তাহা হইলে সে আমার হাতে থাকিল এবং তাহাকে যখন খুসি আমি করতলগত করিতে পারিব। কিন্তু সে-যদি আর মেয়াদ না বাড়াইয়া

এখনই চলিয়া যায়, তাহা হইলে তো সকল আশাই ফুরাইবে, সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইবে। যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হইয়াছে—আর এক মুহূর্ত্তও এখন নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

আমার বিবাহের পর কখন কখন আমার মনে হইয়াছে, যাহা আমার জীবনের সকল সুখের মূল, যে দেবদুর্লভ সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমি লালায়িত ছিলাম এবং যখন তাহা বিধাতার অনুগ্রহে, আমার হইয়াছে; তখন আমার সুখ ও সন্তোষের কিছুই বাকী নাই। তখন কেন আমি সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হই? হয়ত তাহাতে আমাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন হইতে হইবে এবং হয়ত আমাদের এই বহু যত্নার্জ্জিত স্বর্গীয় সুখ বিধ্বংসিত হইবে। এতদিন পরে, যেন আমার হৃদয় একটু অবসন্ন হইল। মধুময় প্রেমের মধুর স্বর আমাকে যেন কঠোর কর্ত্তব্য পন্থা হইতে বিচলিত করিল। অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেম এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। সেই অমৃতময়ী লীলার অপার্থিব প্রেমই অচিরে অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল।

এক রাত্রিতে লীলা শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন; আমি পার্শ্বে বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার নিদ্রিত লাবণ্যরাশি সন্দর্শন করিতেছি। বুঝিলাম, সুন্দরী স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিলাম, নবীনার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। শুনিলাম, তাঁহার বদন হইতে কয়টি অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। কি সে শব্দ? 'দিদি কোথায়? না, আমি যাইব না!' আর কি বলিতে হইবে যে লীলা এখন কৃষ্ণসরোবর হইতে যাত্রার পরাগত ঘটনার স্বপ্ন দেখিতে-

ছেন? সেই অশ্রু, সেই যাতনার অব্যক্ত ধ্বনি তখনই আমার শিরায় শিরায় অগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমি পরদিন দশ-গুণ বলে বলীয়ান হইয়া, নবোৎসাহে কার্য্য-সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

চৌধুরীর বিষয়ে আগে যতদূর সম্ভব জানা চাই। এ পর্য্যন্ত তাহার জীবন আমার পক্ষে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। মনোরমার উত্তেজনায়, রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয় যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং যাহা এই আখ্যায়িকার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কোন কথা নাই। রোহিণী ঠাকু-রাণীর সহিত নানা প্রতারণা করিয়া, চৌধুরী মুক্তকেশীকে কলিকাতায় আনিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহা ধরিয়া চৌধু-রীকে বিপন্ন করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তবে কি করি? মনোরমার দিনলিপির মধ্যে এক স্থানে চৌধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া যে স্থলে তিনি তাহার ইতিহাস জানিতে উৎ-সুক হইয়াছেন তথায় লিখিয়াছেন, "চৌধুরী মহাশয় স্বীয়, নিবাস ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক, জানিনা ইহার কারণ কি। কিন্তু স্বীয় নগরের লোক কোথায় কে আছে তাহা জানিতে এবং তাহাদের সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যেদিন প্রথমে আসিয়া পৌঁছিলেন সে দিন আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, গ্রাম সন্নিধানে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না। সতত নানা দূরদেশ হইতে অনেক মোহরাঙ্কিত পত্র তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে ইহা

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনে অবশ্যই কোন রহস্য আছে। সে রহস্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়।"

দেশে যায় না কেন? দেশের লোকের সন্ধান করেই বা কেন? নিশ্চয়ই সে দেশের লোকের ভয় করিয়া চলে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার ঘটিতে পারে, যাহাতে এহেন দুর্দ্দান্ত লোককেও দেশের লোকের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়? অবশ্যই কোন গুরুতর কাণ্ড আছে। কিন্তু কি সে কাণ্ড? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে সে সন্ধান বলিতে পারে?

চিত্তের এইরূপ অনিশ্চিত ও অস্থির অবস্থায় মনে করিলাম, প্রিয় বন্ধু রমেশের বাড়ী তো পূর্ব্ব-বঙ্গে। ভাল তাঁহাকেই কেন একবার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক না।

এইরূপ স্থির করিয়া মনে করিলাম, রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে, চৌধুরী লোকটী কেমন ও তাঁহার রীতি প্রকৃতি কিরূপ তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া অবধারণ করা আবশ্যক। এই বিবেচনায় আমি সেই দিন বেলা ৩টা কি ৪টার সময় আশুতোষ দের লেনে গমন করিলাম। মনে করিলাম, কিয়ৎকাল সন্নিহিত কোন স্থানে গোপন ভাবে অপেক্ষা করিলে, অবশ্যই চৌধুরীকে দেখিতে পাইব। অবশ্যই কোন না কোন কার্য্যানুরোধে সে একবারও বাটীর বাহির হইবে। আমাকে দেখিতে পাইলেও চৌধুরী যে আমাকে চিনিতে পারিবে এমন আশঙ্কা আমি করি না; কারণ একদিন রাত্রিকালে, লুক্কায়িত ভাবে আমার অনুসরণ করিবার সময়ে, সে আমাকে দেখিয়াছে। বাটীর পার্শ্ব দিয়া আমি

বারম্বার যাতায়াত করিলাম। বাহিরে আসা দূরে থাকুক, কেহ একটা জানালাও খুলিল না। অনেকক্ষণ পরে নীচের তালায় একটা জানালা খুলিয়া গেল। কোন লোককেই দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল। সে স্বর মনোরমার দিনলিপি পাঠ করিয়া আমার পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম, সেই রুক্ষগম্ভীর চাপা আওয়াজে শব্দ হইতেছে, "এস এস, আমার সব সোণার যাদু। এস, আমার আঙ্গুলের উপর বইস সোণামণি! বাহবা। তুইবড় দুষ্ট। তুই কথা শুনিস্ না কেন বেটা? যাও সব, এক—দুই—তিন। বাহবা।" বুঝিলাম এই সেই চৌধুরী ইঁদুর লইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণ-সরোবরে যেমন, এখন এখানেও তেমনি। আবার কিয়ৎকাল সকলই নিস্তব্ধ। বহুক্ষণ পরে বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী বাহিরে আসিল। সে ধীরে ধীরে রাস্তায় পড়িয়া উত্তর মুখে চলিল এবং ক্রমে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে পড়িল। আমিও ধীরে ধীরে একটু তফাতে থাকিয়া, তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

লোকটার স্থূলতা ও আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মনোরমার লিখিত যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি তাহা ঠিক মিলিল। কিন্তু লোকটার এই যাটি বৎসর বয়সে এরূপ আশ্চর্য্য সজীবতা, প্রফুল্লতা এবং চত্বারিংশ বর্ষাপেক্ষা অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। অপূর্ব্ব কোমলতার সহিত, বদনমণ্ডলে অতি মধুর মৃদুহাস্য মাখাইয়া, চতুর্দ্দিকে সস্নেহ ও সানুরাগ দৃষ্টি বিক্ষেপ

করিতে করিতে এবং হস্তের প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে অতি সহজভাবে চলিতে লাগিল। যদি কোন অপরিচিত লোককে কেহ বলিত, এই ব্যক্তি কলিকাতার মালিক, তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া সে লোক কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। সে একবারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। সম্ভবতঃ সে আমাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে ক্রমে হেদোর ধারে পৌঁছিল। তথা হইতে বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক দোকান হইতে একখানি পাঁউরুটি ক্রয় করিল। নিকটে আস্তাবলে একটা বানর বাঁধা ছিল, তাহার নিকটস্থ হইয়া সস্নেহে বলিল,—"আহা বেটা! তোমাকে সারাদিন বাঁধিয়া রাখে—কিছু খাইতে দেয় না। তোমার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে? নেও বেটা, আমি রুটিখানি দিতেছি, খাও তুমি।"

সে বানরকে রুটি খাওয়াইয়া আস্তাবলের বাহিরে আসিবামাত্র একটি ভিক্ষুক, তিন দিন খাওয়া হয় নাই বলিয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। সে হস্তস্থিত যষ্টি দেখাইয়া তাহার প্রতি আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিল। ভিক্ষুক অগত্যা সরিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে আমরা বেঙ্গল থিয়েটার পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। রঙ্গভূমির দ্বারদেশে প্রকাণ্ড এক বিজ্ঞাপন ঝুলান রহিয়াছে। চৌধুরী অনেকক্ষণ তাহা দেখিল এবং সহাস্যমুখে টিকিট ঘরের নিকটে আসিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষের ও অন্যান্য কোন কোন লোকের

সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমি সংবাদপত্র সংস্পৃষ্ট লোক বলিয়া তাঁহারা আমাকে জানিতেন। আমি তাঁহাদের নিকট দুইখানি টিকিটের প্রার্থনা করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ সহকারে আমাকে দুই খানি টিকিট প্রদান করিলেন। আমি স্থির করিলাম, রমেশ বাবু ও আমি আজি রাত্রে অভিনয় দেখিতে আসিব। চৌধুরীকে রমেশ চেনেন কি না, তাহা সেই সুযোগে জানিতে পারা যাইবে।

আমি ফিরিবার সময় রমেশের বাসা দিয়া আসিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহাকে থিয়েটরে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়া আসিলাম। আমি নিজ আবাস হইতে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া পুনরায় রমেশ বাবুর বাসায় চলিলাম। দেখিলাম তিনি অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম,—"চল ভাই।"

তিনি বলিলেন,—"তা আর বলিতে ?"

আমরা দুই জনে লোকতঃ অভিনয় দর্শনার্থ, ধর্ম্মতঃ চৌধুরী দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা যখন থিয়েটরে আসিলাম তখন কনসার্ট বাজনা প্রায় শেষ হইয়াছে; অভিনয় আরম্ভ হয় হয় হইয়াছে

সকল লোকই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমা-দিগকে গিয়া ষ্টলে এক পাশে দাঁড়াইতে হইল। আমরা যে জন্য আসিয়াছি, এরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার কোন হানি নাই। চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চৌধুরীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার বিরাট দেহ ফুলাইয়া ড্রেসসারকেলে বসিয়া আছেন। শ্রোতৃবৃন্দের যে কেহ একবার তাঁহাকে দৈবাৎ দেখিতেছে, সেই মধ্যে মধ্যে নয়ন ফিরাইয়া, সেই সুকান্তি, সুঘটিত-অবয়ব, সুপরিচ্ছদধারী, স্থূলাঙ্গ, পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-তেছে। আমি সরিয়া সরিয়া ক্রমে এমন স্থলে দাঁড়াইলাম যে তাহাকে দেখিতে রমেশের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। কি জন্য আগ্রহ করিয়া রমেশকে থিয়েটরে আনিয়াছি তাহা কিন্তু তাঁহাকে এখনও বলি নাই।

অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম দৃশ্য হইয়া গেল। চৌধুরী নিবিষ্ট চিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল; একবারও কোন দিকে ফিরিয়া চাহিল না। স্বস্থানে বসিয়া, মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে, মধ্যে মধ্যে আপনার বিরাট মস্তক নাড়িতে নাড়িতে, চৌধুরী একমনে যেন থিয়েটর গিলিতে লাগিল। ক্রমশঃ দৃশ্যের পর দৃশ্য অতীত হইয়া প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত হইল। দর্শকেরা চারিদিকে গোলমাল করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। চৌধুরীকে রমেশ জানেন কি না, তাহা অবধারণ করিবার এই সুযোগ। আমি এতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রমেশ! দেখ দেখি, তুমি ঐ লোকটিকে চেন কি?"

আমি চৌধুরীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। চৌধুরী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। থিয়েটরের কনসার্ট বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। বলিলাম,—"ঐ যে মোটা লম্বা লোকটা দাঁড়াইয়া আছে! দেখিতে পাই-তেছ না?"

রমেশ বলিলেন,—"দেখিতেছি বটে; কিন্তু উহাঁকে আমি কখন দেখি নাই। কেন বল দেখি? লোকটা কি খুব বিখ্যাত বড়লোক? উহাকে কেন দেখাইতেছ?"

আমি বলিলাম,—"উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানা আমার অতিশয় দরকার। তোমাদের দেশেই উহার বাড়ী। উহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী। এ নামটাও কখন শুন নাই কি?"

"না ভাই, লোকটাকেও কখন দেখি নাই; নামটাও কখন শুনি নাই।"

আমি বলিলাম,—"ভাল করিয়া দেখ ভাই। কেন এজন্য আমি এত ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা তোমাকে পরে বলিব। তুমি বুঝি লোকটার সম্মুখ দিক ভাল করিয়া দেখিতে পাই-তেছ না। এই দিকে এস। এখান হইতে ভাল করিয়া দেখ দেখি।"

আমি তাঁহাকে সরাইয়া একটু পাশ পানে লইয়া আসি-লাম। সেখানে তখন রমেশ ও আমি ছাড়া আর কোন লোক নাই। কেবল আমাদের নিকটেই আর একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আমাদের ব্যবহার দর্শন করিতে-ছিলেন। তাঁহার আকার বড় কৃশ, খুব গৌরবর্ণ, বাম গালে একটা কাটা দাগ। সম্ভবতঃ আমাদের কথাবার্ত্তা

তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে এবং সেইজন্য হয় ত তাঁহারও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক রমেশ খুব মনোযোগ সহকারে চৌধুরীর সেই হাস্যময় বদন কিয়ৎকাল দর্শন করিয়া বলিলেন,—"না ভাই, আমি ঐ মোটা লোকটাকে কখন কোথাও দেখি নাই।"

এই সময়ে চৌধুরী একবার নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রমেশের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিল। আমি তখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম, রমেশ চৌধুরীকে না চিনিলেও, চৌধুরী রমেশকে বিলক্ষণ চিনেন। সুধুই চিনেন না—বিলক্ষণ ভয় করেন। রমেশকে দেখার পর সেই নরাধমের মুখের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহা দেখিয়া কখনই ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। রং যেন শাক হইয়া গেল, মুখের সে সহাস্য ভাব যেন কোথায় উড়িয়া গেল, সেই চঞ্চল, আমোদময় লোক যেন পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া গেল। ফলতঃ রমেশকে দেখিয়া নিরতিশয় ভয়ে, চৌধুরীর অন্তরাত্মা যে অভিভূত হইয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই!

সেই গণ্ডদেশে চিহ্নযুক্ত কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। রমেশকে দেখিয়া চৌধুরীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার মনেও যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, স্পষ্টই বোধ হইল, তাঁহারও সেইরূপ ধারণা হইয়াছে। লোকটি কিন্তু বড়ই ভদ্র-প্রকৃতি। তিনি আমাদের কাণ্ড সমস্তই দর্শন করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু ঐ ব্যাপারে আমা-

দের সহিত যোগ দিবার জন্য কোন প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। চৌধুরীর এবম্বিধ অবস্থান্তর এবং ঘটনার এতাদৃশ অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দর্শনে, আমি এতই বিচলিত হইয়াছিলাম যে, কিয়ৎকাল কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। এমন সময়ে রমেশ বলিলেন,—"ওঃ! ঐ মোটা লোকটা কিরূপ ভাবে দেখিতেছে দেখ। আমাকেই দেখিতেছে কি? আমি কি খুব বড়লোক নাকি? আমি উহাকে চিনি না; লোকটা আমাকে চিনিল কিরূপে?"

আমি চৌধুরীর দিকে নজর রাখিলাম। চৌধুরীও ক্রমাগত রমেশের দিকে চাহিয়া থাকিল। রমেশ অন্য দিকে মনঃসংযোগ করিলেন, সেই দেখিল রমেশ অন্য দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই চৌধুরী সরিতে আরম্ভ করিল এবং অল্প কালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি রমেশের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া তাঁহাকে দরজার দিকে টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশ আমার রকম দেখিয়া অবাক হইতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও আমাদের আগেই, ভিড় ঠেলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহির হইতে তখন দলে দলে লোক ভিতরে ফিরিয়া আসিতেছে, তজ্জন্য আমাদের শীঘ্র যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। আমরা যখন বাহিরে আসিলাম তখন চৌধুরী বা সেই কৃশকায় লোক, দুজনকেই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি রমেশ বাবুকে বলিলাম,—"চল ভাই বাসায় ফিরিয়া চল। আর থিয়েটার

দেখিয়া কাজ নাই। তোমার সঙ্গে আমার ভয়ানক দরকারী কথা আছে।"

রমেশ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

আমি কথার দ্বারা কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলাম। রমেশকে চৌধুরী চিনিতে পারিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরিত হইবার অভিপ্রায়ে, পলাতক হইয়াছে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি সে এই ভয়ে এখন এককালে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করে তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! অতএব আর এক মুহূর্ত্ত-কালও নষ্ট করা অবিধেয়। আরও আমার মনে হইল, সেই কৃশকায় ব্যক্তিও অবশ্যই কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চৌধুরীর অশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। কি জানি সেই বা কি বিঘ্ন ঘটায়। এই দুই প্রকার সন্দেহে আমি নিতান্তই চলচিত্ত হইলাম এবং যেই আমি রমেশের গৃহ মধ্যস্থ হইলাম, সেই তাঁহাকে আমার মনোগত সমস্ত অভিপ্রায় না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া রমেশ বলিলেন,—"তা ভাই, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সাহায্য করিতে পারি? যখন লোকটাকে আমি মোটেই চিনি না, তখন উহাকে জব্দ করার আমি কি উপায় করিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—"তুমি চেন বা নাই চেন, ও ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমাকে চেনে এবং তোমারই ভয়ে সে থিয়েটার হইতে পলাইয়াছে। তবেই দেখ রমেশ, ইহার মধ্যে অব-

শুই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। তুমি তোমার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত সমস্ত স্মরণ করিয়া দেখ। তোমার স্বদেশাতিবাহিত জীবনের প্রত্যেক ঘটনা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। কোন লোক তোমার ভয়ে চিরদিন ভীত থাকিতে পারে, এমন কোন ঘটনা মনে পড়ে কি না একবার ভাবিয়া দেখ।"

সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার কথা শুনিয়া রমেশের অতিশয় ভাবান্তর হইল। তাঁহাকে দেখিয়া চৌধুরীর যেরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া তাঁহারও সেইরূপ ভাবান্তর হইল। তাঁহার মুখ চোখ সাদা হইয়া গেল এবং তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"অতি ভয়ানক কথা! অতি ভয়ানক! কিন্তু ঐ ব্যক্তিই কি সেই ব্যক্তি? অসম্ভব। তবে কি?"

আমি তাঁহাকে ব্যাকুল চিত্ত দেখিয়া বলিলাম,—"ভাই, আমার কথায় যদি তোমার কোন মনস্তাপের কারণ উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া তোমার নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই, ঐ চৌধুরীর দুর্ব্যবহারে আমার স্ত্রীকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছে। যদি ঐ ব্যক্তিকে কোনরূপে আয়ত্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমার স্ত্রীর সেই কষ্ট নিবারিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমি আমার সেই দুঃখিতা পত্নীর জন্য, তোমাকে এরূপ ক্লিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি তোমার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বলিয়া, বিদায়প্রার্থী হইয়া, আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ আমার হাত ধরিয়া আমাকে বসাইয়া বলিলেন,—"তোমার কথায় আমার আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে তোমার কোনই দোষ নাই। আমার অতীত জীবনে এক ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং সেই জন্য আমি অদ্যাপি স্বদেশে যাই নাই। তোমার কথায় আজি আমার সেই অতীত ঘটনা আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। তাহাতেই আমি বিচলিত হইয়াছি। তুমি সে জন্য কিছু মনে করিও না ভাই।"

আমি বলিলাম,—"সেই অতীত ঘটনার সহিত ঐ ব্যক্তির কোন প্রকার সংশ্রব ছিল কি? ও কেন তোমাকে দেখিয়া এরূপ ভীত হইল?"

রমেশ বলিলেন,—"সেই অতীত ঘটনার সহিত একাধিক ব্যক্তির সংশ্রব ছিল। দুই ব্যক্তির গুরুতর সংশ্রব ছিল। আমি সেই দুই ব্যক্তির একজন। অপর জন কোথায় আছে, ইহসংসারে আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে ব্যক্তির আকৃতি আমি ইহজীবনে কদাচ ভুলিব না, মরণান্তেও ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ! আমাকে দেখিলে সে ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, সাক্ষাৎ যমদূত বোধে অতিশয় ভীত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি থিয়েটারে যে ব্যক্তিকে দেখাইলে, তাহার সহিত আমার কথিত ব্যক্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। ও ব্যক্তি কখনই সে ব্যক্তি নহে।"

আমি বলিলাম,—"ভাবিয়া দেখ রমেশ, কাল সন্ধ্যাকালে

মনুষ্যের কতই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যে কৃশ থাকে, সে স্থূল হইতে পারে। যাহার দাড়ি গোঁপ ছিল, সে হয়ত তাহা কামাইতে পারে। মাথায় ছোট ছোট চুলের স্থলে বড় বড় চুল হইতে পারে। এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে।"

রমেশ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে সত্য! যদিই এস্থলে তাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। কারণ ও ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তির কথা মনেও পড়িতেছে না।"

আমি বলিলাম,—"ভাই! যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেই অতীত বৃত্তান্ত জানিতে দিলে, আমি একবার সমস্ত ব্যাপার স্বয়ং বুঝিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিতাম।"

রমেশ বলিলেন,—"আপত্তি—তোমার নিকট সে বিষয় বলিবার কোন আপত্তি নাই। তোমাকে সে কথা কখন বলি নাই ইহা আমার বড়ই অন্যায়। কিন্তু সে কথা বড়ই দুঃখজনক; তাহা আমার হৃদয়কে চিরকালের জন্য ক্ষত বিক্ষত করিয়া রাখিয়াছে। বিহিত যত্নে তাহা ভুলিতে চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এতকাল নিরন্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তথাপি তাহার এক বর্ণও ভুলিতে পারি নাই। নিতান্ত কষ্টজনক হইলেও, তোমাকে তাহা আজি বলিব। আমার জীবন কিরূপ কষ্টময়—কিরূপ, যন্ত্রণা আমি সতত ভোড় করি তুমি তাহা আজি বুঝিতে

পারিবে। কিন্তু সে কাহিনী শুনিয়া তোমার উপস্থিত ব্যাপারের কোন উপকার হইবে এরূপ আমার মনে হয় না। তথাপি আমি তোমাকে সকল কথাই জানাইব।”

এই বলিয়া রমেশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত উৎকন্ঠিত ভাবে প্রকোষ্ঠমধ্যে পবিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সহসা গৃহের দ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া, আমার নিকটস্থ হইলেন এবং পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ভাই দেবেন্দ্র, তোমাকে সহোদরাধিক ভাল বাসিয়া থাকি, এ কথা আজি নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে যে ঋণে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কোনকালে তাহা পরিশোধ করা আমার সাধ্য নহে। তোমার ন্যায় বন্ধুর নিকট আমার এ বিজাতীয় মনস্তাপের বিবরণ এতদিন প্রচ্ছন্ন রাখা আমার পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা হয় নাই। এখনই আমি সেই অকৃতজ্ঞতার সংশোধন করিতেছি। কিন্তু ভাই, আমার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকেও আমার ন্যায় কাতর হইতে হইবে এবং তোমার প্রেমময় হৃদয় আমার দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, আমি সমস্ত কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভাই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় আমার এক রূপ-গুণবতী কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। অতি বৃদ্ধ পিতামাতাও ছিলেন। আমার সেই ভগ্নী এবং আমি ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন সন্তান ছিল না। আমাদের সংসার বড় সচ্ছল ছিল না—আমরা দরিদ্র ছিলাম। তথাপি বড় সুখী ছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র

সংসারের সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং দারুণ দুঃখেও আমরা সুখী ছিলাম।

"যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার ভগ্নীর বয়স প্রায় ২০ বৎসর। একটি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। আমার ভগ্নীর রূপ অতুলনীয় ছিল। লোকে দৈবাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার গুণও অলোকসামান্য ছিল। তাঁহার রূপ ও গুণের বিষয় আমাদের প্রদেশে দৃষ্টান্তীভূত হইয়াছিল। আহা! তাঁহার সেই পরম সুন্দর বদনে পরম সুন্দর হাসি, সেই অতি মধুর কথাবার্ত্তা, সেই অতি মনোহর ভাবভঙ্গী মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। হা বিধাতঃ! তুমি কি করিলে। আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেলে!"

রমেশের চক্ষু জলভারাকুল হইল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক থাকিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"সেই সুশীলা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমাদের সকলেরই পরম স্নেহের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহার অপার্থিব গুণরাশি ও অতুলনীয় রূপরাশি উভয়ই তাঁহাকে আমাদের সকলের নয়ন-পুত্তলি করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের ভবন সন্নিধানে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সেই রঘুনাথের সহিত আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঘুনাথ কলিকাতায় থাকিত; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বেশ খোষ পোষাকী বাবু ছিল। সে কখন কখন বাটী আসিত

এবং বাটী আসিয়া আমাদের বাটীতে বড় বেশী সময় অতি-বাহিত করিত। আমার সহিত অত্যধিক আত্মীয়তা তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ মনে করিয়া, আমরা কোনই সন্দেহ করিতাম না। আমি বাটী না থাকিলেও, রঘুনাথ আমাদের বাটীতে থাকিত। আমার জননীর সহিত সে কখন কলি-কাতার কথা কহিত, আমার জনকের সহিত কখন সে ধর্ম্মকথা কহিত, আমার ভগ্নীর সহিত কখন সে নানাদেশের কথা কহিত। কখন কখন সে আমাদের বাটীতে আহারও করিত। আমার ভগ্নীর প্রতি তাহার অতিশয় যত্ন দেখা যাইত। সে প্রতিনিয়ত অতি সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার সামগ্রী আমার ভগ্নীকে প্রদান করিত। সে সকল সামগ্রী আমা-দের দেশে সচরাচর পাওয়া যাইত না। কিন্তু এই প্রকার যত্ন ও স্নেহ ভিন্ন অন্য কোন কুলক্ষণের পরিচয় আমরা কদাপি জানিতে পারি নাই। ক্রমে সেই দুরাত্মার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। আমার ভগ্নীপতির মুখে একদিন শুনিলাম যে, দুরাত্মা রঘুনাথ আমার ভগ্নীর নিকট প্রেমের প্রস্তাব করিয়াছে। তাঁহাকে অশেষবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, কুলটা হইবার পরামর্শ দিয়াছে এবং তাহার নিকট ধর্ম্ম বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছে। আমার বন্ধু হইয়া আমার এইরূপ সর্ব্বনাশের চেষ্টা! এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল এবং সে পুনরায় আমাদের গৃহাগত হইলেই, বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া, তাহাকে তাড়া-ইয়া দিতে আমার বাসনা হইল। কিন্তু আমার ভগ্নীপতির পরামর্শক্রমে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া, তাহাকে এক পত্র

দ্বারা জানাইলাম যে, সে যেন আর কদাপি আমাদের বাটীতে না আইসে। তাহার সহিত সর্ব্ব প্রকার আত্মীয়তা অদ্য হইতে শেষ হইয়া গেল। হতভাগা এ পত্রের কোন উত্তর দিল না। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, সে হয়ত আপনার কদর্য্য ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার লজ্জা। কোথায় বা তাহার ঘৃণা। সে যে মনে মনে আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করিবার মন্ত্রণা করিতেছিল, তাহা আমরা কিছুই ভাবি নাই।

একদিন দ্বিপ্রহর কালে আমার ভগ্নী প্রয়োজনানুবোধে আমাদের গ্রাম্য সরোবরে গমন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী আমাদের বাসবাটী হইতে প্রায় আধ পোয়া পথ দূরে অবস্থিত। আমরা দরিদ্র; বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসী। পুরস্ত্রীর এরূপ ভাবে যাতায়াত আমাদের দেশের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বাটী হইতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত লোকালয় ছিল না; কেবল মাঝামাঝি এক স্থানে এক শিবের ঘর ছিল। আমার ভগ্নী যখন পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন এক প্রকাণ্ড ষাঁড় রাগত হইয়া তাঁহাকে তাড়া করে। তিনি প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি সেই দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি দেবালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র নরাধম রঘুনাথও তথায় প্রবেশ করে এবং বলপূর্ব্বক আমার নিষ্পাপ-হৃদয়া সহোদরার অনপনেয় সর্ব্বনাশ সাধন করে।

এদিকে, আমার ভগ্নীর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে

দেখিয়া, আমার চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং আমি তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর মাত্র যাইতে না যাইতে, অতি অস্ফুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল এবং আমি সভয়ে দ্রুতবেগে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম। দেবালয়ের নিকটস্থ হইয়াই আমি জানিতে পারিলাম যে, সেই স্থান হইতেই রোদনধ্বনি বিনির্গত হইতেছে এবং সে কণ্ঠস্বর আমার সহোদরা ভগ্নী ভিন্ন আর কাহারও নহে। আমি মৃতকল্প হইয়া ছুটিতেছি! এমন সময় দেখিলাম, দেবালয়ের দ্বার হইতে এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে বাহিরে আসিল। সেই ব্যক্তি রঘুনাথ। সে আমাকে দর্শনমাত্র বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"যাও, যাও রমেশ, যাহার মুখ দেখিতে চাহ নাই, সে আজি মনের বাসনা মিটাইয়াছে! দেখ গিয়া, ঐ মন্দির-মধ্যে তোমার ধর্ম্ম-ধ্বজা ভগ্নী সতীত্ব-ধন হারাইয়া অধোবদনে পড়িয়া কাঁদিতেছে! আজি আমার মনের কালী দূর হইয়াছে। যাও, তুমি এখন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘরে লইয়া যাও।"

সে পশুপ্রকৃতিক নরাধম যখন এই কথা বলিল, তখন আমার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং আমি যেন বিশ্বসংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। অচিরে বিজাতীয় ক্রোধ আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল এবং আমি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অস্থিরভাবে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। আমার হস্তে কোন অস্ত্র নাই। সে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, উভয় হস্তে আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি তখন নিরুপায় হইয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তের এক স্থানে বিষম

দংশন করিয়া ধরিলাম। তাহার রুধিরে আমার বক্ষস্থল ও বস্ত্র ভাসিয়া গেল, তাহা আমার বেশ মনে আছে। সেও আমার পৃষ্ঠদেশ কামড়াইয়া ধরিল। কিন্তু আমার দংশনে তাহার যেরূপ প্রকাণ্ড এক খণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার দংশনে আমার সেরূপ কিছুই হয় নাই। তথাপি দেবেন্দ্র, আমার দেহে অদ্যাপি সেই ক্ষত চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।"

এই বলিয়া রমেশ গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং আমাকে পৃষ্ঠদেশের সেই চিহ্ন দেখাইলেন।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার আঘাত গুরুতর না হইলেও, যদি এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার বাহুতে বিশেষ চিহ্ন আছে।"

তিনি বলিলেন,—"তাহার কোনই ভুল নাই।"

আমি আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর কি হইল ?"

"তাহার পর সে আমাকে ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। তখন আরও ২। ১ জন লোক সেই স্থানে জমিয়া গেল। তখন আমি অজ্ঞান। ক্রমে খুব গোল হইল। আমার বৃদ্ধ জনক-জননী, আমার ভগ্নীপতি এবং গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোক ও থানাপুলিস সকলই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমার ভগ্নী সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। তাহার পর, কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার পূর্ব্বে, কেহ সাবধান হইবার পূর্ব্বে তত্রত্য এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া তিনি অতিশয় শক্তি সহকারে

আপনার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখনই রুধির-স্রোতে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল এবং অনতিকাল মধ্যে ধীরে ধীরে সেই অপাপবিদ্ধা. সুর-সুন্দরীর পবিত্র কলেবর হইতে প্রাণবায়ু প্রস্থান করিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমেশ পুনরায় কিয়ৎকাল উভয় হস্তে স্বীয় বদনাবৃত করিয়া থাকিলেন। তদনন্তর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অচিরে আমার জনকজননী, দারুণ লজ্জা ও অত্যন্ত মনস্তাপ জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু, স্বর্গধামে গমন করিলেন। আমার ভগ্নীপতি মহাশয় আমার সেই শিশু ভাগিনেয়টিকে লইয়া কোথায় গেলেন, তাহা আমি জানি না। তাঁহারা এখন আছেন কি না বলিতে পারি না। নরাধম রঘুনাথের দুর্ব্বৃত্ততায় আমাদের সোণার সংসার ছাই হইয়া গেল। সেই অবধি আমি দেশত্যাগী। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় আমি আর তাহার পর পূর্ব্বপরিচিত লোকের সমক্ষে মুখ দেখাই না। আমার সে বাসভবনও বোধ করি এতদিনে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাহার পর সে নরাধম রঘুনাথের কি হইল?"

"রঘুনাথের যে কি হইল তাহা আর কেহই বলিতে পারে না। তাহার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য, আমি যে তাহার কতই সন্ধান করিয়াছি তাহা আর কি বলিব। অনাহারে অনিদ্রায় আমি নিরন্তর তাহার সন্ধানে ফিরিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি কখন শুনিয়াছি সে লাহোরে, কখন শুনিয়াছি সে কাশ্মীরে, কখন

শুনিয়াছি সে মান্দ্রাজে আছে। আমি সকল স্থানেই গিয়াছি। কিন্তু কোথায়ও তাহাকে ধরিতে পারি নাই। তাহার নামে গবর্ণমেণ্ট হুলিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই হুলিয়া বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতবর্ষের সকল থানায় প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে তাহার আকৃতির বিশেষ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তে আমার দংশন জনিত ক্ষত চিহ্নেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সকল আশাই বৃথা হইল। ইহজীবনে তাহাকে ধরিবার ও তাহাকে দণ্ডিত করিবার সম্ভাবনা আর নাই।"

এই বলিয়া রমেশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত হইলেন। আমি বলিলাম,—"বস্তুতই রমেশ তোমার কথা শুনিয়া আজি আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলাম। তোমার জীবনের উপর দিয়া এরূপ অতি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে এবং তাহা মথিত ও অবসন্ন করিয়া দিয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন এই লোমহর্ষণ শোকজনক বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিলাম, তখন তোমার সহিত সৌহৃদ্যের অনুরোধে, সেই দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে আমিও বাধ্য। কিন্তু সকল কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া দেখ, আজি যে, চৌধুরীকে নাট্যালয়ে তোমাকে দেখাইলাম, সে ব্যক্তি পূর্ব্বের রঘুনাথ নহে কি?"

রমেশ বলিলেন,—"না না, সে কখনই নহে। রঘুনাথ কৃশকায়, রঘুনাথ শ্যামবর্ণ, রঘুনাথের দাড়ি গোঁপ ছিল। ও ব্যক্তি ভয়ানক স্থূলকায়, গৌরবর্ণ, দাড়ি গোঁপ বিহীন।

এতদিনে রঘুনাথের মাথায় অবশ্যই পাকা চুল দেখা দিত, কিন্তু এ ব্যক্তির সকল চুল কাঁচা।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু ভাই, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি. এ সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। তৎকালে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বয়স ছিল কত তাহা তুমি জান কি ?"

"অনুমান ৩০ বা ৩৫ হইবে।"

"বর্ত্তমান জগদীশনাথ চৌধুরীর বয়স প্রায় ৬০। এ বিষয়ে কোন অনৈক্য দেখা যাইতেছে না। আর মনে করিয়া দেখ, ইহসংসারে তোমাকে দেখিয়া ভীত হইতে পারে এমন লোক কেহ আছে কি ?"

রমেশ বলিলেন,—"না ভাই, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছাড়া আমার ভয়ে ভীত হইতে পারে, এমন লোক সংসারে থাকা অসম্ভব। আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই ; অপর কেহও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। সংসারে আমার মিত্র অনেক আছে, কিন্তু শত্রু কেহই নাই।"

আমি বলিলাম,—"একবার সব বিষয়টা বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। তোমাকে দেখিয়া ভয় পায় বা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করে, এমন ব্যক্তি ইহসংসারে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আর কেহই নাই। যে ব্যক্তিকে থিয়েটারে দেখাইয়াছি সে যে তোমাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিল এবং তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে, অসময়ে থিয়েটার ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তুমি তাহাকে চিনিতে

পার নাই; কিন্তু সে যে তোমাকে চিনিয়াছে তাহারও কোন ভুল নাই। আর আমি ইহা উত্তমরূপ জ্ঞাত আছি যে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক এবং যেখানে যখন থাকে, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক থাকে কি না, অগ্রে তাহার সন্ধান করে। ফলতঃ ভাই, আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সেই পাপী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এখন দুর্দ্দান্ত জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার বর্ত্তমান কার্য্য সমস্ত প্রণিধান করিলেও, উহাকে দুষ্কর্ম্মে চিরাভ্যস্ত বদ্ধ পাপী বলিয়াই বোধ হয়। এই সকল কারণে ঐ ব্যক্তিই যে সেই রঘুনাথ তৎপক্ষে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সমস্তই কালসহকারে এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃশতার পরিবর্ত্তে উহার এখন স্থূলতা হইয়াছে; শ্যামবর্ণের পরিবর্ত্তে গৌরবর্ণ হইয়াছে, শ্মশ্রু ও গুম্ফ তিরোহিত হইয়াছে এবং নামও বিভিন্ন হইয়াছে। তথাপি যে এই ব্যক্তিই সেই দুরাত্মা তাহার কোনই ভুল নাই। এখনি কোন উপায়ে, উহার হাতের জামা তুলিয়া দেখিলে, নিশ্চয়ই উহার বাহুতে তোমার দংশন চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তুমি যাহাই বল ও যে সেই ব্যক্তি তাহাতে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ দেখিতেছি না। তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই, আর ও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, ইহাও কিছু অসম্ভব কাণ্ড নহে। ও ব্যক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু তোমার বিশেষ কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তোমাকে ও সহজেই চিনিয়াছে, অথচ তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। বিশেষতঃ

পাপী ব্যক্তি নিয়তই সশঙ্কিত থাকে এবং স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম ব্যক্ত হইল ভাবিয়া সততই কাতর হয়। সেরূপ ব্যক্তি যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার বিপন্ন হওয়া সম্ভাবিত, তাহাদিগকে যেরূপে মনে করিয়া রাখে, তাহাদের চিত্র হৃদয়পটে যেরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখে অপরে কখনই সেরূপ পারে না। আমার মনে আর কোনই সন্দেহ নাই ভাই। পঁচিশ বৎসরের পর দুরাত্মা রঘুনাথের আজি সন্ধান হইয়াছে। আজি একসঙ্গে তোমার মর্ম্মজ্বালা ও আমার মর্ম্মজ্বালা নিবারণের সুযোগ হইয়াছে। আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নহে। আমি সেই নরাধমের সর্ব্বনাশের পথ আজি রাত্রেই উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। রমেশ বলিলেন,—"তোমার সমস্ত যুক্তি শুনিয়া আমার মনেও ধারণা হইতেছে, ঐ জগদীশনাথ চৌধুরীই সেই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। কিন্তু আকৃতির বড়ই পরিবর্ত্তন। যাহাই হউক, তুমি কি প্রণালীতে আপাততঃ কার্য্য করিবে স্থির করিতেছ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা এখনও আমি স্থির করিতে পারি নাই। সময় এক তিলও নষ্ট করা হইবে না। অবিলম্বে ও এদেশ ছাড়িয়া নিশ্চয়ই পলাতক হইবে। যাহা করিতে হয় আজি রাত্রেই করিব। তোমাকে পরে সকল সংবাদ দিব। এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে আমি রমেশের বাসা হইতে প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিতে আসিতে আমার মনে আরও স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, জগদীশনাথ চৌধুরী নিশ্চয়ই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। সেই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এতকাল পরে রমেশচন্দ্র রায়কে দেখিতে পাইয়াছে এবং নিশ্চয়ই নিদারুণ ভয়ে সে অবসন্ন হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, তাহার যমদূত এতকাল পরে দেখা দিয়াছে এবং অচিরে পলায়ন করিতে না পারিলে তাহার আর ভদ্রস্থতা নাই। সুতরাং যদি নিতান্তই আজি রাত্রে পারিয়া না উঠে, তাহা হইলে কল্য প্রত্যূষে সে পলায়ন করিবে। তাহার বাটীর মেয়াদও ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তখন আমার মনে হইল কালি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে হয়ত সকলই হাত ছাড়া হইয়া যাইবে—হয়ত সে কোথায় পলাইয়া যাইবে তাহার আর সন্ধান করিয়াও উঠিতে পারিব না। অতএব মরি বা বাঁচি, আজি রাত্রেই তাহাকে ধরিতে হইবে।

আমার সেই দুঃখিনী লীলা ঐ নরাধমের চক্রান্তে আজি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন! আজি সমাজে তিনি অপরিচিতা, মানব রাজ্যে তিনি লুক্কায়িতা, অতুল সম্পত্তি থাকিতেও তিনি আজি দীনহীনা। তাঁহার সর্ব্বস্ব দুই পাপিষ্ঠে লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহার একজন নরকে গমন করিয়া আপনার

কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতেছে; অপর ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে পদাবনত করিবার উপায় আজি আমার হস্তগত হইয়াছে। এ লোভ কখন কি সম্বরণ করা যায়?

আমার পরম বন্ধু রমেশ ঐ দুরাত্মার দ্বারা অচিন্তনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, অপরিসীম অপমানিত হইয়াছেন, এবং অবক্তব্য হৃদয়-জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যেরূপ দুশ্ছেদ্য আত্মীয়তা শৃঙ্খলে আমি বদ্ধ, তাহাতে তাঁহার যত মনস্তাপ তৎসমস্তই আমার নিজ মনস্তাপের সমতুল্য বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ পিশাচকে একবার ধরিতে পারিলেই তাহারও প্রতিফল দিতে পারিব। এ লোভ কখন কি সম্বরণ করা যায়? কপালে যাহা থাকে হইবে, আজি রাত্রেই আমি ঐ নরাধমের সম্মুখীন হইব।

বিপদের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি ফল? যত বিপদই কেন হউক না, যখন তাহার সম্মুখীন হইবই সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন ভাবিয়া আর কি ফল? তথাপি একবার ভাবিয়া দেখা ভাল এবং যদি কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে তাহাও বিবেচনা করা উচিত। সে পিশাচ যখন বুঝিবে যে, আমাকে নিপাত করিলে আপাততঃ তাহার সকল বিপদের শান্তি হইবে, তখন সে কখনই তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না। সে তখনই আমাকে ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইবে। কিয়ৎ-পরিমাণে এই বিপদ লাঘব করিবার নিমিত্ত, আমার মনে এক অভিসন্ধি উদিত হইল। যদি আমি রমেশকে

এক পত্র লিখিয়া রাখি এবং একটা নিয়মিত সময়ের পরে, আমার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ না পাইলে, তাঁহাকে সেই পত্র খুলিতে অনুরোধ করি ; যদি তাহার পর রমেশের পূর্ণ নাম স্বাক্ষরযুক্ত, ঐ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারসূচক এক রসিদ গ্রহণ করি এবং সেই রসিদ সঙ্গে রাখিয়া যদি চৌধুরীকে তাহা দেখাই, তাহা হইলে তাহার মনে হইতে পারে যে, কেবল আমাকে নিপাত করিলেই তাহার নিস্তার নাই। তাহার অন্য প্রবল শত্রুও তাহার সর্ব্বনাশ সাধনার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এ অভিসন্ধি আমার মনে বড়ই ভাল বলিয়া বোধ হইল। আমি ব্যস্ততাসহ বাসায় আসিলাম এবং নিঃশব্দে, আমার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া এই পত্র লিখিলাম ঃ—

"ভাই রমেশ! তোমাকে থিয়েটারে যে লোকটীকে দেখিয়াছিলাম সেই ব্যক্তিই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। এখন তাহার নাম জগদীশনাথ চৌধুরী হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সে ৫ নং আশুতোষ দের গলিতে অবস্থিতি করে। অবিলম্বে তাহাকে পুলিষে ধরাইয়া দিবে। আমি তাহাকে ধরিতে আসিয়া প্রাণ হারাইয়াছি। আর কি লিখিব ?—অভিন্ন দেবেন্দ্র।"

এই পত্র এক খামের মধ্যে পুরিয়া, বেশ করিয়া গালার মোহর দিয়া আঁটিলাম, এবং খামের উপর লিখিলাম, "কল্য প্রাতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত এই পত্র খুলিও না। তদনন্তর ইহা খুলিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিও। আপাততঃ এতৎসহ যে রসিদ পাঠাইলাম তাহাতে সম্পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবে।" তাহার পর সেই খামসমেত পত্র আর একখানি বৃহত্তর

খামের মধ্যে পূরিয়া, তাহাতেও মোহর লাগাইলাম। আমার মনে স্থির প্রতীতি হইল যে যদিই আমি আজি চৌধুরীর হাতে মরি, তাহা হইলে তাহারও আর নিস্তার নাই। রমেশ যদি সন্ধান পান যে ঐ ব্যক্তিই সেই রঘুনাথ, তাহা হইলে সে, রমেশের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিলেও, পুলিষের হাতে কদাপি নিস্তার পাইবে না। তাহা হইলে কল্য তাহার সকল বিদ্যাই বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি দণ্ডিত হইতে হইবে। সে যেরূপ বুদ্ধিমান লোক তাহাতে, আমার এরূপ সাবধানতা দেখিয়া, সে সকলই বুঝিতে পারিবে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহাকে অনেক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

তখন মনে হইল, এ পত্র রমেশের কাছে পাঠাই কিরূপে? নীচে নামিলাম। সেখানকার দোকান ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। আমি দোকানদারকে সমস্ত কথা বলিলে, সে বলিল যে, তাহার ছেলে খুব হুঁসিয়ার। তাহাকে জল খাইবার জন্য চারিটা পয়সা দিলে, সে এখনই চিঠি দিয়া আসিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহাকে ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে, সে পত্র লইয়া গেল। শীঘ্র কার্য্য সমাপ্তির অনুরোধে তাহাকে যাতায়াতের গাড়িভাড়া করিয়া দিলাম এবং ফিরিয়া আসার পর, আমার অন্য দরকার আছে বলিয়া সেই, গাড়িকে রাখিয়া দিতে বলিলাম। এখন রমেশের স্বাক্ষর যুক্ত রসিদ খানি পাইলেই নিশ্চিন্ত হই।

যদিই আজি আমার জীবন যায়, তাহা হইলে আমার কাগজপত্রের জন্য কোন গোল উপস্থিত না হয়, এই বিবে-

চনায়, আমি পুনরায় নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত কাগজ ও চিঠি প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিলাম। সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া, মনোরমাকে এক খানি পত্র লিখিলাম এবং সেই পত্রসহ বাকস দেরাজ প্রভৃতির চাবিগুলি রাখিয়া একটি গালা মোহরাঙ্কিত প্যাকেটের মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং সেই পুলিন্দাটি আমার দেরাজের উপরেই রাখিয়া দিলাম। তদনন্তর লীলা ও মনোরমা, আমার অপেক্ষায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আছেন মনে করিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলাম। এতক্ষণ পরে, সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কালে, আমার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। যদিই আজি চৌধুরীর হস্তে আমার জীবলীলার অবসান হয়, তাহা হইলে এই সাক্ষাতই তাঁহাদের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি বিচলিত হইলাম। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের বলে তখনই সে ভাব আমি দমন করিয়া ফেলিলাম।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে লীলা নাই, কেবল মনোরমা একাকিনী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তিনি আমাকে দর্শন মাত্র বলিলেন,—"এত সকালে ফিরিলে যে? শেষ পর্য্যন্ত ছিলেনা বুঝি?"

আমি বলিলাম,—"রমেশ ও আমি কেহই শেষ পর্য্যন্ত থাকিলাম না। লীলা কোথায়?"

"তাহার মাথা ধরিয়াছে; এজন্য আমি জেদ করিয়া তাহাকে সকালে ঘুম পাড়াইয়াছি।"

লীলা নিদ্রিত হইয়াছেন কি না দেখিবার নিমিত্ত, আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বুদ্ধিমতী মনো-

রমা আমার মুখের ভাব ও কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন যে, আমি অদ্য নিশ্চয়ই একটা কোন কঠোর ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছি। সেই জন্য তিনি সাতিশয় কৌতূহলপূর্ণ নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আমি আমাদের শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া ধীরে ধীরে শয্যার নিকটস্থ হইলাম এবং মশারি সরাইয়া দেখিলাম, আমার পত্নী নিদ্রার সুকোমল আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিতেছেন। সেই সুকুমারকায়া নবীনার সহিত আমার এখনও একমাস বিবাহ হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ জীবন মরণ বিধায়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে মনে করিয়া, এতক্ষণে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যদি এই উদ্যমে আমার প্রাণান্ত ঘটে, তাহা হইলে লীলাকে এই দেখাই আমার শেষ দেখা। আমার বিকল হৃদয়কে বলীয়ান করিবার নিমিত্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম এবং মঙ্গলময়ের কৃপায় সকলই মঙ্গলময় হইবে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। দ্বার সন্নিহিত হওয়ার পর পুনরায় সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজল নয়নে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"দয়াময়! আমার প্রাণের প্রাণ, অভাগার সর্ব্বস্ব ঐ পাপ-সংস্পর্শ বিহীনা নবীনাকে তোমারই চিরকল্যাণময়, চরণাশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। অনাথনাথ! সকল যাতনাই সহজ ও সহনীয়। কিন্তু ঐ প্রেম-পুত্তলীর কষ্টের কল্পনাও

অসহনীয়। অতএব দীনবন্ধো! ঐ সরলা যেন কোনপ্রকার কষ্ট না পায়, ইহাই এ দীনহীনের একমাত্র প্রার্থনা।" আমি আর অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

লীলা নিদ্রিত না থাকিলে, হয়ত আমি এরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কখনই আসিতে পারিতাম না। ধন্য জগদীশ্বর! দেখিলাম বাহিরে মনোরমা একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দর্শনমাত্র তিনি বলিলেন,—"দোকানদারের ছেলে এই কাগজটুকু আমাকে দিয়া গিয়াছে। আর বলিতে বলিয়াছে যে, তোমার জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ ঠিক কথা; আমি এখনই আবার বাহিরে যাইব।" এই বলিয়া আমি সেই কাগজখণ্ডে যাহা লিখিত ছিল তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল;—"তোমার পত্র পাইলাম। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তোমাকে আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে পত্র খুলিয়া পাঠ করিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব। অভিন্ন শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।"

আমি সেই কাগজখণ্ড আমার পকেট বহির মধ্যে স্থাপিত করিলাম এবং অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পা বাড়াইলাম। তখন মনোরমা দ্রুত আসিয়া উভয় হস্তে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। এবং বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি, আজি রাত্রেই তুমি শেষ চেষ্টা করিবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেষ্টা আজিই করিব।"

"কিন্তু দেবেন্দ্র, একাকী যাইও না, আমি মিনতি করিতেছি, একাকী যাইও না! আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমি স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইতে অমত করিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাইবই যাইব। আমি বাহিরে গাড়ির মধ্যে বসিয়া থাকিব।"

এই বলিয়া সেই স্নেহশীলা কামিনী আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি উভয় হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম,—"না দেবি, এবিষয়ে তোমার সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। এরূপ কার্য্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য হওয়া সম্ভব নহে। আমার সঙ্গে না যাইয়া বাড়ীতে আমার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা তোমার পক্ষে কত আবশ্যক তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি লীলাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে আমার অনেক সাহায্য হইবে এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব।"

তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে এবং পুনরায় আমার গতি রোধ করিবার পূর্ব্বে, আমি সবেগে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ গাড়িতে উঠিয়া কোচম্যানকে ঠিকানা বলিয়া দিলাম। আর বলিয়া দিলাম,—"যদি দশ মিনিটের মধ্যে যাইতে পার তাহা হইলে দুনা ভাড়া।"

তখন রাত্রি ১১টা। এত গভীর রাত্রে মানুষ কখনই মানুষের সহিত দেখা করে না। যদি সে দেখা না করে? জোর করিয়া দেখা করিব। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য

না হই, তাহার দ্বারে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিব। সে যে ত্বরায় পলায়ন করিবে তাহাতে কোন ভুল নাই। সে যখন বাটীর বাহির হইবে, আমি তখনই তাহাকে ধরিব।

মোড়ে গাড়ি থামাইয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। তাহার পর চৌধুরীর বাসার দিকে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। যখন আমি বাটীর নিকটস্থ হইলাম, তখন সেই পথে, বিপরীত দিক হইতে, আর একটি লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। লোকটি নিকটস্থ হইলে চিনিতে পারিলাম, তিনি সেই গণ্ডদেশে চিহ্নযুক্ত যুবক। আমার বোধ হইল তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথাই বলিলেন না। আমি ৫নং বাটীর দরজায় থামিলাম। তিনি কিন্তু সোজা চলিয়া গেলেন। ইনি কি দৈবাৎ এ পথে আসিয়া পড়িয়াছেন, না থিয়েটর হইতে চৌধুরীর অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? যাহা হউক, তাহা আর এখন ভাবিবার দরকার নাই। সেই কৃশকায় যুবা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, আমি দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলাম। চৌধুরীর লোক ইচ্ছা করিলে, কর্ত্তা নিদ্রিত হইয়াছেন বলিয়া, আমাকে তাড়াইতে পারে। দেখি কি হয়।

একটা দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসিল, আমার কি দরকার। আমি তাহাকে আমার কার্ড দিয়া বলিয়া দিলাম যে,—"বড় গুরুতর দরকার বলিয়াই এত রাত্রে এবং এরূপ অসময়ে তোমার বাবুকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি এই কথা বলিয়া তাঁহাকে এই

কাগজ খানি দিলে আমার বড় উপকার হইবে। এই কাগজে আমার নাম লেখা আছে।”

সে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, মুনিবের নিকট আমার সংবাদ লইয়া যাইতে রাজি হইল। কিন্তু যাইবার সময় বেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গেল। সুতরাং আমি পথেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অতি অল্পকাল মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, এবং বলিল যে, তাহার মুনিব আমাকে নমস্কার জানাইয়া, আমার কি দরকার জানিতে চাহিতেছেন। আমি বলিলাম,—“তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বল গিয়া যে, আমার দরকার অন্য কাহারও নিকট বলিবার নহে।”

সে আবার দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল—আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিল। তখনই আমি চৌধুরীর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নীচে আলো ছিল না। মাগীটা একটা কেরাসীনের ঠোঙ্গা আনিল; তাহারই ক্ষীণ আলোকে আমি সিঁড়ি দেখিয়া চলিতে লাগিলাম। যখন সিঁড়িতে উঠি তখন দেখিতে পাইলাম, বারেন্দা হইতে একটী স্ত্রীলোক একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি আমার প্রতি অত্যুগ্র

দৃষ্টিপাত করিলেন। মনোরমার দিনলিপিতে আমি যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তাহার সহিত ঐক্য করিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইল, ইনিই সেই রঙ্গমতী ঠাকুরাণী। আমি উপরে উঠিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ জগদীশনাথ চৌধুরীর সম্মুখীন হইলাম।

দেখিলাম ঘরের চারি দিকে বাক্স, ব্যাগ, কাপড়, চোপড় ছড়ান রহিয়াছে। চৌধুরী একটা ব্যাগের মধ্যে জিনিষ পত্র গুছাইতেছে। আর দেখিলাম, তাহার সেই ইঁদুরের খাঁচা সম্মুখস্থ টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপিত আছে। কাকাতুয়া ও মনুয়া কোথায় আছে, দেখিতে পাইলাম না। চৌধুরী চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে একখানি দেরাজযুক্ত টেবিল। ঘরে আরও ৩।৪ খানি চেয়ার পড়িয়া আছে। এক দিকে এক খানি খাট রহিয়াছে। আমাকে দর্শনমাত্র চৌধুরী, "আসুন মহাশয়, বসুন," বলিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল।

বৈকালে চৌধুরীকে যেরূপ প্রফুল্ল ও সজীব দেখিয়াছিলাম, এখন সেরূপ নাই। নাট্যশালায় যে দারুণ ভীতি তাহাকে অবসন্ন করিয়াছিল, তাহা এখনও তাহাকে অধিকার করিয়া আছে। সে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"আপনি আমার নিকট বিশেষ দরকারে আসিয়াছেন; কিন্তু আমার নিকট আপনার কি দরকার হইতে পারে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল থিয়েটরে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। রমেশকে

দেখিয়া সে এতই বিচলিত হইয়াছিল যে, অন্য কিছু দেখিবার ও ভাবিবার তাহার সময় ছিল না। ইহা আমার পক্ষে শুভ বলিতে হইবে। কারণ আমাকে রমেশের সঙ্গে দেখিলে সে সহজেই বুঝিতে পারিত যে, আমি তাহার সমস্ত অতীত দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং সে হয়ত আমার সহিত দেখাই করিত না এবং দেখা করিলেও হয়ত অতি সাবধানতার সহিত কথা কহিত।

আমি বলিলাম,—"আজি রাত্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। দেখিতেছি, আপনি স্থানান্তরে যাই-বার উদ্যোগে আছেন।"

"আমার স্থানান্তর গমনের সহিত আপনার দরকারের কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

"কিছু আছে বই কি?"

"কি সম্বন্ধ আছে বলুন। আমি কোথায় যাইতেছি আপনি জানেন কি?"

"না। কিন্তু কেন আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমি জানি।"

তৎক্ষণাৎ তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ঘরের একমাত্র দরজায় একটা তালা লাগাইয়া আসিলেন। তাহার পর সেই চাবিটা পকেটে ফেলিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও, আমরা উভয়েই উভয়কে বিলক্ষণ জানি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে আপনি কি একবারও ভাবেন নাই যে, আমার সহিত এলোমেলো ভাবে কথা কহিবার মত সহজ লোক আমি নহি?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার সহিত এলো-মেলো কথা কহিতে আসি নাই। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। যে দ্বার আপনি রুদ্ধ করিয়া আসিলেন, তাহা খোলা থাকিলেও, আপনার কোন রূপ অসদ্ব্যবহার হেতু, আমি তন্মধ্য দিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতাম না এবং যতক্ষণ কার্য্য শেষ না হয় ততক্ষণও করিব না।"

চৌধুরী টেবিলের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া আমার মুখের দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার হস্তের ভারে টেবিল কাঁপিয়া উঠিল এবং তদুপরিস্থ পিঞ্জরাবদ্ধ ইন্দুর সকল রং করা তারের ফাক দিয়া উকি দিতে লাগিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসিল,—"আপনার অভিপ্রায় কি?"

"শুনিলাম আপনি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই শেষ সময়ে আপনার নিকট হইতে কয়েকটি কথা জানিয়া লইতে চাহি এবং আপনাকে কয়েকটি কথা জানাইয়া দিতে চাহি।"

তাহার প্রশস্ত ললাট দিয়া ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। সে টেবিলের দেরাজে হাত দিল এবং তাহার চাবি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল,—"আমি কেন কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা আপনি তবে জানেন। বলুন দেখি কৃপা করিয়া কেন।"

আমি বলিলাম,—"আমি তাহা বলিতেও পারি, এবং তাহার প্রমাণও দেখাইতে পারি।"

"ভাল, একে একে হউক। আগে বলুন।"

আমি গম্ভীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলাম,—"আপনি রমেশচন্দ্র রায় নামক এক ভদ্রলোকের ভয়ে পলাতক হইতেছেন।"

সেই নরাধমই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। কারণ সে থিয়েটরে রমেশকে দেখিয়া যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, আবার আমার মুখে রমেশের নাম শুনিয়া অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। সে দেরাজের ভিতর হইতে একটা ভারী পদার্থ টানিয়া বাহির করিতেছে বোধ হইল। তখনই সে এক বারুদ পোরা, ঠিক করা, ছনলা পিস্তল বাহির করিল। আমি বুঝিলাম আমার জীবন একটু সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলিতেছে। আমি বলিলাম,—"আরও এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। দেখুন আপনার দরজা রুদ্ধ এবং আমি নিরস্ত্র। তথাপি আমি একটুও বিচলিত হই-তেছি না এবং একটুও নড়িবার চেষ্টা করিতেছি না। আর দুইটা কথা শুনুন।"

"আপনি যথেষ্ট বলিয়াছেন, আর শুনিতে চাহি না। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমি এখন কি ভাবিতেছি ?"

"বোধ হয় পারিতেছি।"

"আমি ভাবিতেছি, নানারূপ সামগ্রী চতুর্দ্দিকে পড়িয়া থাকায়, ঘরটা বড় বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার আপনার মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়াইব কি না, তাই ভাবিতেছি।"

আমি বলিলাম,—"আগে এই কাগজটুকু পড়ুন দেখি,

তাহার পর যাহা হয় করিবেন। মনে করিবেন না যে, আমাকে নিপাত করিলেই আপনার-বিপদের শেষ হইবে।"

আমি পকেট বহি হইতে কাগজ খণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে পড়িতে দিলাম। সে উচ্চ স্বরে সেই কয় ছত্র পাঠ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সাবধানতার ব্যবস্থা বুঝিতে পারিল। তখনই সে পুনরায় দেরাজের মধ্যে পিস্তল রাখিয়া দিয়া বলিল,—"দেখুন দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপাততঃ পিস্তল রাখিয়া দিলাম বটে, কিন্তু আমি যে উহা আর বাহির করিয়া আপনার মগজ উড়াইয়া দিব না, ইহা আপনি যেন মনে করিবেন না। আমি নিরপেক্ষ লোক, পরম শত্রুর সম্বন্ধেও আমি সুবিচার করিতে পরাঙ্মুখ নহি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার মগজ ঘাসে বোঝাই নহে; তাহাতে সার আছে। সে কথা যাউক, এখন কাজের কথা—"

আমি বলিলাম,—"কাজের কথা হইবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আপনি যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা আমি জানি। জগদীশনাথ চৌধুরী যে আপনার প্রকৃত নাম নহে তাহাও আমি জানি। আপনার দক্ষিণ হস্তে রমেশ বাবুর দাঁতের দাগ যে এখনও বিদ্যমান আছে তাহাও আমি জানি।"

দেখিলাম তাহার বদনমণ্ডল ঘোর উৎকণ্ঠা কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। বলিল,—"এ সকল মিথ্যা কুৎসিৎ কথা যে আপনাকে জানাইয়াছে সে আমার পরম শত্রু; এ জন্য যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহা শীঘ্রই করিব। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা

করিতেছি, ঐ কাগজ খণ্ডে যে ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়াছে সে কে?"

আমি বলিলাম,—"তিনি রমেশচন্দ্র রায়। আপনি যখন রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তখন তিনি আপনার পরম বন্ধু ছিলেন। আপনি তাঁহার ভগ্নীর সতীত্ব নাশ করিয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে চিনিয়াছেন কি?"

আবার সে দেরাজের মধ্যে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ক্ষান্ত হইয়া আবার বলিল,—"আপনার পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে বন্ধুকে কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়াছেন?"

"কালি প্রাতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত।"

"বুঝিয়াছি, আপনি বেশ বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যদি খুব যত্ন সহকারে উদ্যোগী হইয়া যাত্রা করি, তাহা হইলেও যে বেলা ৯টার আগে কলিকাতা হইতে বাহির হইতে পারিব এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কথার পূর্ব্বে ইহা স্থির থাকা আবশ্যক যে, যতক্ষণ আপনি আপনার বন্ধুকে লিখিত পত্র আমার নিকট ফিরাইয়া আনিয়া না দিবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। এক্ষণে বলুন আপনার কি জিজ্ঞাস্য।"

আমি বলিলাম,—"তাহা আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি, আমি কাহার স্বার্থের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি?"

সে বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের স্বার্থ।"

আমি বলিলাম,—"তাহা বলিলে ঠিক কথা হয় না। আমার স্ত্রীর স্বার্থ।"

তখনই যেন তাহার চক্ষে আমি অন্যরূপ লোক হইয়া পড়িলাম। আমাকে আর বিপজ্জনক বলিয়া তাহার বোধ থাকিল না। সে আমার মুখের দিকে, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এককালে দেরাজ বন্ধ করিয়া ফেলিল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন যে, গত কয়েক মাস নিরন্তর যত্নে আমি এ সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাতে কোন সত্য কথা আমার সমক্ষে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আপনি এক অতি কুৎসিৎ চক্রান্তের প্রধান অভিনেতা। নির্ব্বিবাদে এক লক্ষ টাকা লাভ করাই আপনার তাদৃশ অতি নিন্দনীয় চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

চৌধুরী কিছু জবাব করিলেন না; কিন্তু তাহার বদন অতিশয় চিন্তা মেঘাচ্ছন্ন হইল।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"আপনার আর্থিক লাভ আপনি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে থাকুন, আমি তাহা পুনর্গ্রহণের প্রার্থী নহি।" তাহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত হইল। আমি বলিতে লাগিলাম,—"যে ধর্ম্ম বিগর্হিত, ঘোর দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে এই হৃদয় হীন—"

সে আমাকে বাধা দিয়া বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, আপনি

কি এখানে নৈতিক উপদেশ শুনাইতে আসিয়াছেন? তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে উপদেশ আপনি বন্ধ করিয়া রাখুন; আমার তাহাতে কোনই প্রয়োজন নাই। সময় বিশেষে তাহা আপনার অন্যান্য আত্মীয়ের উপকারে আসিতে পারে. অতএব এখন এখানে তাহা অপব্যয় করিবেন না। আপনি কি চান তাই বলুন।"

আমি বলিলাম,—"প্রথমতঃ, আমার সমক্ষে, আপনার স্বহস্ত লিখিত, এই ব্যাপারের একটা সম্পূর্ণ স্বীকার পত্র আমি চাহি।"

সে তাহার একটা স্থূল অঙ্গুলি উন্নত করিয়া বলিল,—"এক দফা। তার পর?"

আমি বলিলাম,—"আমার স্ত্রী যে দিন কৃষ্ণ সরোবরের ভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন, সে দিন কোন্ তারিখ তৎসম্বন্ধে আপনার, সমর্থনোক্তি ভিন্ন, অন্য কোন অকাট্য ও সহজ প্রমাণ চাহি। ইহাই আমার দ্বিতীয় দাওয়া।"

সে বলিল,—"দেখিতেছি যে জায়গায় গলদ আছে, আপনি সেইখানটাই ধরিয়াছেন। তার পর?"

"আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।"

"বেশ! আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার কথা শুনুন। মোটের উপর বিবেচনা করিলে আপনি যাহাকে কৃপা করিয়া কুৎসিৎ চক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত স্বীকার করার অপেক্ষা, এই স্থানে আপনার দেহ-পিঞ্জর হইতে

প্রাণ-পক্ষী উড়াইয়া দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী। এক্ষণে আপনি যদি আমার প্রস্তাবে স্বীকার হন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবমত সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে আমি সম্মত আছি। আপনি যেরূপ বর্ণনা চাহেন আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি, যে প্রমাণ আপনি চাহেন তাহাও আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আমার পরলোকগত বন্ধু তাঁহার স্ত্রীর কলিকাতা যাত্রা সম্বন্ধে, দিন, তারিখ, ঘণ্টা সমস্ত ঠিক করিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি না বলুন? আমি আপনাকে সে পত্র দিতে পারি। আর রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার জন্য যে আড়গোড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহার ঠিকানা আপনাকে বলিয়া দিতে পারি। সেখানকার অর্ডর বহিতে নিশ্চয়ই আপনি তারিখ জানিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ কোচম্যান বা নহিনও মনে করিয়া কোন কোন কথা বলিলেও বলিতে পারে। অপনি যদি আমার সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এ সকলই আমি করিতে সম্মত আছি। শুনুন আমার সর্ত্ত কি? ১ম সর্ত্ত। আমি ও আমার স্ত্রী, যখন যেরূপে হউক, এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আপনি, কিম্বা আপনার বন্ধু কোনরূপে তাহার প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে পারিবেন না। ২য় সর্ত্ত। কালি প্রাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম-চারী না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আমার নিকটে থাকিতে হইবে। তাহার পর, আপনার যে বন্ধুর নিকট সেই মোহর আঁটা চিঠি আছে, সেই বন্ধুকে, আমার কর্ম্ম-

চারীর মারফতে, আপনার এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তিনি যেন পত্রপাঠ আমার কর্ম্মচারীর হস্তে, সেই চিঠিখানি ফিরাইয়া দেন। আমার কর্ম্মচারী যতক্ষণ সেই পত্র ফিরাইয়া আনিয়া আমার হাতে না দিবে, ততক্ষণও আপনাকে আমার নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এই স্থলে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনার পত্র হস্তগত হইলে, আমি তাহা পাঠ না করিয়াই পুড়াইয়া ফেলিব। তাহার পর আমি সস্ত্রীক প্রস্থান করিলে আরও আধঘণ্টাকাল আপনাকে এখানে অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। তদনন্তর আপনি স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিবেন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবে না। আমার সর্ত্তের কথা আপনাকে জানাইলাম। এখন আপনি ইহাতে সম্মত আছেন কি না বলুন।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে লোকটার বুদ্ধি-স্থৈর্য্য, অত্যন্ত দূরদৃষ্টি, অপরিসীম ধূর্ত্ততা, এবং অত্যাশ্চর্য্য সাহসিকতার অত্যদ্ভুত পরিচয় দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাহার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, লীলার স্বরূপত্ব সমর্থন সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি আমার হস্তগত হইতেছে সত্য, কিন্তু এরূপ নরাধমকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। আর এই দুরাত্মা রমেশের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহারও কোন প্রতিফল দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক এই সুদীর্ঘ কালের পর, তাহার সেই অতীত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত, রমেশ বা আমি তাহাকে কিরূপে দণ্ডিত করিতে পারি।

নিজ শক্তিতে আমরা তাহাকে কোনই শাস্তি দিতে পারি না, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে রাজ-শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সে পূর্ব্ব দুষ্কৃতির প্রমাণ কোথায়? এই ব্যক্তিই যে সেই ব্যক্তি তাহাই বা কে বলিবে? স্বয়ং রমেশই যখন তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না, তখন আর কে তাহা সমর্থন করিতে সক্ষম? তাহার দক্ষিণ হস্তের ক্ষত-চিহ্ন বিশেষ প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না; কারণ নানা কারণে তাহার উৎপত্তি সম্ভাবিত। অতএব তাহাকে ছাড়িয়া না দিলেই বা আমরা এক্ষণে কি করিতে পারি? সুতরাং উহার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, অগত্যা আমাদিগকে তাহাই যথেষ্ট বোধ করিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আরও আমার মনে হইল, প্রমোদরঞ্জনকে হাতে পাই পাই করিয়া পাইলাম না; সে চিরদিনের মত ফাকি দিয়া পলাইল। কি জানি যদি এও আবার কোন প্রকারে হাত ছাড়া হইয়া যায়। না, এ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মন করা কদাপি সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। লীলার স্বত্ব সমর্থিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যের জয় হইবে—আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—"আমি আপনার সমস্ত সর্ত্তে সম্মত হইলাম।"

আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরী বলিল,—"অতি উত্তম। এক্ষণে সকল বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হইয়া গেল।"

এই বলিয়া সে চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং হাই তুলিতে তুলিতে উভয় বাহু বিস্তার করিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ভাল হইয়া বসুন, দেবেন্দ্র বাবু! এখন আমি আপনার সহিত শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়াছি।"

তাহার পর সে দ্বার সন্নিহিত হইয়া তালা খুলিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"রঙ্গমতি দেবি, প্রিয়তমে, একবার এদিকে আসিতে পারিবে কি? এখানে দেবেন্দ্রবাবু নামে একটি ভদ্রলোক আছেন। তোমার আসায় কোন আপত্তি নাই।" তিনি আসিলেন। তখন চৌধুরী আবার বলিল,—"প্রিয়তমে! তোমার জিনিষপত্র গুছানর ঝঞ্চাটের মধ্যে, আমার জন্য একটু চা তৈয়ার করিয়া দিবার সময় হইবে কি? এই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ আছে; সেই জন্যই এখন একটু চা খাওয়ার দরকার হইতেছে।"

রঙ্গমতী ঠাকুরাণী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঘরের কোণে একটা ডেস্ক ছিল। চৌধুরী তাহার সমীপস্থ হইয়া কয়েক দিস্তা কাগজ ও কতকগুলা পাখার কলম বাহির করিল। তাহার পর কলমগুলাকে, যখন যেটা দরকার তখন সেটা লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ডেস্কের উপর ছড়াইয়া রাখিল এবং সংবাদ-পত্রাদির জন্য ব্যবসায়ী লেখকগণ যেরূপ লম্বা লম্বা করিয়া কাগজ কাটিয়া লয়, সেইরূপ অনেক কাগজ কাটিয়া লইল। তাহার পর আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—"আজিকার এই রচনা এক অসাধারণ সামগ্রী

হইবে। প্রবন্ধাদি রচনা বিষয়ে আমার চিরদিন অভ্যাস আছে। মনুষ্যের যত প্রকার মানসিক উন্নতি হইতে পারে, তন্মধ্যে ভাবের শৃঙ্খলা-বিধান-ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তাহা আছে। আপনার তাহা আছে কি দেবেন্দ্র বাবু?"

তাহার পর যতক্ষণ চা না আসিল, ততক্ষণ সে গৃহ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল এবং যে যে স্থলে তাহার ভাবের গ্রন্থি সংলগ্ন না হইল, তত্তৎস্থলে সে আপনার কপোল-দেশে হস্তদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে বাধ্য হইয়া, স্বীয় কল্পনাতীত ঘোর দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতে বসিয়াও, সে ব্যক্তি আপনার অনর্থক অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল মনে করিয়া, কিরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। এমন সময় রঙ্গমতী দেবী চা লইয়া আসিলেন এবং চৌধুরী, স্ত্রীর প্রতি মধুর হাস্য সহ চাহিয়া, তাহা গ্রহণ করিল। রঙ্গমতী চলিয়া গেলেন। চৌধুরী চা ঢালিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একটু চা খাবেন কি দেবেন্দ্র বাবু?"

আমি অস্বীকার করিলাম। সে হাসিয়া বলিল,—"আপনি ভয় করিতেছেন বুঝি, পাছে আপনাকে বিষ খাওয়াই। ছি ছি! আপনারা অনাবশ্যক স্থলে বিশেষ সাবধান, ইহাই দক্ষিণদেশী লোকের প্রধান দোষ।"

চৌধুরী লিখিতে বসিল। একখণ্ড কাগজ সম্মুখে লইল এবং একটা কলম লইয়া দোয়াতে ডুবাইল। তাহার পর

একবার গলা ঝাড়িয়া লইল এবং খস্ খস্ শব্দে অতি দ্রুত লিখিতে আরম্ভ করিল। মোটা মোটা বড় বড় অক্ষরে ছত্রের মধ্যে অনেক খানি করিয়া ফাক দিয়া লিখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একখণ্ড কাগজ ফুরাইয়া গেল। এইরূপে এক এক খণ্ড লিখিয়া, তাহাতে সংখ্যা দিয়া, ঘাড়ের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিতে লাগিল। কলমটাও যখন খারাপ হইয়া গেল, তখন তাহাও এইরূপে পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দিয়া, আবার আর একটা কলম গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহার চেয়ারের চারিদিকে কাগজের স্তূপ হইল; এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইল; সেও লিখিতে লাগিল, আমিও নীরবে বসিয়া থাকিলাম। মধ্যে মধ্যে সে এক এক ঢোক চা খাইতে লাগিল; তদ্ভিন্ন আর কোন কারণে সে একবারও থামিল না, একবারও আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। একটা, দুইটা, তিনটা ক্রমে চারিটা বাজিল; তথাপি চারিদিকে কাগজ পড়ার নিবৃত্তি নাই; কাগজ খসখসানিরও বিরাম নাই। চৌধুরীর অক্লান্ত লেখনী সমান চলিতে লাগিল; চারিটার পর হঠাৎ একটা কলমের খোঁচার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ চৌধুরী অতিশয় গৌরবের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিল,— "বহুত আচ্ছা।" তাহার পর স্বকীয় বিশাল বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সাহঙ্কারে বলিল,—"দেবেন্দ্র বাবু, মার দিয়া। যাহা লিখিয়াছি তাহাতে স্বয়ং অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি যখন পড়িবেন তখন আপনিও যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। বিষয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু

জগদীশের মাথার সমাপ্তি নাই, শেষও নাই। যাউক, এখন আমি কাগজ গুলি গুছাইয়া একবার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিব এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিব। এইমাত্র ৪টা বাজিয়াছে। বেশ। গোছান, পড়া, সংশোধন করা, ৪টা হইতে ৫টা। নিজের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য অতি অল্প নিদ্রা, ৫টা হইতে ৬টা। যাত্রার উদ্যোগ, ৬টা হইতে ৭টা! কর্ম্মচারীর মারফতে আপনার চিঠি আনান ব্যাপার, ৭টা হইতে ৮টা। তাহার পর প্রস্থান আর কি! এই দেখুন আমার কাজের তালিকা।

তাহার পর সে ঘরের মেজের উপর বসিয়া কাগজ গুলি গুছাইয়া লইল এবং একটা গুণসূচ ও সূতা দ্বারা সকল-গুলি গাঁথিয়া ফেলিল। নিজে একবার সবটা পড়িল। তাহার পর রঙ্গভূমির নট যেমন স্বরের হ্রাসবৃদ্ধি ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপ ভাবে সে সেই সকল কাগজ আমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। পাঠকগণ কিঞ্চিৎকাল পরেই চৌধুরীর লিখিত কাগজ দেখিতে পাইবেন। অধুনা এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে যাহা লিখিয়াছিল, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

তদনন্তর যে আড়গোড়া হইতে ব্রুহাম ভাড়া করিয়াছিল তাহার ঠিকানা আমাকে সে লিখিয়া দিল এবং প্রমোদরঞ্জনের এক খানি পত্র দিল। সেই পত্র কৃষ্ণ সরোবর হইতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত। রাণী লীলাবতী ২৬শে তারিখে কলিকাতায় আসিবেন এই সংবাদ তাহাতে লেখা আছে। সুতরাং যে দিন তিনি ৫নং আশুতোষ দের গলিতে পরলোক

গমন করিয়াছেন এবং নিমতলার ঘাটে তাঁহার সৎকার হই-য়াছে, বলিয়া প্রচার সে দিন তিনি কৃষ্ণ সরোবরের রাজবাটীতে স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত ছিলেন এবং তাহার পর দিন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাজার স্বহস্ত লিখিত এই প্রমাণ এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সন্দেহ নাই। গাড়ির আড়গোড়ায় যদি আর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

চৌধুরী ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—"স পাঁচটা বাজিয়াছে। আমি এখন একটু ঘুমাইব। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন দেবেন্দ্র বাবু, আমার দৈহিক গঠন মহাত্মা নেপোলিয়ানের অনুরূপ। সেই চিরস্মরণীয় ব্যক্তির ন্যায়, নিদ্রার উপরেও আমার সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। আপনি এখন কৃপা করিয়া একটু ছুটি দিউন। ততক্ষণ আমার পত্নী আপনার নিকট বসিয়া গল্পগুজব করিবেন এখন।"

আমি বুঝিতে পারিলাম, যতক্ষণ সে নিদ্রার সেবা করিব ততক্ষণ আমাকে পাহারা দিবার জন্যই রঙ্গমতী ঠাকুরাণীকে ডাকা হইতেছে। সুতরাং আমি কোন কথা না কহিয়া আমাকে সে যে সকল কাগজ দিয়াছে তাহাই গুছাইতে লাগিলাম। এ দিকে রঙ্গমতী নিঃশব্দে তথায় আগমন করিলেন। তখন চৌধুরী সেই খাটের উপর চিৎ হইয়া পড়িল এবং ২।৩ মিনিটের মধ্যেই অতি সদাত্মা সাধু পুরুষের ন্যায় সুনিদ্রায় মগ্ন হইল।

রঙ্গমতী আমার প্রতি অতি কুটিল, হিংসা ও ক্রোধপূর্ণ নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন,—"আমার স্বামীর

সহিত আপনার যে যে কথা হইয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি। আমি হইলে আপনার বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়া এতক্ষণ আপনার দফা শেষ করিয়া দিতাম।" এই কথার পর তিনি একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে থাকিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ না হইল ততক্ষণ আর কোন কথা বলিলেন না এবং একবারও আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে চৌধুরী চক্ষু মেলিল এবং উঠিয়া বসিল। তাহার পর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"প্রিয়তমে রঙ্গমতী, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। তোমার ওদিকের সব গোছগাছ ঠিক হইয়াছে? আমার এদিকে যে সামান্য গোছান বাকী আছে তাহা ১০ মিনিটে শেষ হইবে। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া তৈয়ার হওয়া, ১০ মিনিট। কর্ম্মচারী আসিবার পূর্ব্বে আর কি করিব?" এই বলিয়া সে একবার ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ইঁদুরের খাঁচা দেখিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—"আমার প্রধান প্রেমের সামগ্রী এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আমার এই সাধের সোগাগের সন্তান তুল্য ইঁদুরগুলি। ইহাদের কি করিব? এখন তো আমরা অবিশ্রান্ত নানাদেশ ভ্রমণ করিব, কোথাও স্থির হইব না; সুতরাং লটবহর যত কম হয় ততই ভাল। এই স্নেহময় পিতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত, হইলে কে আমার কাকাতুয়া, মনুয়া, আর ইঁদুরগুলির যত্ন করিবে?"

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিল। স্বকৃত দারুণ দুষ্কর্ম্মের বিষয় স্বহস্তে লিখিতে সে একটুও কাতর হয় নাই; কিন্তু পাখী ও ইঁদুরের ভাবনায় সে এখন বস্তুতই অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর সে আবার ডেস্কের নিকট বসিয়া বলিল,—"এক উপায় মনে পড়িয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ রাজধানীর পশুশালায় আমার কাকাতুয়া ও মনুয়া আমি দান করিয়া যাইব। তাহার জন্য যে বর্ণনা পত্র লিখিত হওয়া আবশ্যক, তাহা এখনই লিখিতেছি।"

সে প্রত্যেক কথা বলিতে বলিতে লিখিতে লাগিল। "নং ১। অতি মনোহর বর্ণ-সম্পন্ন কাকাতুয়া। যাহারা বুঝে তাহাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের সামগ্রী। নং ২। অতি সুশিক্ষিত বুদ্ধি-সম্পন্ন কয়েকটি মনুয়া। নন্দন কাননের উপযুক্ত। জগদীশনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতার পশুশালায় প্রদত্ত হইল।"

রঙ্গমতী বলিলেন,—"কই ইঁদুরের কথা লিখিলে না?"

চৌধুরী ডেস্কের নিকট হইতে রঙ্গমতীর সমীপস্থ হইল এবং স্নেহ গদ্গদ স্বরে বলিল,—"মানব-হৃদয়ের কাঠিন্য ও দৃঢ়তার একটা সীমা আছে। যত দুর আমার সাধ্য তাহা আমি করিয়াছি। ইঁদুরগুলিকে আমি কোন মতেই ছাড়িতে পারিব না। তাহা হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে।"

রঙ্গমতী স্বামীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য কোমলতা।" সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। তাহার পর ঠাকুরাণী সযত্নে ইঁদুরের খাঁচা লইয়া এ প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।"

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল। তখনও কর্ম্মচারী আসিল না দেখিয়া, চৌধুরী একটু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। বেলা সাতটার সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল এবং অবিলম্বে কর্ম্মচারী দেখা দিল। সে লোকটাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাহার হাড়ে হাড়ে দুষ্ট বুদ্ধি মাখা আছে। চৌধুরীর মুখে শুনিলাম, তাহার নাম হরেকৃষ্ণ। চৌধুরী তাহাকে ঘরের এক কোণে লইয়া গিয়া কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি কথা বলিল, তাহার পর প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচারী আমার সমীপস্থ হইয়া বিনীতভাবে পত্রের প্রার্থনা করিল। আমার প্রেরিত গালা মোহর আঁটা পত্র খানি এই পত্রবাহক দ্বারা ফেরৎ পাঠাইবার নিমিত্ত, রমেশকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলাম, এবং সে পত্র কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিলাম। চৌধুরী পুনরায় সেই ঘরে আসিলে, কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। চৌধুরীর এক আধটু যে কাজ বাকী ছিল, তাহা সে এই অবকাশে সমাপ্ত করিয়া ফেলিল।

বেলা ৮টার একটু আগে কর্ম্মচারী রমেশ বাবুর নিকট হইতে আমার চিঠি ফিরাইয়া আনিল। চিঠি যেমন মোহর আঁটা তেমনই আছে; কেহই তাহা খুলে নাই। চৌধুরী পত্র খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, দেশলাই জ্বালাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্মীভূত করিল। তাহার 'পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"মনে করিবেন না, দেবেন্দ্রবাবু, যে ভবিষ্যতে আপনি আমার হস্ত হইতে এই

অত্যাচারের কোনই প্রতিফল পাইবেন না।" আমি কোন উত্তর দিলাম না।

কর্ম্মচারী গাড়ি করিয়া রমেশের নিকট যাতায়াত করিয়াছিল, সেই গাড়ি দরজায় খাড়া ছিল। এক্ষণে কর্ম্মচারী ও ঝি জিনিষ পত্র গাড়িতে তুলিতে লাগিল। এদিকে রঙ্গমতী দেবীও কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। চৌধুরী আমার কাণে কাণে বলিল,—"আমার সঙ্গে গাড়ি পর্য্যন্ত আসুন। আপনাকে এখনও বলিবার কথা আছে।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিলাম। রঙ্গমতী দেবী, ইঁদুরের খাঁচা লইয়া, আগেই গাড়িতে উঠিলেন। চৌধুরী আমাকে এক পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল,—"মনোরমা দেবীর সহিত যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে কৃশ ও পীড়িত বোধ হইয়াছিল। সেই নারীকুলোত্তমার তাদৃশ অবস্থা দেখা অবধি আমি অতিশয় চিন্তাকুল আছি। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতি যত্নের ত্রুটি করিবেন না। এই প্রস্থান কালে, আমি সানুনয়ে, আপনাকে এই অনুরোধ করিয়া যাইতেছি।"

তাহার পর সে তাহার সেই প্রকাণ্ড শরীর কষ্টে সৃষ্টে গাড়ির মধ্যে পুরিয়া লইল। গাড়ি চলিয়া গেল। তখনই গলির মোড় হইতে আর একখানি গাড়ি আসিল এবং যেদিকে চৌধুরীর গাড়ি গিয়াছে, সেই দিকেই চলিল। যখন আমার ও চৌধুরীর কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া গাড়িখানি গেল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে সেই গণ্ডদেশে দাগযুক্ত যুবক বসিয়া আছেন।

কর্ম্মচারী বলিল,—"আপনাকে আরও আধ ঘণ্টা কাল এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ।"

আমরা পুনুবায় সেই উপরের ঘরে গিয়া বসিলাম। চৌধুরী আমার হস্তে যে সকল কাগজ দিয়াছে, তাহাই বাহির করিয়া যে ব্যক্তি সেই অতি ভয়ানক চক্রান্তের প্রধান চক্রী এবং যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছে, তাহারই স্বহস্ত লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলাম।

জগদীশনাথ চৌধুরীর কথা।

বহুকাল বহু ভাবে পশ্চিম প্রদেশে অতিবাহিত করিয়া বিগত ১২৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে আমি এদেশে আগমন করি। আমার সহসা এদেশে আগমনের গুরুতর গোপনীয় অভিসন্ধি ছিল এবং সেই অভিসন্ধি সাধনার্থ, সাহায্যকারী স্বরূপে, আরও কয়েক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। রমণী নাম্নী এক স্ত্রীলোক এবং হরেকৃষ্ণ নামক এক পুরুষ তন্মধ্যে প্রধান। কি সে অভিসন্ধি যদি তাহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহার সে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। এ প্রদেশে আসিয়া, প্রথমে কয়েক সপ্তাহ কাল আমার স্বর্গগত বন্ধু রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ের বাটীতে অতিবাহিত করিব স্থির করিলাম। তিনিও পশ্চিম হইতে সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আমিও পশ্চিম হইতে সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলাম। এ সম্বন্ধে উভয় বন্ধুর অদ্ভুত ঐক্য। সং-

কালে আর এক গুরুতর বিষয়ে উভয় বন্ধুর অত্যদ্ভুত সমতা ছিল। উভয়েরই সে সময়ে ভয়ানক অপ্রতুল। টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। সভ্য-জগতে কে এমন ব্যক্তি আছেন যে আমাদের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন না? যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়হীন, অথবা অপরিমিত ধনবান। প্রকৃত ব্যাপারের স্বরূপ আখ্যানই আবশ্যক। এই জন্য আমি এস্থলে আমার এবং আমার রাজবন্ধুর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কথা সরলভাবে সংঘোষিত করিলাম।

মনোরমা নাম্নী এক অপার্থিব রমণী কর্ত্তৃক আমরা রাজার সেই প্রকাণ্ড ভবনে অভ্যর্থিত হইলাম এবং অনতিকাল মধ্যেই সেই সুন্দরীর নিকট আমি হৃদয় বিক্রয় করিলাম। এই ষাটি বৎসর বয়সে আমার হৃদয় হইতে অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের ন্যায় প্রেমাগ্নি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী আমি সেই চরণারবিন্দে উৎসর্গীকৃত করিতে লাগিলাম; আমার নিরপরাধিনী পত্নী কেবল মাত্র অসার পদার্থপুঞ্জই পাইতে থাকিলেন। জগতের এই রীতি, মানবের এই স্বভাব, প্রেমের এই ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসা করি, এসংসারে আমরা ছায়াবাজীর পুতুল ভিন্ন আর কি? হে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতঃ! কৃপা করিয়া একটু ধীরে আমাদের রজ্জু আকর্ষণ কর! ত্বরায় আমাদের এই নৃত্য ব্যাপার পরিসমাপ্ত করিয়া দেও! সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি

বাক্য মধ্যে এক সম্পূর্ণ দর্শন শাস্ত্রের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইবে। এই দর্শনশাস্ত্র আমার উদ্ভাবিত।

এক্ষণে আরব্ধ উপাখ্যানের অনুসরণ করিতেছি। আমরা কৃষ্ণসরোবরে অবস্থিত হওয়ার পর, আমাদের তদানীন্তন অবস্থা স্বয়ং শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরী অতি সুন্দর ও বিষদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অপরিসীম সৌভাগ্য হেতু তদীয় অত্যদ্ভুত দিনলিপি আমি বিগর্হিত উপায়ে পাঠ করিতে পাইয়াছিলাম। তৎপাঠে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তিনি প্রসঙ্গসমূহ এতই স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন যে, আমার তদ্বিষয়ে আর কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন নাই। যে নিরতিশয় কৌতূহলজনক কাণ্ডের বর্ণনা করা আমার আবশ্যক, এবং যাহার সহিত আমি সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত, শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর কঠিন পীড়া হইতে তাহার আরম্ভ ও উৎপত্তি।

এই সময়ে আমাদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক! প্রমোদের কয়েকটা গুরুতর দেনা এই সময়ে পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না, আমারও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র অপ্রতুলের কথা এস্থলে উল্লেখ না করিলেও হানি নাই। প্রমোদের রাণীর সম্পত্তি আমাদের উভয়ের কেবল একমাত্র ভরসাস্থল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু না হইলে, তাহার সিকিপয়সাও হস্তগত হইবার উপায় নাই। বড়ই মন্দ সংবাদ; আরও মন্দ সংবাদ আছে; আমার পরলোকগত বন্ধুর এতদ্ভিন্ন চিন্তার আরও এক গোপনীয় কারণ ছিল। আমি, সৌজন্যের বশবর্ত্তী

হইয়া, কদাপি তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করি নাই। মুক্তকেশী নাম্নী এক স্ত্রীলোক সন্নিহিত কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, সে সময়ে সময়ে রাণী লীলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তৎকর্ত্তৃক একটা রহস্য ব্যক্ত হইলে রাজার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত, এই কয়টি সংবাদ ভিন্ন তৎকালে আমি আর কিছু জানিতাম না। প্রমোদ আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, যদি মুক্তকেশীকে ধরিতে না পারা যায় এবং রাণীর সহিত তাহার আলাপ বন্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশের ইয়ত্তা থাকিবে না। যদি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অপ্রতুলতার কি হইবে? অপরিসীম সাহসী জগদীশকেও এই আশঙ্কায় কাঁপিতে হইল!

তখন আমি প্রাণপণে মুক্তকেশীর সন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। যদিও আমাদের টাকার দরকারের সীমা নাই, তথাপি তাহারও বরং দেরি করিলে চলিতে পারে, কিন্তু মুক্তকেশীর সন্ধানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহে না। আমি তাহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছিলাম রাণী লীলাবতীর সহিত তাহার অত্যদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি জানিতে পারিলাম যে, সে বাতুলালয় হইতে পলায়ন করিয়াছে, তখন আমার মনে এক অত্যদ্ভুত কল্পনার উৎপত্তি হইল এবং পরিণামে তাহার অতি বিস্ময়াবহ ফল ফলিল। আমার সেই অভিনব কল্পনা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের পরামর্শ প্রদান করিল। রাণী লীলাবতী ও মুক্তকেশীর পরস্পর নাম, ধাম ও অবস্থার

পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে সকল বিপদই বিদূরিত হইয়া যাইবে। আমাদের ৩ লক্ষ টাকা হস্তগত হইবে এবং রাজা প্রমোদরঞ্জনের গোপনীয় রহস্যও চিরদিনের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন থাকিবে। কি অপূর্ব্ব কল্পনা!

আমার অভ্রান্ত বুদ্ধি স্থির করিল যে, অদৃশ্য মুক্তকেশী দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সরোবরের কাঠের ঘরে আসিবে। অতএব আমি কাঠের ঘরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব স্থির করিলাম। গিন্নী ঝি নিস্তারিণীকে বলিলাম, যে প্রয়োজন হইলে আমাকে কাঠের ঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে; আমি সেই স্থানে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিব। আমি কখনই অকারণে লোকের অনুসন্ধিৎসা বা সন্দেহ উত্তেজিত করি না। নিস্তারিণী কখনই আমাকে অবিশ্বাস করিত না; উপস্থিত ছলনাও সে অবিশ্বাস করিল না।

এইরূপে কাঠের ঘরে অপেক্ষা করা নিষ্ফল হইল না। মুক্তকেশীর দেখা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু যে স্ত্রীলোক তৎকালে তাহার অভিভাবিকা, সে আসিয়া দেখা দিল। সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকও আমার মিষ্ট কথায় পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না এবং আমাকে তাহার সন্তান-বৎ স্নেহের সামগ্রীর সমীপে লইয়া গেল। যখন আমি প্রথমে মুক্তকেশীর সমীপস্থ হইলাম, তখন সে নিদ্রিত ছিল। এই অভাগিনীর সহিত রাণী লীলাবতীর অত্যদ্ভুত আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমার শরীর দিয়া তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। কল্পনাবলে যে অচিন্তনীয় ব্যাপারের বাহ্যাবয়ব মাত্র আমি সংগঠিত করিয়াছিলাম, অধুনা এই নিদ্রিতা নারীর

বদন সন্দর্শনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ সুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া আমার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় বিগলিত হইল এবং তাহার যাতনা শান্তির নিমিত্ত আমি চেষ্টান্বিত হইলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি তাহাকে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, তাহার কলিকাতা যাত্রার সুযোগ করিয়া দিলাম।

এই স্থানে এক অত্যাবশ্যক প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া, সাধারণের হৃদয় হইতে এক শোচনীয় ভ্রান্তি বিদূরিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমার জীবনের ভূরিভাগ চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা মানবকে অতুলনীয় ক্ষমতাশালী করে, এই জন্য তাহার আলোচনায় আমার অত্যন্ত অনুরাগ। আমি একথার অর্থ বুঝাইয়া দিতেছি। মন মানবরাজ্যের নেতা ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু মনের শাসনকর্ত্তা কে? শরীর। বেশ করিয়া আমার কথা বুঝিবেন। এই অপরিসীম শক্তি-সম্পন্ন শরীর রসায়নবিদের সম্পূর্ণ পদাবনত। যখন কালিদাস মেঘদূতের কল্পনা করিয়া তাহা লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন রসায়নবিৎ জগদীশ চৌধুরী যদি তাঁহার নিত্যখাদ্যের সহিত একটু গুঁড়া মিশাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী বটতলার অপেক্ষাও জঘন্য ও অপাঠ্য গ্রন্থ প্রসব করিয়া কলঙ্কিত হইত। বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি নিউটনকে জীবিত করিয়া আমার সমক্ষে লইয়া আইস; আমার সুকৌশলে, বৃক্ষ হইতে ফল পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব তাঁহার মনে উদিত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি তাহা ভোজন করিয়া

বসিয়া থাকিবেন। আর তোমাদের দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে লইয়া আইস; আমি তাঁহার পোলাঁও-কাবাবের সহিত এমন সামগ্রী মিশাইয়া দিব যে, ভোজনান্তে তিনি অত্যন্ত কোমল প্রকৃতিক ভদ্র লোক হইয়া উঠিবেন। আর যে বীরবর প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, আমার হাতের একটি খিলি খাইলে, 'রক্ষা কর!' 'রক্ষা কর!' শব্দে তিনি আকব্বর বাদসাহের পদতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইবেন। রসায়ন এমনই অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার এইরূপ অপরিসীম ক্ষমতা! কিন্তু এখানে এত কথা কেন বলিতেছি? কারণ আমার রাসায়নিক অভিজ্ঞতা উপলক্ষ করিয়া লোকে অনেক কুৎসা রটনা করিয়াছে এবং আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়াছে। লোকে বলে, আমি আমার এই বিপুল রাসায়নিক জ্ঞান মুক্তকেশীর উপর প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং সুযোগ হইলে, মনোরমা সুন্দরীর উপরেও তাহা প্রয়োগ করিতাম। উভয়ই অতি ঘৃণাজনক মিথ্যা কথা। অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন যে, মুক্তকেশীর জীবন রক্ষা করাই তৎকালে আমার প্রধান আবশ্যক এবং যে পাশকরা খুনে, আমার কথা কলিকাতার বড় ডাক্তার সমর্থন করিতেছেন জানিয়াও, জোর করিয়া মনোরমার চিকিৎসা করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করাই আমার প্রধান কামনা ছিল। এই ব্যাপারে দুইবার—দুইবার মাত্র আমি রসায়নের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে যে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে

তাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। একদা একখানি গরুর গাড়ির পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পরম সুন্দর গতি পর্য্যবেক্ষণ রূপ অসীম সুখভোগ করার পর, উক্ত আরাধ্য শত্রু কর্ত্তৃক গিরিবালার হস্ত ন্যস্ত পত্রদ্বয়ের একখানি এককালে বাহির করিয়া ও অপর খানি নকল করিয়া লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই স্থলে দুই কাঁচ্চা সামগ্রীর দ্বারা আমার বুদ্ধিমতী পত্নী উপদেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করেন। আর একবার, রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে, আমাকে রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আর কোন স্থলেই আমি রাসায়নিক কোন প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করি নাই। যদি লোকে এবিষয়ে কোন বিরুদ্ধ কথা প্রচার করে, তাহা হইলে আমি এই স্থলে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছি। এতক্ষণে হৃদয়-ভারের কিছু লাঘব হইল। তার পর?

রোহিণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, মুক্তকেশীকে, রাজা প্রমোদরঞ্জনের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য, কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক। দেখিলাম রোহিণী অতি আগ্রহ সহকারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার পর কলিকাতায় যাত্রার একটা দিনস্থির করিলাম। সেই দিনে তাহারা রেলে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তখন এদিকের অন্যান্য গোলযোগে মনঃসংযোগ করিবার সময় হইল। কলিকাতায় গিয়া রোহিণী রাণী লীলাবতীকে তাহাদের ঠিকানা লিখিয়া

পাঠাইবে কথা ছিল। কিন্তু যদিই তাহারা, অন্যরূপ অভিপ্রায় করিয়া, পত্র না লিখে তাহা হইলে কি হইবে? অতএব গোপনে তাহাদের ঠিকানা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে একার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম? আমার মন উত্তর দিল,—আমার অর্দ্ধাঙ্গ—শ্রীশ্রীমতী রঙ্গমতী দেবী। সুতরাং তাঁহাকেও সেই গাড়িতে চড়িয়া কলিকাতা যাইতে হইল। যখন তিনি যাইতেছেন তখন তাঁহার দ্বারা আরও একটা কাজ সারিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। শ্রীমতী মনোরমা দেবীর পরিচর্য্যার জন্য একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। আমার অধীনে রমণী নাম্নী এ কার্য্যে অতি নিপুণা এক স্ত্রীলোক ছিল। তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার স্ত্রীর যোগে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার স্ত্রী, রোহিণী ও মুক্তকেশী এক সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেই রাত্রে আমার অর্দ্ধাঙ্গ সকল কার্য্য শেষ করিয়া এবং রমণীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এত সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না; কারণ যথাসময়ে রোহিণী রাণীকে পত্র দ্বারা তাহাদের কলিকাতার ঠিকানা জানাইয়া পাঠাইল। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমি সে পত্র হস্তগত করিয়া রাখিলাম।

সেই দিন মনোরমা সুন্দরীর চিকিৎসকের সহিত আমার অনেক বচসা হইল। মুর্খের চিরন্তন নিয়মানুসারে, সে আমাকে নানা অপ্রিয় কথা বলিল; কিন্তু

আমি অনর্থক কলহ করিয়া অসন্তোষের বৃদ্ধি করিলাম না।

তাহার পর আমার কলিকাতায় চলিয়া আসার অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইল। আগতপ্রায় ব্যাপারের জন্য কলিকাতায় আমার একটা বাসা লওয়া আবশ্যক এবং পারিবারিক কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাও আবশ্যক। ৫নং আশুতোষ দের লেনে বাসা স্থির হইল। আনন্দধামে রাধিকা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর পত্রাদি আমি গোপনে খুলিয়া পাঠ করিতাম। সুতরাং আমার জানা ছিল যে, তিনি বর্ত্তমান পারিবারিক অকৌশল নিবারণের জন্য, কিছু দিনের নিমিত্ত রাণী লীলাবতীকে আনন্দধামে লইয়া আসিতে রাধিকা বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল বোধে, আমি এ পত্র নির্ব্বিরোধে যথাস্থানে যাইতে দিয়াছিলাম। অধুনা আমি রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া মনোরমার প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম। বলিলাম যে, এজন্য রাণীকে তাঁহার এক পত্র লেখা আবশ্যক এবং রাণী কলিকাতা হইয়া আসিবার সময় কোথায় রাত্রিবাস করিবেন, সে পত্রে তাহারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কলিকাতায় রাণীর পিসিমার বাসা আছে। সেই বাসাতেই রাণীকে থাকিতে আজ্ঞা করিতে বলিলাম। দেখিলাম, রাধিকাপ্রসাদ রায় লোকটা অতি অপদার্থ। তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমার মত দুর্দ্ধর্ষ

লোকের কতক্ষণ লাগে? আমি তখনই তাহার নিকট হইতে আবশ্যকমত চিঠি বাহির করিয়া লইলাম।

রায় মহাশয়ের পত্র লইয়া কৃষ্ণ সরোবরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেই অকর্ম্মণ্য চিকিৎসকের অব্যবস্থায়, মনোরমার পীড়া বড় ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভয়ানক বিকার দাঁড়াইয়াছে। সে বিকার আবার সংক্রামক। রাণী ঠাকুরাণী, পীড়িতার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য, জোর করিয়া মনোরমা দেবীর ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মনের কখনই ঐক্য ছিল না। তিনি আমাকে একবার গোয়েন্দা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন; তিনি আমার ও রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। এই সকল কারণে তাঁহার সহিত আমার কোন প্রকার আত্মীয়তা ছিল না। সুতরাং স্বহস্তে যদি তাহাকে আমি সেই ঘরে পুরিয়া দিতাম তাহা হইলেও অন্যায় হইত না। কিন্তু, অসামান্য সহৃদয়তা সহকারে আমি তাহা করি নাই। তাঁহার প্রবেশের ব্যাঘাতও দিই নাই। যদি হতভাগা ডাক্তারটা ব্যাঘাত না দিত তাহা হইলে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং সম্ভবতঃ সেইরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাহা হইলে আমি এত পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া ধীরে ধীরে যে জাল বিস্তার করিতেছি, তাহার আর দরকার হইত না। কিন্তু তাঁহাকে ডাক্তারটা তথায় যাইতে দিল না।

কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। কলিকাতায় হইতে সেই দিন ডাক্তার আসিলেন। তিনি আমার সমস্ত কথাই সমর্থন করিলেন।

পঞ্চম দিবসের পর হইতে আমার মনোমোহিনী রুগ্নার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে আবার একবার আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। আশুতোষ দের লেনে বাসার ঠিকঠাক করা, রোহিণী এখনও সেই বাসায় আছে কি না গোপনে তাহার সন্ধান করা এবং হরেকৃষ্ণের সহিত কোন কোন পরামর্শ করা আমার দরকার ছিল। সকল কাজ সারিয়া, আমি রাত্রে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আর পাঁচ দিন পরে ডাক্তার বলিলেন যে, পীড়িতার জন্য আর কোন ভয় নাই। এখন বিহিত যত্নে সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলেই, তিনি ত্বরায় আরোগ্য হইয়া উঠিবেন। এই সময়ে ডাক্তারটাকে তাড়ান নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আমি এক দিন তাহার সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধাইয়া দিলাম এবং অনেক গালিগালাজ করিলাম। প্রমোদকে পূর্ব্বেই শিখাইয়া রাখিয়া ছিলাম; সে এ কলহে মাথা দিল না। ডাক্তার আর আসিবে না বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাঁচিলাম।

এখন বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের তাড়ান দরকার। প্রমোদরঞ্জনকে অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ার করিলাম। তিনি কেবল একটা নিতান্ত নির্ব্বোধ ঝি ছাড়া আর সব লোকজনকে জবাব দিবার জন্য, নিস্তারিণীকে হুকুম দিলেন। নিস্তারিণী অবাক! কিন্তু যাই হউক, বাটী খোলসা হইয়া গেল। যে ঝি থাকিল সে থাকা না থাকা দুইই সমান, কারণ সে নির্ব্বোধের চূড়ামণি; সুতরাং আমাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার

পর নিস্তারিণীকেও কিয়ৎকালের জন্য স্থানান্তরিত করার আবশ্যক। গিরিবালাকে সন্ধান করার ওজরে, তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইলাম। আমাদের যাহা মনোভীষ্ট তাহা ঠিক হইল।

রাণী উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বদা নিজের ঘরে পড়িয়া থাকেন, আর সেই নির্ব্বোধ ঝিটা দিন রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরী উত্তরোত্তর আরোগ্য হইতেছেন বটে, কিন্তু এখনও শয্যাগত; রমণী চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার নিকট থাকে। আমি, আমার স্ত্রী আর প্রমোদরঞ্জন ছাড়া বাটীতে আর কেহ থাকিল না। সকল দিকে এইরূপ সুবিধা করিয়া, যে খেলা আমি সাজাইয়াছি তাহার আর এক চাইল চালিলাম। ভগ্নীর সঙ্গশূন্য হইয়া রাণীকে যাহাতে একাকিনী শক্তিপুর যাইতে হয়, তাহাই আমার চেষ্টা। মনোরমা সুন্দরী অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা যদি রাণীকে না বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি কখনই একাকিনী যাইতে সম্মত হইবেন না। এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে বলিয়া, রাজবাটীর যে অংশে কোন লোক থাকে না, তাহারই একতম প্রকোষ্ঠে আমরা সেই রগ্না সুন্দরীকে লুকাইয়া ফেলিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে আমি, আমার স্ত্রী ও রমণী এই তিনজনে মিলিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। প্রমোদ বড় চঞ্চল, এজন্য তাহাকে ইহার মধ্যে লইলাম না। কি অপূর্ব্ব, কি রহস্যময়, কি নাটকোচিত দৃশ্য! আমার মনোমোহিনী, রোগ মুক্তির পর, প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। আমরা স্থানে স্থানে

আলোক স্থাপন করিয়া এবং দ্বারাদি সমস্ত খুলিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে খট্টা সমেত রোগিণীকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। দৈহিক শক্তির আধিক্য হেতু, আমি খট্টার মাথার দিক ধরিলাম, আর রঙ্গমতী দেবী ও রমণী পায়ের দিক ধরিলেন। এই মহামূল্য ভার আমি অপার আনন্দের সহিত বহন করিলাম। আমাদের এই নৈশ লীলা চিত্রিত করিতে পারে, এমন চিত্রকর কে আছে?

ভবনের এক নির্জ্জন ভাগে, শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীকে রমণীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, পর দিন প্রাতে আমি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলাম। রাধিকাবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন এবং যাহাতে, কলিকাতায় পিসির বাড়ীতে রাত্রিবাস করিবার জন্য, তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন, কলিকাতায় আসিবার সময়, সে পত্র প্রমোদরঞ্জনের হাতে রাখিয়া আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম, আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তিনি যেন সে পত্র তাঁহার রাণীকে দেন। যে বাতুলালয়ে মুক্তকেশী অবরুদ্ধ ছিল রাজার নিকট হইতে তাহার ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং পলাতকা বন্দিনী পুনরায় ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অধ্যক্ষের নামে এক খানি চিঠি লিখাইয়া লইলাম।

আমার বাসার হাঁড়িকুড়ি পর্য্যন্ত গোছান ছিল। সুতরাং সে বিষয়ে কোন ভাবনা ছিল না। এখন মুক্তকেশী হরিণীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য, আর এক জাল পাতিলাম। এইখানে তারিখের প্রধান দরকার। আমি সব নখদর্পণে রাখিয়াছি; ঠিক বলিতেছি।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, কোন উপায়ে রোহিণীকে আগে সরাইবার অভিপ্রায়ে, একখানি গাড়ি করিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গকে পাঠাইয়া দিলাম। রাণী লীলাবতী দেবী কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং রোহিণীর সহিত কথা কহিতে চাহেন এই কথা বলিতেই রোহিণী আমার অর্দ্ধাঙ্গের সহিত গাড়িতে উঠিয়া আসিল। তার পর পথিমধ্যে একটা স্থানে একটু বিশেষ দরকার আছে বলিয়া নামিয়া, আমার অর্দ্ধাঙ্গ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে আমি সুকৌশলে মুক্তকেশীকে বাসায় আনিয়া উপস্থিত করিলাম। মুক্তকেশী তখন হইতে হঠাৎ রাণী লীলাবতী হইয়া পড়িল এবং আমার লোকজন তাহাকে আমার শ্যালক-পুত্রী এবং আমার পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়া জানিল।

কিরূপে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম বলি শুন। এদিকে যখন এক অর্দ্ধাঙ্গ রোহিণীকে লইয়া নিযুক্ত, তখন অপর অর্দ্ধাঙ্গ, অর্থাৎ স্বয়ং জগদীশ, রাস্তা হইতে এক ছোকরা ধরিয়া মুক্তকেশীকে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাণী লীলাবতী রোহিণীকে আজিকার দিন সঙ্গে রাখিবেন; মুক্তকেশীও যেন পত্রবাহক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাণীর নিকট আইসেন। ভদ্রলোক মহাশয় পথে গাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। যেই সংবাদ পাওয়া সেই মুক্তকেশী আসিল এবং গাড়িতে উঠিল। হরিণী জালে পড়িল! এরূপ স্থলে, এরূপ ভাবে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের অভিনয় সম্পন্ন করিয়া, আমি একটু আত্মপ্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বল দেখি, তোমার কোন কবি এরূপ অত্যদ্ভুত কাণ্ডের

কল্পনা করিতে পারেন? কোন উপন্যাসলেখক এরূপ অত্যদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন?

আশুতোষ দের লেন পর্য্যন্ত আসিতে, পথে মুক্তকেশী একটুও ভীত ভাব দেখাইল না। কেন দেখাইবে? আমি যখন স্নেহের অভিনয় করিব, তাহাতে তখন না গলিয়া থাকিতে পারে এমন লোক কে আছে? আমি তাহাকে ঔষধ দিয়াছি, তাহাতে তাহার উপকার হইয়াছে; আমি তাহাকে রাজার হস্ত হইতে পলায়ন করিবার উপায় করিয়া দিয়াছি এবং সম্প্রতি রাণীর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দিতেছি। সুতরাং আমার মত বিশ্বাসের পাত্র আর কে আছে? কিন্তু এক বিষয়ে আমি বড় অসাবধান হইয়াছিলাম। সে যে আমার বাসায় আসিয়া রাণীকে দেখিতে পাইবে না, এ বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিয়া রাখা উচিত ছিল। আমার বাসায় আসিয়া সে যখন উপরে উঠিল তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা রঙ্গমতী দেবী ভিন্ন আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, সে নিরতিশয় ভীত, কম্পান্বিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে অভয় দিবার বিস্তর চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চিররুগ্না যে দারুণ হৃদ্রোগে পীড়িত ছিল, বিজাতীয় অবসাদ হেতু, সেই পীড়ার অধুনা আতিশয্য ঘটিল এবং তাহার আক্ষেপ আরম্ভ হইল ও সে মূর্চ্ছিত হইল। তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমি বড়ই ভীত হইলাম এবং নিকটস্থ ডাক্তার ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সৌভাগ্যের বিষয় ডাক্তারটি অতি বিচক্ষণ ও উপযুক্ত। আমি তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম যে, রোগীর বুদ্ধি বড় কম

এবং তিনি সময়ে সময়ে বিভীষিকা দেখিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত করিলাম, আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কোন পরিচারিকা পীড়িতার নিকট থাকিবে না। কিন্তু অভাগিনীর পীড়া এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আমাদের ইষ্টানিষ্টজনক কোন কথাই বলিতে তাহার সাধ্য ছিল না। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইল—যদি এই কল্পিত রাণী লীলাবতী, আসল রাণী লীলাবতী কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই, মরিয়া যায়!

২৬শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে হরেকৃষ্ণের বাটীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য, আমি রমণীকে পত্র লিখিয়াছিলাম এবং যাহাতে ২৬শে তারিখে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা নিশ্চয়ই ঘটে, রাজাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তকেশীর অবস্থা দেখিয়া, যাহাতে আরও অগ্রে রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসা হয়, তাহার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় কি? এস্থলে কোন সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। জগদীশ দিবাকর তৎকালে রাহুগ্রস্ত হইল!

সে রাত্রে কল্পিত রাণী লীলাবতীর অবস্থা বড় মন্দ হইল, কিন্তু প্রাতে তাঁহার অবস্থা বড়ই ভাল বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আমার পূর্ব্ব পত্রানুসারে কার্য্য হইলে, পর দিন বেলা ১২॥০ টার গাড়িতে কৃষ্ণ সরোবর হইতে যাত্রা করিয়া ২॥০ টার সময় রাণী লীলাবতীর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবার কথা। এদিকে যখন মুক্তকেশী একদিন বাঁচিবে ভরসা হইতেছে,

তখন আর ভয় কি? তখন রাণীর জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহাতে মনঃসংযোগ করা আবশ্যক।

বিখ্যাত ব্রাউন কোম্পানির আড়গোড়ায় গিয়া, রাণীকে ষ্টেশন হইতে আনিবার নিমিত্ত, একখানি ব্রুহাম ও জুড়ি ঠিক বেলা ২টার সময় যাহাতে আমার বাসায় আসিয়া পৌঁছে, তাহার অর্ডর রেজষ্টরী করিয়া দিয়া আসিলাম। তাহার পর হরেকৃষ্ণের বাসায় গিয়া যাহাতে রাণী উঠিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করিলাম। তাহার পর কল্পিত মুক্তকেশীর বাতুলতা প্রমাণের জন্য যে দুইজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইব মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিলাম। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্র লোক। পরের উপকারার্থে তাঁহাদের জীবন দীক্ষিত। তাঁহারা উভয়েই আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, আমার প্রয়োজন মত সার্টিফিকেটে লিখিয়া দিতে স্বীকৃত থাকিলেন। তাঁহারা উন্নতমনা সুশিক্ষিত ব্যক্তি। এরূপ উদারতা তাঁহাদের অত্যুন্নতির পরিচায়ক। তাঁহারা সাধু। এই সকল ব্যাপার শেষ করিয়া যখন আমি বাসায় ফিরিলাম, তখন ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখিলাম সর্ব্বনাশ হইয়াছে—মুক্তকেশী মরিয়া গিয়াছে! ২৫শে মরিয়া গেল—এদিকে ২৬শের এদিকে রাণী কলিকাতায় আসিবেন না। সর্ব্বনাশ! জগদীশনাথ অবাক! মনে কর কি ভয়ানক ব্যাপার! জগদীশ অবাক!

তখন যে মালা গোলা গিয়াছে, তাহা না গিলিলে আর উপায় কি? যে চাইল চালা গিয়াছে, তাহা আর ফিরে

না। আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, ডাক্তার ভোলানাথ বাবু কৃপা করিয়া, সৎকারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি কাতর ভাবে, 'বল হরি' বলিতে বলিতে খালি পায়ে সৎকার করিতে চলিলাম। তাহার পর নীরবে ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতে প্রমোদের পত্র পাইয়া জানিলাম, সেই দিন ১২।।০ টার ট্রেনে রাণী লীলাবতী কৃষ্ণ সরোবর হইতে যাত্রা করিবেন। যথাসময়ে আড়গোড়া হইতে গাড়ি আসিল। কল্পিত লীলাবতীকে শ্মশানে ভস্ম করিয়া, আসল লীলাবতীকে আনিবার জন্য আমি ষ্টেশনে চলিলাম। মুক্তকেশীর যত কাপড় চোপড় সকলই আমি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎ-সমস্ত গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে জীবিতা রাণী লীলাবতীর শরীরে মৃতা মুক্তকেশীর আবির্ভাব হইবে। কি অদ্ভুত কাণ্ড! বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ উপন্যাসলেখকগণ! আপনারা এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার মনে রাখিবেন।

নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে গিয়া রাণী লীলাবতীকে গাড়িতে উঠাইলাম। পথে তিনি ভগ্নীর ভাবনায় বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখনই আমার বাসায় ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম এবং নিজবাসা বলিয়া তাঁহাকে হরেকৃষ্ণের বাসায় তুলিলাম। যে দুই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক অপরিসীম সৌজন্য সহকারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিতে সম্মত ছিলেন, তাঁহারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাণীকে ভগ্নীর বিষয়ে আশ্বস্ত

করিয়া, আমি একে একে আমার সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ বন্ধুদ্বয়কে রাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা অতি বুদ্ধিমান ; সুতরাং সংক্ষেপে সকলই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, মনোরমা দেবীর পীড়ার ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে সংবাদ দিয়া, আমি ঘটনা খুব পাকাইয়া তুলিলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। চিন্তা ও ভয়ে রাণী লীলাবতীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। রসায়ন বিদ্যার অসীম ভাণ্ডার হইতে আমাকে অধুনা সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। এক গ্লাস ঔষধ মিশ্রিত জল ও এক সিসি ঔষধ মিশ্রিত স্মেলিংসল্ট রোগীর হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ভয় ও ভাবনা অন্তর্হিত করিয়া দিল। রাত্রে আর একটু ঔষধের সাহায্যে রাণীর সুনিদ্রার সুযোগ করিয়া দিলাম। রমণী স্বহস্তে রাণীর পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিল—মুক্তকেশীর পরিচ্ছদ রাণীর দেহে উঠিল। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমি ও রমণী এই পুনর্জ্জীবিতা মুক্তকেশীকে লইয়া বাতুলালয়ে গমন করিলাম। ডাক্তারদ্বয়ের সার্টিফিকেট, রাজা প্রমোদরঞ্জনের চিঠি, আকৃতির সমতা, মনের অবসাদ ও অস্থিরতা সকলই অনুকূল হইল, সুতরাং কেহই সন্দেহ করিল না।

আসল রাণী লীলাবতীর কাপড় চোপড় মোট মোটারি আমার নিকটে ছিল। আমি তৎসমস্ত সযত্নে আনন্দধামে পাঠাইয়া দিলাম।

এই অত্যদ্ভুত ঘটনাপুঞ্জের আখ্যান এই স্থলেই পরিসমাপ্ত হইতেছে। ইহার ফল স্বরূপে আমাদের যে আর্থিক লাভ হইল তাহার বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই অচিন্তনীয় ব্যাপা-

রের—এই কল্পনাতীত কাণ্ডের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ইহজগতে কাহারও সাধ্য হইত না। কেবল আমার দুর্ব্বলহৃদয়তা, আমার প্রগাঢ় প্রেম, সেই সুন্দরীকুলোত্তমা মনোরমার প্রতি আমার অত্যধিক আন্তরিক অনুরাগ আমার কঠোরতা ও অতি সাবধানতা বিনষ্ট করিয়াছিল; তাহাতেই আজি আমি পরাজিত, আজি আমাদের অবস্থার এই বিপর্য্যয়! পাছে সেই ব্যথিতা সুন্দরীর হৃদয়-বেদনা সম্বর্দ্ধিত হয় এই ভয়ে, গারদ হইতে তাঁহার ভগ্নী পলায়ন করিলে, আমি তাঁহাদের অনুসরণ করি নাই। আমার সেই একগুঁয়ে পরলোকগত বন্ধুর প্রাণান্ত হওয়ার পর, আমি যখন বাতুলালয়ের অধ্যক্ষকে তাহার পলাতকা বন্দিনীকে ধরিয়া দিব বলিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিলাম, তখনও সেই অদম্য প্রেম, সেই কোমলতা আমাকে অভিভূত করিল। আমি উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইলাম। পাঠক! এই পরিপক্ক, কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধের হৃদয়-উদ্যান একবার দর্শন কর। দেখিবে তথায় প্রেমময়ী শ্রীমতী মনোরমা সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় যুবকবৃন্দ, বদনে কাপড় দিয়া হাস্য কর; আর সুন্দরিগণ! কৃপা করিয়া, আমার দুঃখে এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ কর।

আর একটা কথা বলিয়া, আমি এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্তের উপসংহার করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি, কৌতূহলপরবশ লোকেরা এখনও তিনটি বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছেন। তাঁহাদের প্রশ্নত্রয় ও তাহার উত্তর নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথম প্রশ্ন। শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবী আমার একান্ত অনুগত এবং আমার ইচ্ছা পূরণার্থ অতীব দুষ্কর কর্ম্ম সাধ-

নেও কখন পশ্চাৎপদ নহেন। এরূপ হইবার কারণ কি? যাঁহারা আমার চরিত্র ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু অন্য লোকের জন্য বলিতেছি, অনুরূপ ভৈরবী পশ্চাতে না থাকিলে, কোন ভৈরবই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। শক্তির সাহায্য না পাইলে, পুরুষ অকর্ম্মণ্য। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁহার সেবা ও বাসনা পূরণই স্ত্রীর ধর্ম্ম। ইহাই না তোমাদের ধর্ম্মনীতি? তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী ধর্ম্মসূত্র বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এস্থলে সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণানুষ্ঠান ঘটিয়াছে। ছিঃ! তোমরা এসম্বন্ধে কথা কহ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যে সময়ে মুক্তকেশীর মৃত্যু হইয়াছিল, যদি তখন তাহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে আমি কি করিতাম? তাহা হইলে আমি তাহার যাতনাময় জীবনের অবসান করিয়া সুখময় চির শান্তির উপায় করিয়া দিতাম। তাহা হইলে সেই মানসিক ও দৈহিক রোগগ্রস্ত দুঃখিনীর দেহাবরোধ নিবদ্ধ আত্মাকে পরম স্পৃহনীয় মুক্তি প্রদান করিয়া সুখী করিতাম। ইহার আবার জিজ্ঞাসা কি?

তৃতীয় প্রশ্ন। সমস্ত ঘটনা ধীরভাবে আলোচনা করিলে, আমার চরিত্র কি নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে? আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কদাপি না। এই ব্যাপারের মধ্যে আমি বিহিত বিধানে অকারণ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে অক্লেশে রাণী লীলাবতীর জীবনাবসান করিতে পারিতাম। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, বহু

কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া, নিরন্তর বহু যত্ন করিয়া আমি এত কল পাতিয়াছিলাম কেন? কেবল নিষ্পাপ থাকিবার অভিপ্রায়ে। আমার কৃতকার্য্য ও যাহা আমি করিলে করিতে পারিতাম এতদুভয়ের আলোচনা কর—বুঝিতে পারিবে আমি কত ধর্ম্মাত্মা—কিরূপ সাধু পুরুষ।

লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম আমার এই প্রবন্ধ অসাধারণ সামগ্রী হইবে। তাহাই হইয়াছে। যেমন ব্যাপার তদনুরূপ বর্ণনা হইয়াছে কি না, সাধারণে বিচার কর। ইতি

শ্রীজগদীশনাথ চৌধুরী।

(অবিমুক্ত বারাণসী ধামের ধর্ম্ম সভার অন্যতম সভ্য, হরিদ্রা নগর জ্ঞান-প্রচারিণী সভার সম্পাদক, বিরাটপুর নীতি-সঞ্চারিণী সভার সভাপতি, কৈবল্যনগরের জমিদার, লাঘব গ্রামের বিজ্ঞান সভার পৃষ্ঠ-পোষক, ভূত-পূর্ব্ব 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি ইত্যাদি।)

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৌধুরীর লিখিত কাগজ সমূহের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, যে আধঘণ্টা আমার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কথা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ মস্তকান্দোলন করিয়া আমাকে প্রস্থানের অনুমতি দিল। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলাম। হরেকৃষ্ণ বা রমণীর আর কোন কথা ইহজীবনে আমি শুনি নাই। ধীরে ধীরে, অলক্ষিত ভাবে, তাহারা পাপের উত্তর সাধকতা করিতে আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে, অলক্ষিত ভাবে তাহারা কোথায় অন্তর্ধান হইল কে বলিতে পারে?

অত্যল্পকাল মধ্যে আমি পুনরায় গৃহাগত হইলাম। অতি অল্প কথায় লীলা ও মনোরমাকে এই বিপজ্জনক ব্যাপারের বৃত্তান্ত বিদিত করিলাম এবং অতঃপর আমাদের কি করিতে হইবে, তাহারও আভাষ দিলাম। বিস্তারিত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে বলিয়া, আমি তখন তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং অবিলম্বে ব্রাউন কোম্পানির আড়গোড়ায় গমন করিলাম। আমার প্রয়োজন অতি গুরুতর একথা জানাইয়া, আমি তাঁহাদের খাতা হইতে একটি সংবাদ জানিবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। খাতা বাহির করিয়া

তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন, ১৮ই জুন অর্থাৎ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, খাতার ঘরে ঘরে নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখিত আছে:—

"ব্রুহাম ও জুড়ি। জগদীশনাথ চৌধুরী। ৫নং আশুতোষ দের লেন, সিমুলিয়া। বেলা ২টা। ১৬৮। জাফর কোচম্যান।"

উক্ত জাফর কোচম্যানের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে, তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তুমি, সিমুলিয়া, ৫নং আশুতোষ দের লেন হইতে, একটি বাবুকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছিলে মনে আছে কি?"

জাফর উত্তর দিল,—"হাঁ হুজুর, খুব মনে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কেন এ কথা তোমার মনে থাকিল?"

সে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, মনে থাকিবে না কেন? একটা ভয়ানক লম্বা চৌড়া লোক সে দিন গাড়িতে সোওয়ার হইয়াছিল। সে কথা সহজে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকটার কথাবার্ত্তাও কি এমন মিষ্ট! বড়মানুষের এমন ভাব আর কখন দেখি নাই। সে বাবুজি এখন কোথায় আছেন ধর্ম্মাবতার?"

আমি বলিলাম,—"তিনি এখন কলিকাতায় নাই।"

সে বলিল,—"আমি তাঁর জানালার কাছে একটা কাকাতুয়া টাঙ্গান দেখিয়াছিলাম। কি চমৎকার কাকাতুয়া মহাশয়! কত কথাই পাখীটা বলে।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক কথা, তাঁহার কাকাতুয়া ছিল বটে। তার পর, তুমি ষ্টেশনে গাড়ি লইয়া গেলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই মোটা বাবু গাড়িতে উঠিলেন। আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ি লইয়া গেলাম। একজন রাণীকে সেখান হইতে আনিবার কথা ছিল। সে রাণীর নাম কি ভাল—আমার মনে আছে—বলিতেছি আমি—হাঁ—রাণী লীলাবতী। ঠিক তাঁর নাম রাণী লীলাবতীই বটে, তা আমার বেশ মনে আছে। আমরা রাজা, রাণী, কি বড় লোকের কাজ একবার করিলে, কখন নাম ভুলি না। কখন কোন উপলক্ষে বখশিসটা আশটা পাওয়ার আশাতেও বটে, আর পরে আবশ্যক হইলে চাকরি বাকরির আশাতেও বটে, আমরা নাম মনে করিয়া রাখি।"

আমি বলিলাম,—"ঠিক কথা; যাঁহাকে আনা হইয়াছিল, তাঁহার নাম রাণী লীলাবতী বটে।"

এ পর্য্যন্ত জাফর যাহা বলিল তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তারিখের কথা সে বলিতে পারে না, প্রয়োজনও নাই। এই আড়গোড়ার রেজষ্টরী বহিতে তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণ আছে। তখনই আমি খাতা হইতে সেই অংশের নকল তুলিয়া লইলাম। আড়গোড়ার অধ্যক্ষকে সমস্ত কথা জানাইলে, তিনি তাহাতে একটা নাম সহি ও কারবারের মোহর করিয়া দিলেন। জাফর কোচম্যানকে আমি২।৩ দিনের জন্য লইয়া যাইব। সে জন্য কারবারের যে ক্ষতি হইবে তাহার পূরণ স্বরূপে টাকা জমা দিলে, তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে ২।৩ দিনের জন্য জাফরকে বিদায় দিলেন।

তদনন্তর আমি সেখান হইতে রমেশ বাবুর বাসায় আসিলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। ঐ ব্যক্তিই যে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা তিনি বুঝিলেন এবং তাহাকে আইনের সাহায্যে দণ্ডিত করিবার কোনই উপায় নাই, তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমার যে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে সত্বর আমি, আমার স্ত্রীর স্বরূপত্ব সমর্থন করিবার জন্য, আনন্দধামে যাইব, তাঁহাকেও তদুপলক্ষে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে অবকাশাভাবে ঘটিয়া উঠিল না।

রমেশের বাসা হইতে বিদায় হইয়া, আমি উকীল করালী বাবুর আফিসে গমন করিলাম। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভে, আমি করালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে নিতান্ত অভরসার কথা বলিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন যে, "যদি আপনি কখন মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিব।" আজি আমি মোকদ্দমা খাড়া করিতে পারিয়াছি; আজি সকল প্রকার অকাট্য প্রমাণ আমার হস্তগত। এতদিন পরে, আজি আবার আমি করালী বাবুর আফিসে চলিলাম। তখন ঐ দুই পাপিষ্ঠকে বিহিত বিধানে দণ্ডিত করিবার সংকল্প ছিল। এখন আর সে সংকল্প নাই, কারণ এখন উভয়েই আমার আয়ত্তাতীত হইয়াছে। তাহা যাউক,

লীলার স্বরূপত্ব সংস্থাপন ও তাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয় হইতে এই বিজাতীয় প্রতারণাজাত ভ্রান্তির অপনোদন করা আমার ঐকান্তিক কামনা। যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা সফলিত করিতে পারিলেই আমি পূর্ণ মনস্কাম হই। লীলা তাঁহার পিতৃব্যের আলয়ে—সেই আনন্দ-ধামে—সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আদৃত হইলেই, আমার সকল বাসনা চরিতার্থ হয়। উমেশ বাবুর অনুপস্থিতিতে অধুনা করালী বাবুরই এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

করালীবাবু আমার অনুসন্ধানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও তাহার বর্ত্তমান ফলাফল জ্ঞাত হইয়া যেরূপ অপরিসীম বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমার যত্ন, উদ্যোগ ও কার্য্যপ্রণালীর যেরূপ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রাতে লীলা, মনোরমা, করালীবাবু, তাঁহার একজন মুহুরী, জাফর কোচম্যান এবং আমি আনন্দধামের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লীলার স্বরূপত্ব সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত না হয় এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ৺প্রিয়প্রসাদ রায়ের দুহিতা শ্রীমতী লীলাবতী দেবী বলিয়া স্বীকার না করে, ততক্ষণ যে খুল্লতাতের ভবন হইতে তিনি একদা অপরিচিতের ন্যায় অপমানিত ও বিদূরিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই পিতৃব্য-ভবনে তাঁহাকে কদাপি লইয়া যাইব না, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প। তদভিপ্রায়ে, আপাততঃ

তারার খামারে লীলার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিবার জন্য, মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম। তারামণি, আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইল যে তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যাহা হউক, সেখানে তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া, করালী বাবু ও আমি, রাধিকা বাবুর সহিত সাক্ষাতের বাসনায়, আনন্দধামে গমন করিলাম।

হৃদয়হীন, স্বার্থপর রাধিকাবাবু আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া যেরূপ পাষণ্ডের ন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা মনে করিলেও লজ্জা ও ঘৃণা হয়। কিন্তু আমরা কোন দুর্ব্ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া, তাঁহাকে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিলাম। তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই ভয়ানক চক্রান্তের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বস্তুতই তিনি যার-পর-নাই অভিভূত হইয়াছেন এবং নিতান্ত ছেলেমানুষটীর মত বলিতে লাগিলেন "যখন লোকে বলিল, আমার ভাইঝি মারা গিয়াছে, তখন আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে সে এখনও বাঁচিয়া আছে?" আমরা তাঁহাকে একটু ঠাণ্ডা হইতে সময় দিলে, তিনি তাঁহার প্রাণের অধিক লীলাকে সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। তা সে জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? তিনি তো আর মরিতে বসেন নাই, যে এখনই এ কাজ না সারিলে কোন মতেই চলিবে না। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপ পাগলামির ও হৃদয়হীনতার কথা কহিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। আমি সবিশেষ দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার এই সকল ব্যবহার বন্ধ করিয়া

দিলাম। আমি জোর করিয়া বলিলাম, হয় তিনি স্বেচ্ছায় সরল ভাবে, সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি সুবিচার করুন, নয় তাঁহাকে আইনের সাহায্যে আদালতে টানিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার দ্বারা আমরা আবশ্যক মত কাজ আদায় করিয়া লইব। তিনি করালী বাবুর দিকে কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, করালী বাবুও আমারই কথার সমর্থন করিলেন। তখন অগত্যা তিনি, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

করালী বাবু ও আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং, ঢোল ফিরাইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, রাধিকা বাবুর হুকুম, তাহাদের সকলকে পরশু তারিখে আনন্দধামে আসিতে হইবে। ইত্যবসরে আমি অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে এই চক্রান্তের একটা বিবরণ লিখিয়া রাখিলাম।

নিয়মিত দিন উপস্থিত হইল। আনন্দধাম সংলগ্ন প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সন্নিহিত প্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এই অত্যদ্ভুত কাণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিতে ও লীলাকে দেখিতে সমাগত হইয়াছে। একটা উচ্চ বারন্দার উপর আমাদের বসিবার জন্য চেয়ার পাতা ছিল। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়কে আমরা জোর করিয়া সেই স্থানে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহার দুই দিকে দুই জন খানসামা—এক জনের হাতে স্মেলিংসল্টের সিসি, আর এক জনের হাতে গোলাপ জলের বোতল। রায় মহাশয়ের নিজের হাতে ওডিকলো ভিজান রুমাল।

আমরা সেই স্থানে সমবেত হওয়ার পর, শ্রীমতী মনোরমা দেবী লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সমবেত ব্যক্তিগণ তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই কলরবে রায় মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইবার মত হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে, অনেক গোলাপজল প্রয়োগে এবং স্মেলিংসল্টের সাহায্যে, তিনি সে যাত্রা কোনরূপে সামলাইয়া উঠিলেন।

আমি উচ্চস্বরে ধীরে ধীরে আমার লিখিত বৃত্তান্ত ও প্রমোদরঞ্জনের পত্র পাঠ করিলাম। জাফর কোচম্যানও তাহার বক্তব্য বিষদরূপে ব্যক্ত করিল। উকিল বাবুও আইন সঙ্গত ব্যাপার, অতি মিষ্ট কথায়, বুঝাইয়া দিলেন। কাহারও মনে তিল মাত্র সন্দেহ থাকিলনা। সকলেই মহানন্দে মগ্ন হইল। তাহার পর শ্রীমতী বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমাপার্শ্বস্থ সেই স্মারক চিহ্ন সর্ব্বসমক্ষে ভগ্ন ও বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলাম। রায় মহাশয় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; সুতরাং তাঁহাকে কয়েকজন ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। এদিকে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল।

আমরা সকলে আনন্দধামে কিছু কালও থাকি, স্বার্থপর, স্বকীয় সুখাভিলাষী, স্বজন-সঙ্গ-বিরোধী রাধিকাপ্রসাদ রায়ের কদাপি তাহা অভিপ্রায়-সঙ্গত ও বাসনানুগত হইতে পারে না, ইহা আমরা বেশ জানি ও বুঝি। বিশেষতঃ আমরাও তাদৃশ গলগ্রহ রূপে সেখানে একদিনও থাকিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। যে কার্য্যের জন্য আমরা আসিয়াছিলাম, সে কার্য্য

সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়ার পর, আমরা রায়মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। হৃদয়হীন রাধিকাবাবু একটা মৌখিক শিষ্টাচারও করিল না। বলিল,— "তা—তা বেশ—তা আচ্ছা!" আমরা সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বিস্তর লোক আমাদের সঙ্গে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিল।

এত দিনের যত্ন ও অধ্যবসায় সফল হইল। আমাদের দারিদ্র্যই আমাদের এতাদৃশ শুভ পরিণামের একমাত্র কারণ। ধনবান্ হইলে আমরা কদাপি এরূপ ভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতাম না; নিশ্চয়ই তাহা হইলে আমরা আদালতে বিচার-প্রার্থী হইতাম। কোনরূপ অকাট্য প্রমাণাভাবে আমাদের নিশ্চয়ই পরাজয় হইত। যে যে উপায়ে প্রমাণসমূহ ও আভ্যন্তরিক বৃত্তান্তসমূহ আমরা জানিতে পারিলাম, আইনের সাহায্যে তাহা জানিতে পারিতাম কি? আইনের সাহায্যে হরিমতির সহিত সাক্ষাৎ হইত না। আইনের সাহায্যে কখনই রমেশের অতীত কাহিনী জানিয়া, চৌধুরীকে বাধ্য করিয়া সকল সংবাদ আদায় করিতে পারিতাম না। হে করুণাময় বিশ্ব-জীবন! আমাদিগকে দরিদ্র করিয়া তুমি আমাদের মনো-রথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছ। তোমার অপার করুণা-বলে আজি লীলা পরিচিতা, পুনর্জ্জীবিতা, দুঃখ-বিহীনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর দুইটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেই বর্ত্তমান উপন্যাস পরিসমাপ্ত হয়।

এই সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠার পর—সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি বিদূরিত হওয়ার পর—আশার সফলতা হেতু সকলই সুখময় হওয়ার পর, আমার একবার স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা হইল। লীলা ও মনোরমা উভয়েই আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল, এলাহাবাদ যাইব। প্রিয়বন্ধু রমেশ বাবু এই কথা শুনিয়া, যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বড়ই ভাল হইল। এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুসহ দেশভ্রমণে অধিকতর আনন্দ জন্মিবে তাহার সন্দেহ কি? আমরা মহানন্দে দুই বন্ধুতে রেলে উঠিলাম এবং যথাসময়ে এলাহাবাদ পৌঁছিলাম।

এলাহাবাদে আমরা একটা বাসা ভাড়া করিলাম এবং সানন্দে চারিদিকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একদিন মধ্যাহ্নকালেই আমি বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম; কিন্তু রমেশ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আমাকে একাকী যাইতে হইল। দুই এক ঘণ্টা পরেই আমি প্রত্যাগত হইলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রমেশ কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে যৎপরোনাস্তি কৌতূহল জন্মিলেও, রমেশকে উত্যক্ত করা হইবে অশঙ্কায়, আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। দুই একটা কথাও আমার

কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি শুনিতে পাইলাম, রমেশ বলিতেছেন,—"বটে! বাবা সুরেশ, তুমি খুব চিনিয়াছ তো! তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। এত দিন পরে আমার মনের কালী মিটিয়াছে। ভগবান তোমায় সুখে রাখুন। তুমি আজিই কলিকাতায় যাইতেছ, যাও। আমিও হয়ত আজিই ফিরিব।" এই কথার পর ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং গণ্ডদেশে দাগযুক্ত সেই যুবা পুরুষ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি, আমাকে চিনিতে পারিয়া, মস্তকান্দোলন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর বোধ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ রমেশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রমেশ বড় প্রফুল্ল ও আনন্দযুক্ত। তিনি আমাকে দর্শনমাত্র আমার গলা জড়াইয়া বলিলেন,—"আজি আমার বড়ই সুসংবাদ! আজি ২৫ বৎসর পরে, আমি আমার সেই অভাগিনী ভগ্নীর একমাত্র সন্তানের সন্ধান পাইয়াছি। আমার সেই ভাগিনেয় এই চলিয়া গেল; এখন কলিকাতায় যাইবে। কলিকাতায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাহার নাম সুরেশ। অতি শিষ্ট শান্ত খাসা ছেলে হইয়াছে।"

রমেশের চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। এ সংবাদে বস্তুতই আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি সমুচিত কথায় আমার আন্তরিক আনন্দ ব্যক্ত করিলাম।

তাহার পর রমেশ বলিলেন,—"আরও এক অতি ভয়ানক সংবাদ আছে; রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে জগদীশনাথ চৌধুরীকে খুন করিয়াছে!"

আমি জিজ্ঞাসিলাম —"কে খুন করিল ?"

রমেশ বলিলেন,—"তাহা জানি না। আমার ভাগিনেয় কলিকাতায় তাহার সন্ধান পায় এবং সেই দুর্ব্বৃত্তই যে জগদীশনাথ চৌধুরী সাজিয়া কলিকাতায় আছে, তাহাও জানিতে পারে। সে তদবধি অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে তাহার অনুসরণ করে। আজি সুরেশ দেখিয়া আসিয়াছে, কর্ণেলগঞ্জের নিকটে, কে তাহার বুকে ছোরা মারিয়া নিপাত করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ এখনও তথায় পড়িয়া আছে।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। ভগবন! তোমার বিচার কি অব্যাহত! কিছুতেই তোমার সূক্ষ্মদর্শী ন্যায় বিচারের অন্যথা হইবার নহে। সে ঘোর দুষ্কর্ম্মান্বিত মহাপাপী স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি-বিদ্যাবলে আমাদের হস্ত অতিক্রম করিয়া, রাজ-শাসনের চক্ষে ধূলি দিয়া সংসার রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিল, তোমার ন্যায়-বিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে তাহার সাধ্য হইল না। তুমি আজি অন্যের অলক্ষিত ভাবে, তাহার প্রতি তোমার ন্যায়-দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, তোমার সর্ব্বদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছ! হা ভ্রান্ত মানব! কৃপাময়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, নিস্তারের আশা করা নিতান্তই মত্ততা। তখন আমি রমেশকে বলি-লাম,—"চল ভাই, আমরা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসি! হয় ত সুরেশের ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে।"

রমেশ বলিলেন,—"না ভাই, এসম্বন্ধে সুরেশের ভ্রান্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। তথাপি চল, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসাই সৎপরামর্শ।"

আমরা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কর্ণেলগঞ্জের এক গাছতলায় লোকারণ্য। মধ্যস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য, লোকে ঠেলাঠেলি করিতেছে। যাহারা ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কেহ বলিতেছে, "কি চেহারা!" কেহ বলিতেছে, "হায়! হায়।" কেহ বলিতেছে, "নিশ্চয়ই একটা রাজা!" কেহ বলিতেছে, "একটা রাজা হে, রাজা।" আমরা, অতি কষ্টে, ভিড় ঠেলিয়া, দেখিতে পাইবার মত স্থানে, উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই প্রাণহীন বৃহৎ দেহ, ভূশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেই উন্নত সুপ্রশস্ত ললাট, সেই কৃষ্ণ কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি, সেই গৌরবর্ণোদ্ভাসিত সুগঠিত মুখশ্রী, সেই কুপথ-চালিত অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকেতন-স্বরূপ বিশাল মস্তক অধুনা ধূলিধূসরিত হইয়া ভূতলে নিপতিত। সেই প্রবঞ্চনার রঙ্গভূমি, যুগপৎ হাস্য ও রোদন নিপুণ, পরমশোভাময় নয়নদ্বয় মৃত্যু-কালিমায় সমাচ্ছন্ন ও মুদ্রিত। সেই বিলাসিতার বিলাস ক্ষেত্র, সেই সুখ-সেবিত দেহ এখন জীবন-শূন্য ও সংজ্ঞা-শূন্য। সেই অসাধারণ বুদ্ধি-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তি, স্বার্থের জন্য হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া, আর কার্য্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে না; ন্যায়ান্যায় বিচার বিরহিত হইয়া, পরানিষ্টের কল্পনায় আর প্রমত্ত হইবে না এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া, পাপপঙ্কে আর পরিলিপ্ত হইবে না। এইরূপে—এই ভয়ানক ভাবে তাহার জীবন নাটকের যবনিকাপাত হইল। তাহার সুবিশাল বক্ষস্থলের বামভাগে ছুরিকাঘাতের গভীর চিহ্ন রহিয়াছে। সেই আঘাতই তাহার জীবনান্ত সাধন করিয়াছে। শরীরের আর

কুত্রাপি কোনরূপ আঘাত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। সন্নিহিত প্রদেশ রুধিরে প্লাবিত। ক্ষতমুখ হইতে তখনও শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। কে তাহাকে হত্যা করিল, কে এই জঘন্য উপায়ে বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, পুলিষ তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। যদিও চৌধুরী, রমেশ ও আমার, ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে, তথাপি তাহার এতাদৃশ পরিণাম দেখিয়া আমরা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলাম এবং সে দৃশ্য অধিকক্ষণ দর্শন করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হইল না। আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

সেই দিনই আমরা এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিলাম।

চৌধুরী পত্নী রঙ্গমতী দেবী এই ঘটনার পর, এলাহাবাদ হইতে একদিনের জন্যও, স্থানান্তরে গমন করেন নাই। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্নিহিত জনগণ দেখিতে পাইত, যে স্থানে চৌধুরী নিহত হন, এক অবগুণ্ঠনবতী প্রবীণা কামিনী সেই স্থলে, ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, উভয় হস্তে তত্রত্য ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীরভাবে আমাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দরিদ্র হইলেও, আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এক বৎসর পরে আমার এক নয়নবিনোদন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, আমাদের সংসার আরও সুখময় ও আনন্দময় করিয়া দিল। আমরা সকলেই অপরিসীম আনন্দে ভাসমান হইলাম; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরমার আনন্দের সীমা থাকিল না। মনোরমা সেই সুকুমারকায় প্রফুল্ল প্রসূনবৎ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া একদিন আমাকে বলিলেন,—"জান দেবেন্দ্র, খোকা কথা কহিতে শিখিলে কি বলিবে? খোকা মধুর ভাষায় ও মধুর স্বরে বলিবে, 'যাদেল মাচি নেই তালা কায় কি?"

আমি বলিলাম,—"কেবল খোকাই কি ঐ কথা বলিবে? খোকার বাপ মা এখনও বলিতেছে এবং চিরদিনই বলিবে, যাদের মনোরমা দিদি নাই, তারা বাঁচে কেমন করিয়া?"

ক্রমে ৬ মাসে আমরা খোকার অন্নপ্রাশনোৎসব সমাধা করিলাম। প্রিয় সুহৃৎ রমেশ বাবু, তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র, পরম শুভানুধ্যায়ী করালী বাবু, রোহিণী ঠাকুরাণী, তারামণি এই কয়জন আত্মীয় তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ভবনে সমাগত হইলেন। উমেশ বাবুকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু নিতান্ত অসুস্থতা হেতু তিনি আসিতে সক্ষম হন নাই। এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশে যে উমেশ বাবুর কথা বিন্যস্ত হই-

য়াছে, তাহা তিনি এই সময়ে আমার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

অন্নপ্রাশনের পর, কার্য্যোপলক্ষে, আমাকে কিছুদিনের নিমিত্ত, ঢাকায় যাইতে হয়। প্রথম প্রথম আমি নিয়মিতরূপে হয় মনোরমার, না হয় লীলাবতীর পত্র পাইতাম। কিন্তু আমি কখন ফিরিব তাহার স্থিরতা না থাকায়, শেষ কয়দিন আমাকে আর পত্রাদি লিখিতে বারণ করিয়াছিলাম। গোয়ালন্দ হইতে সন্ধ্যার পর যে গাড়ি ছাড়ে আমি তাহাতেই কলিকাতায় ফিরিলাম। অতি প্রত্যূষে আমি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এ কি! বাসায় জন-প্রাণী নাই— নীরব। লীলা নাই, মনোরমা নাই, খোকা নাই!

বাসার সম্মুখস্থ দোকানদার আমাকে দেখিয়া বলিল,— "বাবু আসিয়াছেন? মা ঠাকুরাণীরা আপনার জন্য এই পত্র রাখিয়া গিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে আমাকে একখানি পত্র দিল। তৎপাঠে আমি অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। লীলা তাহাতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা আনন্দধামে গিয়াছেন। কেন গিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও উল্লেখ করিতে মনোরমা নিষেধ করিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে আমি ফিরিয়া আসিব, তৎক্ষণাৎ আনন্দধামে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং তথায় গমনমাত্র সমস্ত ব্যাপার আমি জানিতে পারিব বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ভয় বা চিন্তার কোনই কারণ, একথাও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; পরে আর কিছুই নাই।

তৎক্ষণাৎ আমি পুনরায় শিয়ালদহ ষ্টেশনাভিমুখে ধাবিত হইলাম এবং বৈকালে আনন্দধামে পৌঁছিলাম। আমি যখন সেই স্থানে শিক্ষকতা করিতাম, তখন যে ঘর আমার ব্যবহারার্থ নির্দ্ধারিত ছিল, দেখিলাম লীলা-মনোরমা সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে স্থানে, যে চেয়ারে বসিয়া, আমি লেখা পড়া করিতাম, এক্ষণে সেই স্থানে ও সেই চেয়ারে মনোরমা খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। খোকা একটা চুষী কাটি চুষিতে চুষিতে, লাল ফেলিয়া, তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিতেছে। আর আমি যে টেবিলে কাজ করিতাম, তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া লীলা, সেই অতীত কালের অনুরূপ ভাবে, একখানি ছবির বহির পাতা উল্টাইতেছেন।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"ব্যাপার কি? তোমরা এখানে কেন? রাধিকা বাবু জানেন কি———"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা বলিলেন যে, রায় মহাশয় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাহার পর করালী বাবু, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আনন্দধামে আসিতে বলিয়াছেন।

এতক্ষণে আমার মনে প্রকৃত অবস্থার ছায়াপাত হইল। আমি সম্পূর্ণরূপে তাহা হৃদ্গত করিবার পূর্ব্বে, লীলা সকৌতুকে ও ঈষৎ হাস্য-সহকারে, আমার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে, গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন,—"হুজুরের নিকট একটা কৈফিয়ৎ না দিলে আমাদের অপরাধ কোন রকমেই মাপ হইবে না দেখিতেছি? কাজেই ধর্ম্মাবতারের সন্তোষের জন্য, আমাকে পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তাই বা কেন? ভবিষ্যতের কথাতেই আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই চঞ্চল শিশুসহ মনোরমা গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার সম্মুখস্থ হইয়া, আনন্দাশ্রুজ্জ্বলিতনেত্রে কহিলেন,—"বল দেখি, দেবেন্দ্র আমার কোলে কে?"

আমি বলিলাম,—"যদিও তোমাদের আজিকার কাণ্ড দেখিয়া আমি পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছি, তথাপি আমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই যে, আমি নিজের ছেলে চিনিতে পারি না।"

সেই অতীত কালের ন্যায় সরলতা ও প্রফুল্লতা সহকারে, মনোরমা সমুৎসাহে বলিলেন,—"বঙ্গদেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য প্রধান জমিদারের বিষয়ে ওরূপ ভাবে কথা কহা তোমার উচিত নয়। সাবধান করিয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে বিশেষ হুঁসিয়ার হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। জান তুমি ইনি কে? নিশ্চয়ই তুমি জান না। ইহাঁর পরিচয় বলিতেছি শুন। এই খোকা বাবু শক্তিপুরের জমিদার, আনন্দধামের একমাত্র মালিক। এখন চিনিতে পারিয়াছেন কি মহাশয়? খবরদার!"

আমাদের সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে যিনি সাহস ও ভরসা, আনন্দ ও উৎসাহ রাশি লইয়া যিনি প্রতিনিয়ত উপস্থিত; যাঁহার স্নেহের সীমা নাই, করুণার সীমা নাই এবং মমতার সীমা নাই; যে দেবী আমাদের রক্ষয়িত্রী, সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্ব-বিষয়ের নিয়ন্ত্রী সেই আনন্দময়ীর উল্লিখিত শুভময়, সুখময়, প্রেমময় কথার পর আর বলিবার কথা

কি থাকিতে পারে? আনন্দে আমার হস্ত বিকম্পিত হইতেছে—লেখনী হস্ত ভ্রষ্ট হইতেছে।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।